হাণ্টার

জে. এ. হাণ্টার
রচিত

অভ্যুদয় প্রব
৬, বঙ্কিম চাটুজ্জে

দুষ্ট হাতি

কয়েক জন আদিবাসী একদিন সন্ধ্যায় গ্রামে ফিরতে ফিরতে হঠাৎ দেখল, কালো র প্রকাণ্ড একটা বস্তু তাদের কুটিরের ছায়ায় নিশ্চল দাঁড়িয়ে রয়েছে। চেঁচিয়ে উঠল তারা, যাতে সেটা ভয় পেয়ে পালিয়ে যায়। আর সঙ্গে সঙ্গে সেটা ছায়া থেকে বেরিয়ে ভয়ঙ্কর বেগে তাদের তাড়া করল। এতক্ষণে তারা দেখল, সেটা এক বিশালকায় পুরুষ-হাতি।

প্রাণভয়ে দু-জনে দু-দিক লক্ষ্য করে ছুটতে শুরু করল। একজনের গায়ে ছিল একটা লাল কম্বল, সেটাই তার মৃত্যুর পরোয়ানা হয়ে উঠল, কারণ হাতিটা তাড়া করল তাকেই। গ্রামবাসিরা কুটিরের মধ্যে গুঁড়িসুঁড়ি মেরে তার এই পশ্চাদ্ধাবনের শব্দ শুনতে লাগল—বন্ধুকে সাহায্য করবার কোন ক্ষমতাই তাদের নেই। ধরা পড়ে মানুষটা যে আর্ত চিৎকার করেছিল তাও তাদের কানে এল। অতিকায় হাতিটা এক পায়ে তাকে চেপে ধরে শুঁড় দিয়ে টেনে টেনে তাঁর সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ টুকরো টুকরো করে ফেলল। তারপর শরীরটা পায়ে দলে মাটিতে লেপ্টে দিয়ে চলে গেল।

ব্রিটিশ ঈস্ট আফ্রিকার অ্যাবারডেয়ার ফরেস্ট-এর ভিতর দিয়ে দু-জন ক্যানাডার শিকারীকে শিকারে নিয়ে চলেছি, এমন সময় সেই গ্রামের সর্দারের কাছ থেকে রানার এসে হাতিটা মারার ব্যাপারে আমার সাহায্য প্রার্থনা করল। কেনিয়ার অধিবাসীরা আমায় ভাল করেই চিনত, কারণ শ্বেতাঙ্গ শিকারী হিসেবে বহু বছর আমি তাদের মধ্যে কাটিয়েছি—আমার তখন কাজ ছিল হিংস্র জন্তু শিকারে শিকারীদের সঙ্গী হওয়া কিংবা গভর্মেণ্টের অনুরোধে ... হত্যা করা। সর্দার খবর পাঠালো হাতিটা একটা দুষ্ট হাতি, মাসের পর মাস সে ওদের খেত-খামার তছনছ করে দিচ্ছে আর ও অঞ্চলে আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে। সুতরাং ওকে যদি না মারা হয় তো আবার ও মানুষ মারবে।

যে শিকারীদের সঙ্গে আমরা চুক্তিবদ্ধ ছিলাম তারা দুই ভাই,—অ্যালেন আর ডানকান ম্যাকমার্টিন। কয়েক সপ্তাহ ধরে আমরা ঝোঁপে ঝাড়ে

বঙ্গোর সন্ধানে ঘুরছি—বঙ্গো হল এক জাতের অ্যান্টেলোপ দুর্লভ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং যদি আমি হাতিটার সন্ধানে যাই শিকারের সম্ভাবনা ওদের কমে যাবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও দু-জ যেতে দিল। এমন অনেক শিকারী আমি দেখেছি যাদের মধ্যে এই অভাব আছে। সঙ্গে সঙ্গে রানারের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম।" সঙ্গে নি আমার ওয়াকাম্বা বন্দুক-বাহক সাসীতাকে,—বহু বছর সে আমার কা করে আসছে।

গ্রামে পৌঁছতে সর্দার এসে আমার সঙ্গে দেখা করল। সর্দা ডিরি,—পুরোনো বন্ধু আমরা। কিন্তু তখন আর পুরোনো দিনের গল্পের সময় নেই, গ্রামবাসিরা সবাই আতঙ্কে অস্থির হয়ে রয়েছে। মানুষজন ভরসা করে শাম্বায় (ভুট্টা-খেত) যেতে পারছে না, অনেকে আবার কুটির থেকেই বেরোতে ভরসা পাচ্ছে না, যদিও তারা জানে তাদের কাঠের ঘর দুষ্ট হাতির কাছে কিছুমাত্র বাধার সৃষ্টি করবে না। ডিরি বললে হাতিটা গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে ফিরছে আর যেখানে যত ভুট্টাখেত দেখছে তছনছ করে ফেলছে, সুতরাং তাকে না মারা পর্যন্ত গ্রামবাসিদের দুর্দশার অন্ত হবে না।

সাসীতাকে সঙ্গে নিয়ে আমি গেলাম মৃত মানুষটিকে দেখতে। গ্রামের প্রান্তে যেখানে সে প্রথম হাতিটার দেখা পায় সেখান থেকে তার পায়ের চিহ্ন ধরে জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করলাম। আততায়ীকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টায় যেভাবে সে এঁকে বেঁকে দৌড়েছিল, অত্যন্ত করুণ সে দৃশ্য। তার তখনকার মনের ভাব আমি বেশ বুঝতে পারি, কারণ হাতির তাড়া আমায় অনেক বার তে হয়েছে। এ যেন কোন দুঃস্বপ্নের ঘোরে দৌড়োনো,—কাঁটায় আটকে ছে, লতায় পা জড়িয়ে যাচ্ছে, আর এদিকে হাতিটা বন জঙ্গল দলে মাড়িয়ে র যেমন ইঁদুরকে তাড়া করে তেমনিভাবে ছুটে আসছে। প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছে এই বুঝি হাতির শুঁড়টা সাপের মত গলায় জড়িয়ে ধরল, অথচ পেছন ফিরে দেখব তার উপায় নেই, কারণ আবার সামনের ঝোপের উপর দৃষ্টি না রাখলেও চলবে না।

মৃতদেহের অবশেষটুকু খুঁজে পেলাম, কিন্তু তার পরনের লাল কম্বলটার কোন চিহ্ন নেই। হাতিটাই নিয়ে গেছে নিশ্চয়। লাল-পোশাক-পরা মানুষকে হাতি তাড়া করেছে এমন ব্যাপার আমি আগেও শুনেছি। তাই আমার ধারণা, ঐ রঙটাই তাকে আকর্ষণ করে।

দুষ্ট হাতিটার পায়ের দাগ ধরে বেরিয়ে পড়ার জন্যে তৈরি হয়েছিল। পেছনে কিন্তু আমায় অপেক্ষা করতে বললে, এই কারণে যে নিশ্চয় হাতিটা আর-একটা গ্রাম ধ্বংস করবে এবং রাত্রে থানার মারফত খবরটা মি- সে। তাহলেই পরদিন সকালে টাটকা পায়ের ছাপ ধরে এগোনো যাবে। বাতিক করে একদিন বা দু-দিনের খোঁজার পরিশ্রমটা বাঁচবে। ঠিকই বল্লে আমরা এখন আমার কেবল এই আশা নিয়েই প্রতীক্ষা করা যে হাতিটা কোন জঙ্গল আর করে করুক, কিন্তু যেন মানুষ না মারে। নে হয়, সমস্ত

ভোর হবার কয়েক ঘণ্টা আগে মাইল পাঁচেক দূরের এ- টাকা দেবে ঠিক একজন রানার ঊর্ধ্বশ্বাসে এসে উপস্থিত। খবর,—দুষ্ট হাতি- য়ে চলতে হচ্ছে। প্রবেশ করে, কিন্তু সোজা খেতের দিকে না গিয়ে কুটিরগু- এভাবে এগোতে পায়চারি করতে থাকে। একটা কুটিরের সামনে অনেকক্ষণ দাঁ- টা বিশ্রামের দরজার ছ-ফুটের মধ্যে অনেকখানি নাদি ফেলে। হতভাগ্য অধিবাসি- যে সে অবস্থা সহজেই অনুমান করা যায়: খড়ের ছাদওয়ালা পল্‌কা ঘরের ভিতরে সবাই জড়োসড়ো, আর বাইরে অন্ধকারের মধ্যে মূর্তিমান বিভীষিকার মত হাতিটার নির্ভর ভঙ্গী। খানিকক্ষণ পরে—ওদের কাছে এই সময়টা অনন্তকাল বলে মনে হচ্ছিল—ওরা হাতিটার চলে যাওয়ার শব্দ শুনল; হাতিটা গেল ওদের শস্যের দিকে। হতাশভাবে ওরা শুনল তার ধ্বংসের তাণ্ডব লীলা। এই সামান্য শস্যই হল তাদের যথাসর্বস্ব; অনেক পরিশ্রমে, অনেক মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তারা এই ফসল উৎপন্ন করেছিল। পেট পুরে খাওয়ার পর সে ঝোপের দিকে চলে গেল, এই মহা ভোজ হজম করতে আর দিনের বেলাটা ঘুমিয়ে কাটাতে।

ভোর হতে না হতেই আমি আর সাসীতা গ্রামের পথ ধরলাম। দুর্গম, খাড়াই পথ—ন-হাজার ফুট উঁচু। ফুসফুসে হাঁপ ধরে। শস্য ঘিরে যে কাঁটাঝোপের বেড়া দেওয়া ছিল সেই বেড়া মাড়িয়ে হাতিটা গিয়েছিল, গ্রাম থেকে সেই চিহ্ন লক্ষ্য করে আমরা চললাম অ্যাবারডেয়ার বনের সবচেয়ে দুর্গম অঞ্চলের দিকে।

ফাঁকা জায়গার উজ্জ্বল আলো থেকে বনের মধ্যে প্রবেশ করে মনে হল এ যেন প্রকাণ্ড এক অট্টালিকা,—এর ছাদ সবুজ, গাছের মোটা মোটা গুঁড়িগুলো এর স্তম্ভ। চারিদিকে ভুতুড়ে স্তব্ধতা। পত্রবহুল ঘন ঝোপে শব্দ চাপা পড়ে যায়। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছের গুঁড়ির ভিতর দিয়ে আমরা নিঃশব্দে

বজোর সচলেছি, আগাছার ভিড় না থাকায় অসুবিধে হচ্ছে না। সামনের দুর্লভ হকুড়ি ফুট পর্যন্ত দৃষ্টি যাচ্ছে—তার বেশি দরকার বোধ করা বা আশা শিকাে অন্যায়।

যেতে হাতির নাদির তীব্র গন্ধ এল। সামনে দেখলাম, কুৎসিতদর্শন রাশীকৃত অভাব উপর লক্ষ লক্ষ বুনো মাছির ভিড। সেই নাদিতে লাথি মেরে সাসীতা আমার ওয়াসর দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল—হজম হয়নি সেটা। নাদিটা করে আসছে।গ তাতে মনে হয়, হাতিটা আর মাত্র কয়েক ঘণ্টার পথ এগিয়ে

গ্রামে পৌ৷

ডিরি,—পুরোনো ছিলাম বনের কোন আধ-ফাঁকা অঞ্চলে হাতিটার দেখা পাব, নেই, গ্রামবাসিরা স্কা নয়, দিনের বিশ্রামের জন্যে সে ঘন জঙ্গলের আড়ালে গিয়ে শাম্বায় (ভুট্টা-হেল। পায়ের দাগ অনুসরণ করে আমরা ঘন বাঁশ-ঝাড়ে ভরা ভরসা প৲ঞ্চলে উপস্থিত হলাম। বাঁশ-ঝাড়ের মাঝে মাঝে এক রকমের লম্বা লম্বা কাঁটাগাছের চারা, শিকারের অনুকূল জায়গা মোটেই এ নয়। কলিবি আর সাইক্‌স্ বানরের দল গাছপালার মধ্যে ছুটোছুটি শুরু করল,—ভয় হল পাছে দুষ্ট হাতিটা তাদের এই চঞ্চলতা লক্ষ্য করে। যাই হোক, পায়ের নিচে পচন-ধরা বাঁশ থাকায় এমনিতেও নিঃশব্দে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। চেষ্টা করলাম হাতিটা যেখানে যেখানে পা ফেলে গভীর দাগের সৃষ্টি করেছিল তার উপর দিয়ে পা ফেলে ফেলে চলতে। কিন্তু সামান্য মানুষের সাধ্য কী তার বিশাল পদক্ষেপ ধরে অগ্রসর হয়! যখনই কোন লাল-পা ফ্র্যাঙ্কোলিন বা ছোট ডুইকার অ্যাণ্টেলোপ ঝোপ থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসছে, আমার বুক ধড়ফড় করে উঠছে, রাইফেলটা বাগিয়ে ধরছি। দাঁতের লোভে হাতি মারার সঙ্গে এর পার্থক্য প্রচুর, কারণ সেক্ষেত্রে কেবল ফাঁকা জায়গায় একপাল হাতির মধ্যে একটা হাতি বেছে নেওয়া। ডিরিকে কথা দিয়েছিলাম তাই, নতুবা এখনকার মত ফিরে গিয়ে অন্য কোন সময়ে কোন সুবিধেমত জায়গায় চেষ্টা করে দেখতাম।

বাঁশবন ফাঁকা হয়ে এল। যেখানটায় এসে পৌছলাম, আদিবাসিরা কাঠ কাঠছিল সেখানে। বিরক্ত হলাম লক্ষ্য করে, মানুষের গন্ধ পেয়ে কীভাবে হাতিটা বাঁশের ঝোপ ভেঙে দুমড়ে চলেছিল। যে হাতি রাত্রিবেলা শাম্বায় মানুষের গন্ধ গ্রাহ্য করে না, সেই হাতিই আবার জঙ্গলের মধ্যে মানুষের গন্ধ পেলে ভয়ে দিশাহারা হয়ে পড়ে। এতক্ষণ সে চরছিল আর ধীরে ধীরে

এগোচ্ছিল, কিন্তু এখন তার একমাত্র চিন্তা, কাঠুরেদের তাঁবুটা কতটা পেছনে ফেলে যেতে পারে।

সাসীতা আর আমি তাকালাম পরস্পরের দিকে। ঘাড় নাড়ল সে। একেই বলে শিকারীর ভাগ্য। বড় বড় পায়ের দাগগুলো একটা সাঙ্ঘাতিক খাড়াই বেয়ে একটা উঁচু শৈলশিরায় পৌঁছেছে। নাছোড়বান্দা হয়ে আমরা সেই দাগ লক্ষ্য করে অগ্রসর হলাম। দাগটা যেভাবে বুনো ঝোপ জঙ্গল আর কাঁটগাছের ঘনসন্নিবদ্ধ অঞ্চল দিয়ে চলে গেছে তাতে মনে হয়, সমস্ত অ্যাবাবডেয়ারের সবচেয়ে দুর্গম জায়গাটায় গিয়ে যেন গা-ঢাকা দেবে ঠিক করেছে। সে জঙ্গল এত নিবিড় যে আমাদের হামাগুড়ি দিয়ে চলতে হচ্ছে। এতে যেমন সময় লাগে, পিঠও কনকন করে তেমনি। এভাবে এগোতে এগোতে আমরা একটা জায়গায় এসে পৌঁছলাম যেখানে হাতিটা বিশ্রামের জন্যে থেমেছিল। হাতিটার প্রতি আমি যথেষ্ট কৃতজ্ঞ হলাম এইজন্যে যে সে এখান থেকে এগিয়ে গিয়েছিল, কারণ অমন একটা ঝোপের মধ্যে হামাগুড়ি দেওয়া অবস্থায় আচমকা একটা দুষ্ট হাতির সামনে পড়া খুব একটা সুখের ব্যাপার হত না।

হঠাৎ সামনে থেকে একটা ডালপালা ভাঙার শব্দ শোনা গেল। চুপচাপ শুয়ে রইলাম দু-জনে। আবার সেই শব্দ। কয়েক ফুট মাত্র সামনে, একটা বাঁশের ঝোপের মধ্যে খেয়ে চলেছে হাতিটা।

আবার গুঁড়ি মেরে অগ্রসর হলাম। একবার বাঁশঝাড়ের মধ্যে গিয়ে পৌঁছতে পারলে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারব—সে এক মহা স্বস্তি। শব্দ লক্ষ্য করে অগ্রসর হলাম হাতিটার পায়ের চাপে সমান-হয়ে-যাওয়া জমির উপর সন্তর্পণে পা ফেলতে ফেলতে। বাতাস এলোমেলো, বাঁশগুলো চারিদিকেই দুলছে। নিশ্চয় হতে পারলাম না কোন্ দিক দিয়ে গেলে হাতিটা আমাদের গন্ধ পাবে না; তার উপর জঙ্গল এত ঘনসন্নিবদ্ধ যে কেবলমাত্র হাতিটার চলা-পথ ধরেই অগ্রসর হওয়া সম্ভব। জানি আমি প্রায় ওর উপরেই এসে পড়েছি, কিন্তু চারিদিকের লম্বা লম্বা বাঁশের ভিড়ে দৃষ্টি একটুও অগ্রসর হচ্ছে না।

থেমে পড়ল সাসীতা, ঠোঁটের ইঙ্গিতে বাঁ দিকটা দেখিয়ে দিল। আমি কিন্তু কিছুই দেখতে পেলাম না। যাই হোক, ধীরে ধীরে তুলে নিলাম রাইফেলটা। বন্দুকটা দোনলা ৪৭৯ জেফ্রি ২, খুব নির্ভরযোগ্য; কখনো আমায় হতাশ করেনি,—তা যদি না হত তাহলে আর আমায় এ বই লিখতে হত

না। ডালপালা ভাঙার শব্দটা আবার শোনা গেল, মাত্র কয়েক ফুট দূর থেকে। দম বন্ধ করে গুলি করার সুযোগের অপেক্ষায় রইলাম।

হঠাৎ বন্ধ হল শব্দটা। পরম নিস্তব্ধতা। নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইলাম দু-জনে। সম্ভব হলে আমার হৃদ্‌স্পন্দনও বন্ধ করে দিতাম। মনে হল যেন ঢাকের আওয়াজ আসছে। এমন সময় বাঁশ ভাঙার শব্দ আমার কানে এল। হাতিটা মুখ ফিরিয়ে পূর্ণ বেগে ছুটতে শুরু করেছে। হতভাগা বাতাস ঠিক আমাদের গন্ধ ওর কাছে পৌঁছে দিয়েছে।

সাসীতা আর আমি পরস্পরের দিকে তাকালাম। বেচারার ভাষায় তেমন গালাগালির সুযোগ নেই, কিন্তু সে বিষয়ে আমার ভাগ্য ভাল; মনের সাধে দু-জনের হয়েই বেশ খানিকটা গালাগালি করলাম। অবশ্য মনে মনেই তা করলাম, কারণ যদিও হাতিটা তখনো অনেক দূরে, বিশেষ প্রয়োজন না হলে আমরা কখনো বনের মধ্যে কথা কই না।

সূর্য নেমে আসছে, বেলা গোটা-পাঁচেক হবে নিশ্চয়। দুর্গম পথে ভোরবেলা থেকে চলেছি, আর হাতিটাও খুব ভয় পেয়েছে সন্দেহ নেই। কয়েক মাইল না গিয়ে সে থামবে না। কোন বুদ্ধিমান মানুষ হয়ত এ অবস্থায় ছেড়েছুড়ে দিয়ে তাঁবুতে ফিরে যেত, কিন্তু শিকারের ব্যাপারে তেমন বিশেষ বুদ্ধি আমার কোনকালেই ছিল না, তাই ইঙ্গিতে সাসীতাকে বুঝিয়ে দিলাম যে আমরা তার পিছু ছাড়ব না।

ইতিমধ্যেই জঙ্গলের মধ্যে আলো কমে আসছে, যদিও তাতে আমাদের কোন অসুবিধে হয়নি। আতঙ্কের বশে হাতিটা শক্ত শক্ত বাঁশ ঘাসের মত মাড়িয়ে চলে গেছে। এগিয়ে চললাম। পায়ের তলায় পচা পাঁক ক্রমেই বিশ্রী হয়ে উঠছে, জুতো বসে যাওয়ায় প্রতি পদক্ষেপের সঙ্গে এমন শব্দ উঠছে যে কোন অসাবধানী হাতির কানও সে শব্দ এড়িয়ে যাবার মত নয়।

ঘণ্টাখানেক চলার পর সাসীতা নিচু গলায় পাখির মত শিস দিয়ে উঠল,—জঙ্গলে মনোযোগ আকর্ষণ করতে হলে এই হল সঙ্কেত। থেমে দাঁড়ালাম; শুনলাম কান পেতে। বাঁ-দিকের বাঁশঝাড়ের ভিতর থেকে হাতিটার নড়াচড়ার শব্দ আসছে। আমাদের গন্ধ পাবার উদ্দেশ্যে সে চলেছে হাওয়া যেদিকে বয়ে যাচ্ছে সেদিকে। এবার সে শব্দ বন্ধ হল, বুঝলাম ও কান পেতেছে। কোথায় আমরা হাতিটার পিছু নেব, ও-ই উল্টে এখন আমাদের পিছু নিচ্ছে দেখছি,—এবং পিছু নেওয়ার ব্যাপারে হাতির ক্ষমতা মানুষের চেয়ে অনেক বেশি।

আর-একবার ভেবে দেখলাম ফেরার পথ ধরব কি না, কিন্তু ডিরির কাছে যে কথা দিয়েছি তার খেলাপ করতে ইচ্ছে হল না। হাতিটাকে মারার সম্ভাবনা আমার এখন অনেকটা কমে এসেছে, তবুও আমরা তেমনি এগিয়ে চললাম। নিশ্চয় ও এখনো আমাদের গন্ধ পায় নি, নতুবা অতি অবশ্যই ঝোপ-ঝাড় মাড়িয়ে দৌড় লাগাতো। এখনো দাঁড়িয়ে আছে ওখানে, শুঁড় তুলে হাওয়ার গতি পরীক্ষা করছে হয়ত। আর কয়েক মিনিট অমনি দাঁড়িয়ে থাকলেই আমরা ওর কাছে গিয়ে হাজির হব। হলদে-সবুজ বাঁশের ভিতর দিয়ে একটানা তাকিয়ে তাকিয়ে আমার চোখ টন-টন করছে।

হঠাৎ বাঁশের ফাঁক দিয়ে একটা অস্পষ্ট মূর্তির আবছায়া আমার চোখে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে থেমে দাঁড়ালাম। ধীরে ধীরে তুললাম রাইফেলটা। ঘন ঝোপের অন্তরালে কিছুই স্পষ্ট দেখা গেল না,—হাতির দাঁতের সাদা বা হলদে রঙের কোন আভাও না যা থেকে কিছু আন্দাজ করা সম্ভব হতে পারে। সামান্যতম শব্দও যাতে না ওঠে তাই নিশ্বাস বন্ধ করে আছি, দম বন্ধ হয়ে মারা পড়ার মত অবস্থা। জানি আমার পেছনে সাসীতারও অবস্থা তথৈবচ। খুব ইচ্ছে হল গুলি করি, কিন্তু পাছে হাতিটা মারা না পড়ে কেবলমাত্র আহত হয় এই ভয়ে সাহস হল না। কোনদিকে একটুও যদি ও নড়ে তাহলেই বুঝতে পারব কোথায় গুলি করতে হবে।

একটা আচম্‌কা বাতাস এমন সময় বাঁশবনের মধ্য দিয়ে বয়ে গেল, আর মুহূর্তমধ্যে হাতিটা পালিয়ে গেল আমাদের গন্ধ পেয়ে।

অত্যন্ত হতাশ হয়ে পড়লাম। দূর থেকে গুলি করলে হয়ত মরত হাতিটা, কিন্তু তা না হয়ে যদি কেবলমাত্র আহত হত তাহলে হয়ত আমাদের শেষ করে দিত, কিংবা হয়ত যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে মাইলের পর মাইল অতিক্রম করে তবে থামত। আহত হাতি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে; তাই একেবারে নিশ্চিত না হয়ে আমি পারতপক্ষে হাতিকে গুলি করি না।

আর এগিয়ে লাভ নেই। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। ক্যাম্প থেকে বেশ কয়েক মাইল চলে এসেছি। ফেরার পথ ধরে ধীরে ধীরে অগ্রসর হলাম। হাতিটা মারতে পারি নি শুনে খুব হতাশ হল সবাই। একান্ত নীরবতার মধ্যে সান্ধ্য আহার সমাধা হল।

খাওয়া সেরে পাইপ ধরিয়ে বসে এতক্ষণে সমস্ত ব্যাপারটা যুক্তি দিয়ে বোঝবার অবসর হল। এইসব হতাশার জন্যেই তো শিকারের এত আকর্ষণ;

কারণ প্রতিবারেই যদি শিকারে সাফল্য লাভ করা যেত তবে তো এতে কোন উত্তেজনাই থাকত না। বড় ভাল হত যদি যাদের ভুট্টাখেত ও ধ্বংস করছে তারাও জিনিসটা এভাবে নিতে পারত।

বিছানায় শুয়ে হাইর‍্যাক্স পালের ডাক শুনছি। এ এক অদ্ভুত প্রাণী, গিনিপিগ খুব বড হয়ে উঠলে যেমন দেখতে হতে পারত তেমনি। আর শুনছি আদিবাসিদের ঢাকের তালে তালে বাজনা। জানি প্রচুর পরিমাণে দেশী মদ খেয়ে তারা তাদের সাহস বজায় রাখছে। ইচ্ছে হল আমিও গিয়ে ওদের সঙ্গে যোগ দিই ; কিন্তু না, কাল সকালে আবার বেরোতে হবে, মাথা পরিষ্কার রাখা দরকার। এমন সময় একটা সিংহের ভুতুড়ে আওয়াজ কানে এল। সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল ঢাকের শব্দ। তাড়াতাড়ি সবাই যে যার কুটিরে ফিরে গেল। আমার তাঁবুর কয়েক ফুটের মধ্যে একটা ঝরনা আছে, সেখান থেকে ওর জল খাবার শব্দ কানে গেল। তারপর শুনলাম ওর ওখান থেকে চলে যাওয়ার শব্দ। তারপর নীরব নিস্তব্ধ চারিদিক, মাঝে মাঝে কেবল কানে আসছে কোন বানরের বিরক্তিসূচক শব্দ আর কোন পাখির ঘুমের ঘোরে ডেকে ওঠা। তারপর ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরদিন সকালে দেখা গেল, পুরু কুয়াসার আস্তরণে সারা বন ছেয়ে গেছে। শিশির পড়ে ঘাস ভারি হয়ে উঠেছে, বাতাসে শীতের স্পষ্ট আমেজ। গরম চা খাচ্ছি, এমন সময় এক অর্ধনগ্ন ব্যক্তি দৌড়তে দৌড়তে এসে খবর দিল, ওখান থেকে তিন মাইল দূরে একটা শাম্বায় এসে হাতিটা ফসল নষ্ট করছে। হাতিটা এত চালাক যে পর-পর দু-বার কখনও এক গ্রামে অত্যাচার চালায় না, এবং এর ফলেই তাকে শিকার করা এত কঠিন হয়ে উঠছে।

সাসীতাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম তক্ষুনি। গ্রামে পৌছতে কয়েকজনকে পাওয়া গেল যারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে পথপ্রদর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করতে রাজি হল। হাতিটার চিহ্ন ধরে অগ্রসর হলাম আমরা। হাতিটার পায়ের প্রতিটি আঙুলের ছাপ পর্যন্ত এখন আমার নখদর্পণে,—তা দেখে আমার ঘৃণার উদ্রেক হয়। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা তার পিছু নিলাম। চলেছে সে পাহাড়গুলোর দিকে ; পথপ্রদর্শকের কাছে শুনলাম ওদিকটা নাকি অনেকটা ফাঁকা। আশা করি ওদের কথাই ঠিক।

অত্যন্ত খাড়াই পথ, বিশ্রামের জন্যে কেবলই থামতে হচ্ছে। আদিবাসিদের কিন্তু ক্লান্তি নেই,—হিংসে হয় ওদের দেখে। তাহলেও ঝোপ অনেকটা

পাতলা হয়ে আসায় আমাদের অগ্রগতি মোটামুটি মন্দ হল না। কিন্তু এতটা সুখ আমাদের কপালে সইল না; বেলা বারোটা নাগাদ আমরা অত্যন্ত নিবিড় ঝোপের মধ্যে গিয়ে পড়লাম। বাঁশের গুলোয় আর মাটিতে পড়ে-থাকা বাঁশের গোড়ায় জড়িয়ে প্রায় পাটির মত হয়ে রয়েছে, আর মরা গাছের গুঁড়ি প্রায় চার ফুঠ উঁচু হয়ে এমনভাবে পথ জুড়ে রয়েছে যে তা ডিঙিয়ে যাওয়া যত কঠিন, তার চেয়ে কঠিন তার তলা গিয়ে গলে যাওয়া; অথচ এ সমস্ত বাধা হাতিটা সহজেই ডিঙিয়ে গেছে। এ অবস্থায় নিঃশব্দে অগ্রসর হওয়া প্রায় অসম্ভব। অযথা শব্দ করার জন্যে সাসীতাকে ভৎর্সনা করে পরমুহূর্তে আমি নিজেই তার চেয়ে অনেক বেশি শব্দ করে ফেললাম।

এবার আমরা এমন একটা জায়গায় গিয়ে পৌছলাম যেখানে এসে হাতিটা লম্বা হয়ে ঘুমিয়েছিল। নরম মাটিতে তার চামড়ার ছাপ স্পষ্ট। এটা একটা আশার ব্যাপার বৈকি, কারণ না থেমে যদি সামনে এগিয়ে চলত হাতিটা তাহলে হয়ত কোনদিনই আমরা তার নাগাল পেতাম না। অবশ্য এই ঘনসন্নিবদ্ধ ঝোপের মধ্যে তার মুখোমুখি হওয়াটাও মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। এখন আমরা আর-একটা বাঁশঝাড়ের মধ্যে,—এ ঝাড়ের বাঁশগুলো উঁচুতে গতদিনের বাঁশঝাড়ের অর্ধেকও হবে কি না সন্দেহ। উপরদিকের ডালপাতা ভেদ করে বন্দুকের ডগার বেশি দৃষ্টিচালনা অসম্ভব।

হাওয়ার এক-একটা দমকায় লম্বা লম্বা বাঁশে ঠোকাঠুকি লাগল। অত্যন্ত সন্তর্পণে আমরা এগিয়ে চলেছি, বাতাসে যে শব্দ কানে আসছে তা গাছের গোড়ার, না কোন জন্তুর তা সঠিক বলা কঠিন। এমন একটা জায়গায় হাতিটার দেখা পাওয়া মোটেই আমার অভিপ্রেত নয়; কারণ হাতি যখন বাঁশঝাড় ভেঙে আক্রমণ করে, লম্বা লম্বা বাঁশগুলো এমনভাবে শুইয়ে ফেলে যে গুলি করার কোন সুযোগ পাবার আগেই তার তলায় পড়ে পিষে যাবার সম্ভাবনা। সাসীতা পর্যন্ত, ভয় কথাটা যার কুষ্ঠিতে লেখা নেই, বিশ্রী মুখভঙ্গি করে সমর্থন জানালো মুখ ফিরিয়ে যখন তাকে বললাম, 'হতচ্ছাড়া জায়গা একটা!'

হঠাৎ সামনের বাঁশঝাড়ের মধ্যে একটা নড়াচড়ার শব্দ আমাদের কানে এল। সাসীতা আর আমি সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চল হয়ে পড়লাম, রাইফেল বাগিয়ে ধরে আক্রমণের প্রতীক্ষায় রইলাম। হাতি নয়, তার বদলে চমৎকার একটা বঙ্গো ঝোপ থেকে বেরিয়ে আমাদের সামনে এসে পড়ল—ঠিক এমন একটা জন্তুই আমি আর ম্যাকমার্টিন দু-ভাই কয়েক সপ্তাহ ধরে খুঁজে ফিরছিলাম। কিন্তু

পাছে হাতিটা ভয় পেয়ে পালায় তাই আর গুলি করা সম্ভব হল না। এমন ব্যাপার শিকারীর জীবনে প্রায়ই ঘটে থাকে, সেরা শিকার হাতের মধ্যে পেয়েও সে-সুযোগ গ্রহণ করা সম্ভব হয় না।

একটা পাগাড়ি নদীর ফার্ন ঝোপে ছাওয়া তীর ধরে যেতে যেতে একটা জায়গা আমাদের চোখে পড়ল,—হাতিটা এখানে ঝোপের বড়-বড় গাছগুলো শুঁড় দিয়ে টেনেছে তাদের শেকড় উপড়ে ফেলবার জন্যে। এই শেকড়গুলোর মধ্যে হয়ত এমন কোন গুণ আছে যা খেলে হাতির স্বাস্থ্য ভাল থাকে। বুঝলাম হাতিটা আর বেশি এগিয়ে নেই, কারণ গাছ উপড়ে ফেলার ফলে যে মাটি উঠেছে তখনো তা স্যাঁতসেতে।

এইসব চিহ্ন লক্ষ্য করছি, এমন সময় একজন পথপ্রদর্শক সামনে থেকে ছুটে এসে জানালো, সামনের বাঁশঝাড় থেকে সে একটা শব্দ শুনতে পেয়েছে। কিন্তু এ কথা থেকে সঠিক কোন ধারণাই করা চলে না। যাই হোক, সাসীতা আর আমি পরম সন্তর্পণে অগ্রসর হলাম। বাতাস কমে গেছে, যা বইছে তাও আমাদের সপক্ষে। বড় বড় গাছগুলোর মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে আমরা চলেছি। এমন সময় হঠাৎ বাঁশ ফাটার শব্দ আমাদের কানে এল। বুঝলাম হাতিটা আমাদের সামনেই কোথাও আছে। ওর যাওয়ার শব্দে নিশ্চয় আমাদের নড়াচড়ার শব্দ চাপা পড়ে থাকবে, সুতরাং এর উপর যদি বাতাস এমনি অনুকূল থাকে তাহলে ওকে মারার পক্ষে আর বাধা থাকবে না।

হঠাৎ ওর শুঁড়টা গাছের গুঁড়ি ছাড়িয়ে উঁচু হয়ে উঠে একটা নরম ডাল ভেঙে নিয়ে নেমে গেল। গুঁড়ি মেরে অগ্রসর হতে হতে লক্ষ্য করতে লাগলাম, যদি গাছের গুঁড়িগুলোর ফাঁক দিয়ে ওকে দেখতে পারি। এদিকে আবার কোথায় পা ফেলছি তাও লক্ষ্য রাখতে হচ্ছে। সাসীতা আমার পিছু-পিছু এক জাতের ছত্রাকের রেণু উড়িয়ে উড়িয়ে হাওয়ার গতি পরীক্ষা করতে করতে চলেছে। নাড়া লাগলেই এই ছত্রাক থেকে প্রায় ধোঁয়ার মত মিহি রেণু ঝরতে থাকে যা লক্ষ্য করলে বাতাসের অতি সামান্য গতিও সহজেই নির্ণয় করা যায়। বাঁশঝাড়ের আরো গভীরে প্রবেশ করতে দেখা গেল, ঘনসন্নিবদ্ধ ঝোপের আড়ালে বাতাসের চলাচল প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে, ছত্রাকের রেণু সাসীতার হাতের উপরে নিশ্চল হয়ে রয়েছে। এমন সময় হাতিটা আমার চোখে পড়ল—আমার থেকে মাত্র পনেরো গজের মধ্যে।

হাতিটার ক্যাঁচ করে বাঁশ মুখে দেবার আর চিবোনোর শব্দ আমার

কানে এল। তার আর আমার মধ্যে রয়েছে ঘনসন্নিবদ্ধ বাঁশের বুহুনি ; কি পাছে কোন বাঁশের গুঁড়িতে লেগে আমার গুলি প্রতিহত হয় সেই ভয়ে গুলি করতে সাহস করলাম না। আবার তেমনি একটা মারাত্মক পরিস্থিতি : এখনই আমায় স্থির করতে হবে—ঝুঁকি নিয়ে গুলি করব—না দেরি করব কয়েক মুহূর্ত, যদি তাতে করে ওর কাঁধে গুলি করার সুযোগ পেয়ে যাই? খুব তাড়াতাড়ি আমার মনস্থির করতে হবে, কারণ আমরা ওর এত কাছে এসে পড়েছি যে বাতাস না থাকলেও হয়ত ও আমাদের গন্ধ পেয়ে যাবে।

হঠাৎ হাতিটা দেখতে পেল আমাদের। এবার কিন্তু কালকের মত দৌড লাগালো না। বিন্দুমাত্র ইতস্তত না করে এবং কিছুমাত্র আভাস না দিয়েই সে মুহূর্তমধ্যে আমাদের আক্রমণ করল।

রাইফেল উঁচিয়ে ধরেছি কি ধরিনি, ইতিমধ্যেই সে একেবারে আমাদের উপর এসে পড়েছে—বড বড কানদুটো মাথার পেছনে লেপটানো, শুঁড়টা বুকের উপর শক্ত করে রাখা। রাগে গর্জন করছে সে,—কয়েকটা বিকট শব্দের সমষ্টি তার গলা থেকে বেরোচ্ছে—তা কতকটা অর্‌র্ অর্‌র্ মত শুনতে। বন্দুকের ডান নলটা তার মাথার খুলির ঠিক মধ্যস্থলে ভ্রূ-চোখের মধ্যকার কাল্পনিক রেখার তিন ইঞ্চি উপরে লক্ষ্য করলাম। গুলি লাগার পর মুহূর্তকাল যেন হাতিটা আমার ওপরে শূন্যে ঝুলে রইল, পরক্ষণেই সশব্দে পড়ে গেল—পডল একেবারে বাঁশবনের মধ্যে প্রায় দৃষ্টির অগোচর হয়ে আর ভয়ঙ্কর চিৎকার আরম্ভ করল, চাপা গলায় ঘড-ঘড শব্দ করতে লাগল। দ্বিতীয় গুলিটা ছাড়লাম তার কাঁধের মাঝখানটা লক্ষ্য করে। সঙ্গে সঙ্গে তার সমস্ত শরীর শিথিল হয়ে গেল, পেছনের পা দুটো একেবারে সিধে হয়ে উঠল। এভাবেই মৃত্যু হল সেই ভয়ঙ্কর হাতির, ডিরির লোকজনের মধ্যে যে মহা আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

গুলি চলার সময় আমাদের যেসব পথপ্রদর্শক সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়ে পালিয়েছিল, এখন যেন তারা সবাই মাটি ফুঁড়ে দেখা দিতে শুরু করল। মরা হাতিটাকে ঘিরে দাঁড়ালো সবাই—আনন্দের আতিশয্যে তারা কথা কইতে পর্যন্ত ভুলে গেছে। আবার যে ওরা নিশ্চিন্ত মনে খেতে খামারে কাজ করতে পারবে এ খবরটা এতই ভাল যে তা বিশ্বাস করাই ওদের পক্ষে শক্ত।

মরা হাতিটার একটা পায়ের উপর বসে আমি পাইপে তামাক ভরলাম।

পায়েজ্ঞতা প্রকাশের জন্যে সকলেই আমার জন্য কিছু করতে ব্যস্ত, যদিও সেই মুহূর্তে এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খেতে দেওয়া ছাড়া আর কিছু ওদের কাছে আমার প্রয়োজন ছিল না। বাঁশের কোন-কোন খোপে পোকারা খুব ছোট ছোট ফুটো করেছে দেখা গেল। এমনি কয়েকটা খোপ বেছে নিয়ে ওরা তা কেটে আমার দিকে এগিয়ে দিল। প্রতিটি খোপ বৃষ্টির টলটলে ঠাণ্ডা জলে ভর্তি।

পাইপ শেষ করে মরা হাতিটা পরীক্ষা করতে বসলাম। গজদন্ত অতি সামান্যই—প্রতিটি ওজনে চল্লিশ পাউণ্ডের মত,—এমন একটা হাতির দাঁত যেখানে এর তিনগুণ হওয়া উচিত। মনে হয় বনের গাছপালায় ক্যাল-শিয়ামের অভাব আছে; কারণ দেখা গেছে বনের হাতির দাঁত কখনো ঝোপ-জঙ্গলের হাতির মত হয় না। দাঁতদুটো পরীক্ষা করতে করতে ডান দাঁতের গোড়ায় একটা বন্দুকের পুরোনো গুলির দাগ চোখে পড়ল। ছুরি দিয়ে বার করলাম সেটা। একটা মাস্কেট গুলি,—বেশ কয়েক বছর আগেই হয়ত কোন আরব গজদন্ত-শিকারীর ছোড়া। গুলিটা দাঁতের স্নায়ু-কেন্দ্রে লেগে ভীষণ যন্ত্রণার সৃষ্টি করেছিল,—অসহ্য যন্ত্রণায় পাগলের মত হয়ে শেষপর্যন্ত সে দুষ্ট হাতিতে পরিণত হয়েছিল। যে আরব গুলিটা ছুড়েছিল হ'সে হয়ত দিব্যি নিশ্চিন্ত মনে রয়েছে, একবার ভেবেও দেখেনি এর ফলে পশু ও মানুষের কত যন্ত্রণার কারণ যে হয়েছে।

তাঁবুর দিকে ফিরলাম। সবারই মেজাজ খুব ভাল, সবাই সাফল্যে উৎফুল্ল। পথপ্রদর্শকরা জঙ্গল কেটে পথ করে দিচ্ছে, খুব চেঁচামেচি হৈ-হল্লার মধ্যে দিয়ে আমরা চলেছি। কয়েক ঘণ্টা আগে যখন হাতিটার পিছু নিয়ে এই পথেই গুঁড়ি মেরে অগ্রসর হয়েছিলাম, তখনকার মৃত্যু-স্তব্ধতার সঙ্গে প্রচুর এর পার্থক্য। ফাঁকায় এসে তাকিয়ে দেখলাম, পাহাড়ের ঢালু বেয়ে আসছে কালো কালো মানুষ,—বন্দুকের আওয়াজ শুনে তারা ছুটতে ছুটতে আসছে। আমাদের পথপ্রদর্শকরা উপত্যকার এপার থেকে চিৎকার করে কি বলে উঠল। ওদের গলার অদ্ভুত একটা শক্তি আছে,—বহুদূর পর্যন্ত তা শোনা যায়। লক্ষ্য করলাম, যারা এগিয়ে আসছিল, থেমে দাঁড়িয়ে সুখবরটা নিয়ে আবার গ্রামের পথে ছুটতে শুরু করল।

তাঁবুতে ফিরতে সাসীতাকে আর আমাকে প্রচুর সম্বর্ধনা জানানো হল। যারা বুড়ো যারা অসুস্থ তারা পর্যন্ত টলতে টলতে কাছে এসে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল। শ্বেতাঙ্গরা কখনো তাদের হতাশ করেনি। ভিরি সর্দারের

কাছে খবর পাঠিয়ে আমি খেতে বসলাম—এতক্ষণে খাবারের উপর একটা দাবি হয়েছে বৈকি!

সন্ধ্যায় তাঁবুর আগুনের সামনে বসে পাইপ টানতে টানতে ভাবতে লাগলাম আমার শিকারী জীবনের কথা। বহু বছর আমার শিকারী হিসেবে আফ্রিকার জঙ্গলে কেটেছে। প্রথম যখন কেনিয়ায় আসি, যতদূর চোখ যায় সমস্ত ছিল সমতল ভূমি, শিকারের এলাকা। এখন যেখানে শহর দাঁড়িয়ে আছে সেই জায়গায় সিংহ মেরেছি,—এ অঞ্চলের প্রথম-চলা ট্রেনের ইঞ্জিন থেকে হাতি শিকার করেছি। একটা মানুষের জীবদ্দশার মধ্যে জঙ্গল খেতে পরিণত হয়েছে, নরখাদক মানুষ ফ্যাক্টরির কর্মীতে রূপান্তরিত হয়েছে। এই পরিবর্তনের ব্যাপারে কিছুটা হাত আমারও আছে, কারণ, যেসব এলাকায় চাষের বন্দোবস্ত হবে, গভর্মেণ্টের নিদেশে আমাকে তা বন্য জন্তুর কবল থেকে মুক্ত করতে হয়েছে। গণ্ডার শিকারের পৃথিবীর রেকর্ড আমার; হয়ত সিংহ শিকারেরও, (যদিও তখনকার দিনে ওভাবে সঠিক হিসেব রাখা হত না); আর হাতি মেরেছি চোদ্দ হাজারের উপর। এসব ফিরিস্তি খুব যে একটা গর্বের সঙ্গে দিচ্ছি তা কিন্তু মোটেই নয়। ওদের মারার দরকার হয়েছিল, আর ঘটনাচক্রে সে দায়িত্ব পড়েছিল আমার উপরে। সৌখিন পাঠকের কাছে হয়ত আশ্চর্য ঠেকবে যদি বলি যে যেসব জন্তু আমি হত্যা করেছি তাদের উপর আমার নিবিড় মমতা রয়েছে। ওদের অভ্যাস আর হাবভাব বুঝতে যে বছরের পর বছর আমার লেগেছে, সে শুধু ওদের মারতে সুবিধে হবে বলে নয়, ওদের জীবনযাত্রার ব্যাপারে আমার সত্যকার কৌতূহলই তার প্রধান কারণ।

অবশ্য এ কথা সত্য যে চিরকাল আমি শিকার করেই এসেছি। আমার জীবনের সবচেয়ে বড় নেশা বন্দুক,—সেরা অর্কেস্ট্রার সঙ্গীতের চেয়ে বন্দুকের গুলির শব্দই আমার বেশি পছন্দ। অতীতের কথা যখন চিন্তা করে দেখি, এই কথাই তখন মনে হয় যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যে জন্তুকে আমি মেরেছি, তারও আমাকে মারবার ঠিক তেমনি সুযোগ ছিল।

পুরোনো যুগের শিকারীদের শেষের দলের আমি,—যা আমি দেখেছি তা দেখা আর এখন সম্ভব নয়। সে শিকার আর নেই, সেই আদিবাসিরাও আর সেরকম নেই যেমন তাদের জানতাম। এক একটা দাঁতের ওজন দেড়শো পাউণ্ড, এমন হাতি-সর্দারের পাল নিয়ে যাওয়া—এ দৃশ্যও আর দেখা যাবে না।

গরুখেকো সিংহের ঝোপ ঘিরে মাসাই বল্লমধারীদের যুদ্ধং দেহিও এখন অতীতের বস্তু। শ্বেতাঙ্গ মানুষের পায়ের ছাপ পড়েনি এমন দেশে পদার্পণ করার দাবিও এখন একরকম অসম্ভব। হ্যাঁ, পুরোনো দিনের সে আফ্রিকা চলে গেছে,—আমার চোখের উপর দিয়েই চলে গেছে।

তাই এ বইকে বলা যেতে পারে, হিংস্র পশু শিকারের শেষ কয় বছরের উল্লেখযোগ্য কাহিনী। পৃথিবীর আর কোথাও এত শিকার নেই, কোথাও জীবজন্তু এত বড় বা এত বেশি যা এত শক্তিশালী নয়। কিন্তু সে দিনের তো প্রায় অবসান হয়েছে, তাই কোন কোন পাঠকের হয়ত পৃথিবীর ইতিহাসের সেই সর্বশ্রেষ্ঠ শিকার কাহিনী শোনবার আগ্রহ হতে পারে।

॥ ২ ॥ স্কটল্যাণ্ড—জন হাণ্টার

দক্ষিণ স্কটল্যাণ্ডের শীযারিংটনের সন্নিকটে ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দে আমার জন্ম হয়। আমার বাবা ছিলেন ও অঞ্চলের একটা সেরা গোলাবাড়ির মালিক,—তিনশো একর ভাল চাষের জমি আর তিন বর্গমাইল চারণ-ভূমি নিয়ে সেই গোলাবাড়ি। বংশপরম্পরায় শুনে আসছি, আমার কোন সুদূর পূর্বপুরুষের পেশা ছিল শিকার,—সেইঅবধি হাণ্টার নামটা পদবি হিসেবে আমাদের বংশে চলে আসছে,—সুতরাং শিকারের প্রতি আকর্ষণ যে আমাদের রক্তে প্রবাহিত হবে, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। সময় পেলেই বাবা পাখি ধরার সরঞ্জাম নিয়ে সলোয়ে ফার্থের চতুর্দিকের জলার উদ্দেশে বেরিয়ে পড়তেন, আর আমার বড় ভাই ছিল স্কটল্যাণ্ডের শ্রেষ্ঠ প্রকৃতিতত্ত্ববিদদের অন্যতম। মা-ই ছিলেন আমাদের সংসারে একমাত্র ব্যক্তি যিনি শিকার করতেন না,—সংসার সামলে চলতেই তাঁর সমস্ত সময় কেটে যেত।

যা ছিল সংসারের আর সকলের কাছে অবসর বিনোদন মাত্র, আমার কাছে তাই কিন্তু ছিল জীবনের একমাত্র আকর্ষণ। নিতান্ত শৈশব থেকেই আমি ছোট ছোট পা ফেলে টলতে টলতে বাবার পিছু পিছু ঘুরতাম গুলির খালি কৌটোর লোভে,—বারুদের যে অপূর্ব গন্ধ তাতে লেগে থাকত তাই শুঁকতাম। একটু বড় হতে বিশাল জলা লোচার মস্-এই আমার সমস্ত দিন কাটত। কালো কালো অগুনতি পাখি সেখানে দেখা যেত, আর অসংখ্য হাঁস আর

কালো-মাথাওয়ালা গাল্ পাখি এমনভাবে সেখানে বাসা বাঁধত যে তাদের ডিম না মাড়িয়ে হাঁটাই ছিল এক সমস্যা। দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফলে আমি সেই জল-ভিতর দিয়ে পথ চিনতে পেরেছিলাম। ওপথে চলতে চলতে কতবার পাখি তাড়িয়ে তাদের ডিম তুলে নিয়েছি। ফলে জামাকাপড়ের চরম দুর্দশা হয়েছে, কারণ হাজার হাজার পাখি আমার মাথার উপর উড়তে উড়তে তাদের বিষ্ঠায় আমার সর্বাঙ্গ ভরিয়ে দিয়েছে। তা ছাড়া কতবার শ্যাওলা-ভরা কাদা-জলে সমস্ত হাত ডুবিয়ে দিয়েছি। আমার তো বিরক্তি ও হতাশার একশেষ, যদিও আমার কাছে এর প্রতিটি মুহূর্ত ছিল পরম উপভোগ্য। আজ পর্যন্ত আমি চোখ বুজিয়ে সেই বিস্তীর্ণ জলার অন্ধিসন্ধি ঘুরে আসতে পারি।

আমার যখন আট বছর বয়স সেই সময় একদিন বাবার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে তাঁর বন্দুকটা নিয়ে শিকার করতে বেরিয়ে গিয়েছিলাম। বন্দুকটা ছিল পুরোনো পার্ডি, এবং আমার ধারণা, পার্ডি শট্‌গানই হল এ পর্যন্ত যত বন্দুক তৈরি হয়েছে সে সবের সেরা। আজ একটা পার্ডির দাম পড়বে কেনিয়ায় খাপশুদ্ধ প্রায় হাজার গিনির কাছাকাছি; এবং ওর পক্ষে এ দাম মোটেই অতিরিক্ত নয়। বন্দুকটা বাবা তাঁর এক বন্ধুর কাছ থেকে কিনেছিলেন, সেই বন্ধু আবার পেয়েছিলেন তাঁর এক বন্ধুর কাছ থেকে। সুতরাং কত গুলি যে এতে ছোড়া হয়েছে তার কোন হিসেব নেই। কিন্তু এত ব্যবহার সত্ত্বেও এর ব্রীচ অ্যাকশন এখনো নতুনের মত, আর ব্যাল্যান্স কি অপূর্ব! প্রথম দিন বন্দুকটা নিয়ে আর-একটু হলে নিজের পায়েই গুলি করে বসেছিলাম। প্যাট্রিজের পিছু নিয়ে পা টিপে টিপে অগ্রসর হতে হতে উত্তেজনার মাথায় কখন হঠাৎ ঘোড়াটা টিপে ফেলেছি। ব্যাপারটা শুনে বাবা অত্যন্ত ঘাবড়ে গেলেন বটে, কিন্তু তবুও তিনি আমাকে বন্দুকে হাত দিতে বারণ করলেন না। অবিলম্বেই আমি বন্দুকটার সঠিক ব্যবহারে রপ্ত হয়ে উঠলাম। রোজ রাত্রে আমার ঘরে বসে বন্দুকটা পরিষ্কার করতাম আর তাতে তেল মাখাতাম। শেষ পর্যন্ত বন্দুকটা রুপোর মত ঝকঝক করতে লাগল, ব্রীচের উপরের খোদাই করা লেখাটা প্রায় মিলিয়ে গেল।

পার্ডিটা দিয়ে আমি সমতল অঞ্চলে অনেক পাখিই মারলাম। মুরগির ঝাঁক বালির মধ্যে প্রচুর হট্টগোল করে পোকা খেত, শিখলাম কিভাবে তাদের পিছু নিতে হয়। কোলাহল থামতেই একেবারে নিস্পন্দ হয়ে থেমে দাঁড়াতাম, কারণ আমি জানতাম এবার তারা মাথা তুলে এদিক ওদিক

কাবে। রাত্রে বিছানায় শুয়ে মাথার উপরে বুনো হাঁসের ডাক শুনতে পেতাম,—ঝড়ের সঙ্গে লড়াই করে চলেছে। ব্যাগ-পাইপের বাজনার চেয়েও তাদের এ শব্দ আমার বেশি প্রিয়। তারপরেই আমি ঘুমিয়ে পড়তাম,—স্বপ্নের ঘোরে চলে যেতাম সেই জলার বুকে, যেখানে ঘুরে ফিরে বেড়াতাম।

মাছ ধরাও যে অবহেলা করেছি তা নয়। বেতের ডাল কেটে নিয়ে লোচারের জলে ছিপ ফেলে কতদিন যে কেটেছে তার হিসেব নেই। অধিকাংশ দিনই টর্চ আর বল্লম নিয়ে রাত করে ফিরেছি—বল্লম নেওয়ার কারণ, টর্চের আলোয স্যামনের চোখ ধাঁধিয়ে যায়, তখন ক্ষিপ্রহাতে নিক্ষেপ করতে পারলে বল্লমের জোর আঘাতে তাকে গেঁথে ফেলা কিছু অসম্ভব নয়। কাজটায় যথেষ্ট নিপুণ হাতের প্রয়োজন, কারণ জলে প্রবেশ করবার সময় বল্লমটা যেন বেঁকে যায় একটু। সেটুকু হিসেবের মধ্যে আনতে পারলে তখন আর কোন অসুবিধে নেই।

আরও বড় হতে গ্রামের মানুষরা যে সুপ্রাচীন ও বহু সম্মানের শিকারে আমার হাতেখড়ি দিয়ে দিল, উপযুক্ত কোন ভাল নামের অভাবে তাকে চোরাই শিকারই বলা হয়, যদিও তাতে কুশলতার প্রযোজন অত্যন্ত বেশি। দক্ষিণ স্কটল্যাণ্ডে অনেক ভাল ভাল চোরাই শিকারী ছিল বটে, কিন্তু আমার সমকক্ষ তারা কেউ ছিল না। পার্ডি আর ছিপের নেশা থেকে যখনই সময় পেয়েছি ফাঁদ পাতা আর জাল ফেলার কাজে লাগিয়েছি। কত অন্ধকার রাতে সিল্কের জালটা গলায় স্কার্ফের মত ভঙ্গিতে জড়িয়ে গুঁড়ি মেরে বেরিয়ে পড়েছি। কান পেতে পেতে এগিয়ে চলেছি কখন মালীর পায়ের শব্দ বরফ-পড়া মাটিতে ফুটে উঠবে। মালীদের হাতে বন্দুক থাকত এবং সে বন্দুকের ব্যবহারে তারা যে খুব বীতস্পৃহ ছিল তাও নয়; মানুষের জীবনের মূল্য তাদের হিসেবে একটা মুরগি বা একটা খরগোসের জীবনের চেয়ে বেশি নয়। অবশ্য এর ফলে যে দমে যেতাম তা নয়, বরং এই অভিযান আরও উত্তেজনাময় হয়ে উঠত, এবং আমার প্রায়ই মনে হয় যে মালীদের ফাঁকি দেবার এই ছেলেবেলার অভ্যাস পরবর্তী জীবনে হিংস্র জন্তু শিকারের ব্যাপারে আমার অশেষ কাজে লেগেছিল। এ ব্যাপারে আমার সঙ্গী ছিল আমার কুকুর, চমৎকার শিক্ষা পেয়েছিল সে। মালীদের সাড়া পেলেই সে আমায় সতর্ক করে দিত। একবার হয়েছিল কি, সে আর আমি উবু হয়ে শুয়ে একজোড়া

মালীদের চোখে ধুলো দিয়েছিলাম,—আমাদের থেকে মাত্র দশ গজ দূরে থেকে তারা অবাক হয়ে ভাবছিল এর মধ্যে আমরা কোথায় লুকিয়ে পড়তে পারি। সেসব আমাদের বড় ভাল দিন গেছে; প্রায়ই মনে হয়, মালীর চোখের আড়ালে একটা খরগোস শিকার করবার মধ্যে যে উত্তেজনা ছিল, পরবর্তী জীবনে দুশো পাউণ্ড ওজনের দাঁতওয়ালা হাতি শিকারেও তার চেয়ে বেশি উত্তেজনা ছিল কি না সন্দেহ।

বেশি রাতে বাড়ি ফিরে প্রায়ই দেখতাম একটা আলো জ্বলছে—অর্থাৎ আমি যে বাড়ি নেই বাবা মা তা জানতে পেরেছেন এবং আমাকে প্রশ্ন করবার জন্যে জেগে রয়েছেন। আমি তখন শিকার লুকিয়ে রেখে পেছনের সিঁড়ি দিয়ে গুঁড়ি মেরে উঠে যেতাম। সেই পুরোনো সিঁড়ির কোথায় কোথায় কঁ্যাচকোঁচ আওয়াজ হয় তা আমার মুখস্থ ছিল। সেগুলো এড়িয়ে নিঃশব্দে উঠতে হত। তারপর শুধু জামা কাপড় খুলে ফেলে বিছানায় শুয়ে পড়া। পরে বাবা মা উপরে উঠে এসে আমায় দেখে যখন মনে করতেন আমি অঘোর ঘুমে ঘুমোচ্ছি, অবাক হয়ে মা জিজ্ঞেস করতেন, 'আরে, ছেলেটা কোথায় ছিল তাহলে?' আমার ধারণা, আসল ব্যাপারটা বাবা ঠিকই বুঝতে পারতেন; কিন্তু একবারের জন্যেও তিনি আমায় ফাঁসিয়ে দেন নি।

এভাবেই আমি বড় হয়ে উঠেছি। চাষবাসের কাজে আমার একটুও উৎসাহ ছিল না, আর তার চেয়েও কম উৎসাহ ছিল নীযাবিংটনের মানুষদের ব্যাপারে। কারণ, শুধু যে বন্দুকের হাত ভাল ছিল না তাই নয়, ফাঁদ পাতার ব্যাপারে বা বল্লমে মাছ গাঁথার ব্যাপারেও তাদের হাত ভাল ছিল না। আমার জীবনে একমাত্র বিরক্তিকর ব্যাপার ছিল স্কুল। দেরি করে স্কুলে যাওয়া আমার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, কারণ জলার পাশ দিয়ে যাব অথচ পাখিগুলোর নড়াচড়া একটু লক্ষ্য করব না, এ চিন্তা ছিল আমার পক্ষে অসহ্য। আমাদের মাস্টারমশায় ছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠুর প্রকৃতির। বেতের ব্যবহারে তিনি ছিলেন মুক্তহস্ত, যদিও তাঁর প্রিয় শাস্তি ছিল ছেলেদের মাথায় ঘুসি মারা,—প্রথমে একদিকে, তারপর অপরদিকে—যতক্ষণ না ছেলেদের কানে কালশিরা পড়ে যাচ্ছে আর তারা প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়ছে। এই প্রহারের ফলে আমার অনেক সহপাঠী ভবিষ্যৎ জীবনে কানে খাটো হয়ে পড়েছিল। আমি ছিলাম খুব শক্ত সমর্থ, তাই মাস্টারমশায় যত বেতই মারুন, সরাসরি গায়ে হাত তুলতে বিশেষ সাহস করতেন না। কিন্তু একদিন একটা ব্যাপারে আর

তিনি নিজেকে সামলে রাখতে পারলেন না। আমার বয়স তখন চোদ্দ। জলার মধ্যে দিয়ে কাদামাখা হয়ে স্কুলে গিয়ে পৌঁছেছি, এ অবস্থায় আমায় দেখে মাস্টারমশায় ক্রোধে আত্মহারা হয়ে ঘুসির পর ঘুসি মেরে চললেন যতক্ষণ না আমার চোখ দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এল। যেভাবে পাগলের মত ঘুসি চালাচ্ছিলেন, আমার সত্যি ভয় হল হয়ত মেরেই ফেলবেন আমাকে। তাড়াতাড়ি স্লেটটা বাগিয়ে ধরে শরীরের সমস্ত শক্তি একত্র করে তাঁকে মারলাম,—পাখির ছানার সন্ধানে গাছে চড়ে চড়ে আর ভারি বন্দুক বয়ে বয়ে আমার শরীরে শক্তির অভাব ছিল না। টলতে টলতে কোন রকমে স্লেটটা ধরে সামলে নিলেন তিনি, আমিও সেদিনের মত স্কুল ছেড়ে সোজা লোচার মস্-এ গিয়ে উপস্থিত হলাম। এতক্ষণে আমি একা। বাড়ি যখন ফিরলাম, দেখলাম মাস্টারমশায় আমার আগেই এসে পড়েছেন, স্থানীয় ধর্মযাজককে সঙ্গে নিয়ে। বাবা অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু আমার বক্তব্য শোনবার পর আমাকে শাস্তি দেবেন না ঠিক করলেন; আর মা আমায় মিনতি করে বললেন সব সময় বন্দুক নিয়ে না ঘুরে একটু পড়াশুনোয় মন দিতে। যাই হোক, সেই থেকে মাস্টারমশায় আমায় ভয় করে চলতেন, আর আমিও সামান্য কিছুক্ষণ মাত্র স্কুলে কাটাতাম,—তার চেয়ে আমার ঢের ভাল লাগত মাছধরার সরঞ্জাম নিয়ে বা বন্দুক নিয়ে জলে জঙ্গলে ঘুরতে।

বাবা মা ধরে নিয়েছিলেন যে বাবার পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমিও চাষবাস করব। কিন্তু সেদিকে আমার একটুও ঝোঁক ছিল না। কিন্তু তবুও আমার মনে হল, কোন আপিসের চাকরির চেয়ে চাষবাস করা তবু মন্দের ভাল।

আমার বয়স যখন আঠারো তখন কিন্তু একটা খুব বিপদে পড়লাম। স্কটল্যাণ্ডের যে অঞ্চলের মানুষ আমরা, সেখানকার মেয়েরা কবি বার্ন্‌স্-এর সময় থেকে অতি সামান্যই পালটেছে; তাই কৃপা-কটাক্ষপাতে তারা ছিল অকৃপণ, এবং আমার ভাগ্যেও তা মিলেছিল। নিজেকে যতই বিজ্ঞ বা অভিজ্ঞ মনে করি, তখনও আমার ছোকরা বয়স ছাড়া কিছু নয়; ফলে আমার চেয়ে অনেক বড় একটি মেয়ের প্রতি আমার গভীর আকর্ষণ জন্মালো। হয়ত এ মোহ আমার এমনিতেই কেটে যেত যদি না ধর্মযাজক তাতে বাধা দিতেন। আমার সমস্ত পাপ-কর্মের ফিরিস্তি নিয়ে তিনি বাবা মার কাছে হাজির হলেন। বাড়ির সকলকে নিয়ে এক সভা বসল, সেই সভায় আমায় ডেকে হুকুম করা হল মেয়েটিকে ছেড়ে দেবার। কিন্তু সকলের সব কথা অগ্রাহ্য করে আমি শপথ

করে বললাম, ওকে আমি বিয়ে করব। ধর্মযাজক তো আমার আত্মার অকল্যাণ ও অনন্ত নরকের আশঙ্কা করে বিদায় গ্রহণ করলেন, আর বাবা মা ভেবেই পেলেন না কী করবেন।

স্বয়ং ধর্মযাজক আমার বিরুদ্ধাচরণ করায়, এবং সামান্য কজন যারা শীতের কঠোর দিনে আমার কাছে শিকারের দাক্ষিণ্য পেয়ে কৃতজ্ঞ কেবলমাত্র তাদের ছাড়া আর বিশেষ কারুর সুনজরে না থাকায় আমার অবস্থা হল প্রায় সমাজচ্যুতের সামিল। বাবা মা মহা আশঙ্কার মধ্যে রয়ে গেলেন—পাছে আমি আমার গোঁ বজায় রাখতে গিয়ে মেয়েটিকে বিয়ে করেই বসি। একদিন সন্ধ্যায় আমি মনমরা হয়ে একা বসে রয়েছি, এমন সময় বাবা এলেন দেখা করতে।

'জন, সংসারের সকলের সঙ্গে তোমার সম্বন্ধে কথা কয়েছি।' আমার বিছানার উপর বসে নিজের হাতের দিকে দৃষ্টি রেখে বাবা শুরু করলেন—'ভেবে দেখলাম, কোথাও যদি তুমি চলে যাও তাহলে ভাল হয়...এই ধর আফ্রিকায়, আমাদের কোন আত্মীয়ের এক সম্পর্কিত ভাই থাকে সেখানে। কেনিয়ার একটা শহর নাইরোবিতে তার একটা গোলাবাড়ি আছে। তুমি যদি যেতে রাজি হও তো তোমাকে তার আধা অংশীদার করে দিতে পারি।'

যে আত্মীয়ের কথা বাবা বললেন, আমি ভাল করেই জানি, সে যেমন অসামাজিক তেমনি কঞ্জুস। একটা পাই পয়সা তার হাত দিয়ে গলে না। আর তার এই আত্মীয় যদি তারই মত হয় তো আফ্রিকা আমার কাছে খুব একটা আরামের জায়গা হবে বলে মনে হল না। কিন্তু এসব আমি গ্রাহ্যও করলাম না। আফ্রিকায় আছে সিংহ আর হাতি আর গণ্ডার,—সে দেশই ঠিক আমার উপযুক্ত দেশ, সুতরাং আমি যাত্রা করতে প্রস্তুত। এবং সেই রাত্রেই বাবাকে জানালাম সে কথা।

ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বাবা দরজার কাছে থেমে দাঁড়ালেন একটু। বললেন, 'আমার পার্ডিটা তুমি নিতে পার।' বুঝলাম, সমস্ত অপরাধ তিনি ক্ষমা করেছেন।

কয়েক সপ্তাহ পরে আমি আফ্রিকার পূব উপকূলে মোম্বাসার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। সঙ্গে নিলাম পার্ডিটা, আর একটা ২৭৫ নম্বরের মসার রাইফেল। রাইফেলটা বেশ ভারি। এই অপূর্ব রাইফেলটা আমার এক কাকা বুয়র যুদ্ধ থেকে ফেরবার সময় সঙ্গে করে এনেছিলেন। স্কটল্যাণ্ডে আমাদের অঞ্চলে

সবচেয়ে বড় শিকার যা মেলে সে হল শজারু, তা মারতে এ রাইফেল বেজায় বড়, নিতান্ত বেমানান।

বিদায় দেবার সময় বাবা বললেন, 'জন, এই যে তুমি চললে, এর ফলে হয় তুমি মানুষ হবে, কিংবা একেবারে শেষ হয়ে যাবে। আমাদের একঘেয়ে জীবন-যাত্রা তুমি চাইতে না, তুমি চাইতে অ্যাডভেঞ্চার। বেশ, সেই সুযোগই তুমি পাচ্ছ। আফ্রিকা তোমার পক্ষে বিশেষ আরামের জায়গা হবে বলে মনে হয় না, কিন্তু ল্যাজ গুটিয়ে ফিরে এসে যেন আর তোমার লম্বা লম্বা বুলি আমাদের শুনিয়ো না; তখন তোমায় আর পাঁচজনের মত কোন একটা ভদ্র কাজে লেগে পড়তে হবে।'

কিন্তু এসব চিন্তা তখন আমার মনে কোথায়! আমার চোখে তখন ভাসছে সেই ভবিষ্যৎ দিনের ছবি: অসংখ্য গজদন্ত বহন করে আর ডজনখানেক পৃথিবীর রেকর্ড নিয়ে আমি ফিরেছি আর গ্রামের মানুষদের সেইসব দেখিয়ে বলছি, 'এই সেই ছেলে যাকে তোমরা এখান থেকে তাড়িয়ে ছেড়েছিলে!' বিশেষ করে আমার দুই পুরোনো বন্ধু, ধর্মযাজক আর মাস্টারমশায়কে একথা শুনিয়ে দেব।

তিন মাস সমুদ্রযাত্রার পর আমি মোম্বাসায় পৌঁছলাম। আমার মত এক অনভিজ্ঞ স্কচ বালকের পক্ষে এ যেন একেবারে তুলে নিয়ে হঠাৎ আরব্য রজনীর অন্তস্থলে নামিয়ে দেওয়া। বাজারে দেখলাম চিতাবাঘের ছাল বিক্রির জন্যে টাঙানো রয়েছে। সদ্য জঙ্গল থেকে আসা অর্ধনগ্ন আদিবাসিদেরও লক্ষ্য করলাম। শহরের অধিকাংশ বাড়িই খড়ে ছাওয়া, তাদের দেওয়াল সাদা—আর সমুদ্রের ধারে অনেক পুরোনো পুরোনো বাড়ি আছে, তাদের অনেকগুলো আবার এতই প্রাচীন যে মোম্বাসা যখন আরবদের সমৃদ্ধ শহর ছিল তখনকার তৈরি। এই বাড়িগুলোর খোদাই-করা সেগুন কাঠের তোরণ, বড়-বড় জানলায় লোহার শিকার বসানো—এ সমস্তই আমার কাছে যেমন অভিনব তেমনি বিস্ময়কর বলে মনে হল। যদিও তখন শীতের মাঝামাঝি, গ্রীষ্মপ্রধান দেশের তাপ শহরের সর্বত্র। স্কটল্যাণ্ডের টুইডের পোশাক পরে আমি প্রচুর ঘেমে চলেছি।

মোম্বাসায় বেশিক্ষণ থাকা সম্ভব নয়, নাইরোবির ট্রেন ধরে আমায় যেতে হবে উত্তরে। সন্ধ্যাবেলায় ট্রেন ধরলাম। পথের প্রথম অংশটা হল গ্রীষ্মপ্রধান দেশের ভিতর দিয়ে। স্টেশনে স্টেশনে আদিবাসিরা কলা, কমলালেবু, আঙুর

বিক্রি করছে, টাটকা গাছ থেকে তোলা। এইসব ফলকে আমি চিরকাল বিলাসের সামগ্রী হিসেবে ধরে 'এসেছি, এ দৃশ্য তাই আমার কাছে প্রায় অলৌকিক ব্যাপারের সামিল হয়ে উঠল।

সকালবেলায় ঘুম ভেঙে দেখি, ট্রেন পাহাড়ি অঞ্চলে এসে পৌঁছেছে। চারিদিকে কেবল প্রান্তরের পর প্রান্তরের বিস্তার, আর এখানে ওখানে বন্য জন্তুর ভিড়—শিকারীর স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হয়েছে। কত অজানা জন্তু চলমান ট্রেন দেখবে বলে ধীরে ধীরে মাথা তুলছে—উত্তেজনায় পাগল করা এ দৃশ্য। চিনতে পারলাম কেবল লম্বগ্রীব জিরাফকে, যদিও দশ-বারো রকমের বিভিন্ন জাতের গ্যাজেল আর অ্যান্টেলোপও তাদের মধ্যে চরছিল। অবশ্য কয়েক মাসের মধ্যেই এইসব বিভিন্ন জাতের শিকারের জন্তু আমার কাছে স্কটল্যাণ্ডের লোচার মস্-এর হাঁস আর মরালেব মতই পরিচিত হয়ে উঠেছিল।

বেলা দুপুর নাগাদ নাইরোবিতে পৌঁছলাম। তখন পর্যন্ত নাইরোবি ছিল কেবলমাত্র কয়েকটা কুটিরের সমষ্টি, দুয়েকটা পাকা বাড়ি কেবল এখানে ওখানে মাথা তুলতে শুরু করেছিল। স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলাম যাত্রীদের সঙ্গে স্থানীয় কুলিদের সোয়াহিলি ভাষায় কথা কওয়া,—এই ভাষা হল পূর্ব-আফ্রিকার সর্বত্র চালু ভাষা। কথা ছিল আমার আত্মীয় এখানে এসে আমায় নিয়ে যাবেন; আমি তাঁর প্রতীক্ষায় রইলাম।

প্রকাণ্ড আকৃতির এক মানুষ দেখলাম আমার দিকে এগিয়ে আসছে। তার মাথার চুল এলোমেলো, গালে নোংরা দাড়ি। মার্কিন কাউবয়ের মত তার কোমরে দুটো রিভলভার আটকানো, বেল্টে একটা ছুরি। আতঙ্কিত দৃষ্টিতে আমি এই অতিকায় প্রাণীটির দিকে তাকিয়ে রইলাম, প্রার্থনা করলাম, যেন এমন প্রাণী এ দেশে বেশি না থাকে!

আমার কাছে এগিয়ে এসে লোকটা গাঁক-গাঁক করে বললে, 'তুমি কি জন হাণ্টার?'

অনুতপ্তের স্বরে উত্তর করলাম, 'হ্যাঁ।'

'আমি তোমার আত্মীয়', একটা শপথ করে সে বলে বলে উঠল। পরে জেনেছিলাম যে শপথ না করে সে পারতপক্ষে কথাই কইত না। বললে, 'চল আমার সঙ্গে।'

মাইল কুড়ি দূরে তার গোলাবাড়ি। সমস্ত পথটা সে বক-বক করতে করতে আর শপথ কবতে করতে চলল আর থেকে থেকে সীটের পাশে রাখা

বোতল থেকে রাম্ (মদ্য বিশেষ) পান করতে লাগল। ওর কাহিনী শুনতে শুনতে আমি ঘেমে উঠলাম। আফ্রিকার উপকূলে একটা ফেরি জাহাজের ক্যাপ্টেন ছিল সে—সে জাহাজের কথা যা শুনলাম তাতে তাকে জলদস্যুর জাহাজ ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। অনেক রোমহর্ষক কাহিনীই সে আমায় শোনালো। যেমন তার কথাবার্তা, তার স্বভাবও যে তেমনি পাশবিক, এ আমার জানতে দেরি হয়নি। গোলাবাড়িতে পৌঁছে দেখা গেল, কয়েকটি স্থানীয় স্ত্রীলোক স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে হাসতে হাসতে আর বক-বক করতে করতে মাঠ দিয়ে হেঁটে চলেছে।

'হারামজাদাদের কতবার বারণ করেছি আমার জমি না মাড়াতে!' চিৎকার করে এই কথা বলে সে একটুও ভূমিকা না করে সঙ্গে সঙ্গে বড় রিভলভারটা টেনে নিয়ে তাদের লক্ষ্য করে গুলি করতে শুরু করল। আতঙ্কে চিৎকার করতে করতে মেয়েরা ছুটতে লাগল, একজন আবার পড়েই গেল হোঁচট খেয়ে। গুলি মাটিতে লেগে যে ধুলো উড়ল সেই ধুলোয় মেয়েটির কালো পিঠ ভরে যাচ্ছে—এ দৃশ্য দেখে সে বিকট হাসিতে ফেটে পড়ল। কেউ আহত হয়েছে কি না ঠিক বোঝা গেল না, সবাই মহা আতঙ্কে পালিয়ে প্রাণ বাঁচালো। ওদের এই আতঙ্ক দেখে আমার আত্মীয়ের যে কী অট্টহাসি!

বাড়ি বলতে একটা কাদামাটির কুটির, একটিমাত্র ঘর সেখানে। সেই একটি ঘরকে আমি আসছি বলে দু-ভাগে ভাগ করা, দেয়াল থেকে দেয়ালে টাঙানো একটা কাপড়ের পর্দা দিয়ে। পাতলা কাপড়ের পর্দা, ওরা একে বলে 'আমেরিকেন,' কারণ যুক্তরাষ্ট্র থেকে এগুলো এখানে পাঠানো হয়েছিল স্থানীয়দের সঙ্গে বিনিময় ব্যবসার জন্যে। লোকটা তার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল—ছোটখাটো রোগা মানুষটি, এককালে প্রচুর রূপ ছিল বলে মনে হয়। আমাকে অভ্যর্থনা জানাবার মত সাহসও তাঁর ছিল কি না সন্দেহ; কারণ দেখলাম, যখনই স্বামী তাঁর সঙ্গে কথা কইছে তখনই তিনি, এ ক্ষেত্রে যা খুবই স্বাভাবিক, যেন লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছেন, কারণ তার কথার সঙ্গে সঙ্গে প্রহারও সমানে চলছিল। ঘরের একটা অংশ আর একটা ক্যাম্পখাট আমায় দেওয়া হল। সেই খাটে আমি শুয়ে পড়লাম; জীবনে কখনো এমন অস্বস্তিকর পরিবেশের মধ্যে পড়িনি।

পরের দিন সকালে আমি তার সঙ্গে গেলাম খেতের কাজ দেখতে। চরম অবহেলার চিহ্ন সর্বত্র। চাষবাস সম্বন্ধে যেটুকু জ্ঞান আমার ছিল তা থেকেই

বুঝলাম যে কাজ যা হচ্ছে সমস্তই ভুলভাবে হচ্ছে। লোকটা চাষী পরিবারের ছেলে নয়, তবু যে কেন ও এ কাজে নামল বুঝলাম না। হয়ত আর তার সমুদ্র-উপকূল অঞ্চলে মুখ দেখাবার উপায় নেই বলেই বাধ্য হয়ে এই করতে হয়েছে। বোঝাতে চেষ্টা করলাম কিভাবে মাটিতে সার দিতে হয়, কিভাবে জলসেচের ব্যবস্থা করতে হয়; কিন্তু আমার মত ছোকরার কথায় কান দেবার পাত্রই সে নয়। লোকটার পাশবিক প্রবৃত্তি আমার কাছে অসহ্য হয়ে উঠল। যেভাবে সে ভৃত্যদের লাথি মারত আর প্রহার করত তাতে মনে হয় নিছক আনন্দ পেত বলেই তা করত; আর গরুগুলোকে একটা কাঁচা চামড়ার ছিপ্‌টি দিয়ে এমন প্রহার করত যে তারা প্রায় মানুষের মত করে কেঁদে উঠত।

তিন মাস আমি তার সঙ্গে রইলাম। এর মধ্যে আফ্রিকা সম্বন্ধে কিছুই শিখতে পারিনি কেবল সোয়াহিলি ভাষা ছাড়া। ব্রিটিশ ঈস্ট আফ্রিকায় অসংখ্য ভাষা থাকা সত্ত্বেও এই ভাষারই প্রচলন খুব বেশি, প্রায় সবাই এই ভাষায় কথা বলে—আর এর বাইরেও সর্বত্রই কিছু না কিছু মানুষ আছে যারা এ ভাষা জানে। খেতের কাজ সম্বন্ধে তাকে আমার কিছুই বলবার উপায় নেই, ফলে চাষের অবস্থা দিনের পর দিন ক্রমেই অবনতির পথে চলল। রোজ রাত্রে সে তার স্ত্রীকে গালাগাল করত, আর সেইসঙ্গে প্রহারও চলত সমান তালে। ছেলেমানুষ আমি কীই বা করতে পারি! এ সত্ত্বেও রয়ে গেলাম আমি—ল্যাজ গুটিয়ে ফিরে আসা সম্বন্ধে যাবার মন্তব্যের কথা মনে করে। কল্পনা করলাম চুপিচুপি আমি শিয়ারিংটনে ফিরে এসেছি, বাড়ির সকলকে অনুরোধ করছি আমায় ফিরিয়ে নিতে আর ধর্মযাজক ও মাস্টারমশায়ের কাছে হেঁটমুণ্ডে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। ওঃ, শয়তানদুটোর তখন কী আমোদই না হবে! আমার সমস্ত স্বপ্নের, সমস্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষার শেষ হবে তখন। কিন্তু রক্তমাংসের শরীরে এ তো আর সহ্য করাও সম্ভব নয়। অগত্যা জিনিসপত্র যা ছিল সমস্ত গুছিয়ে নিয়ে পাশের গোলাবাড়ির মালিকের গাড়ি করে নাইরোবিতে ফিরে গেলাম।

সামান্য যা টাকা ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়ায় ছিল তা থেকে ফিরতি পথের খরচের মত টাকা তুলতে গেলাম। আমার উচ্চারণে স্কচ্ টান লক্ষ্য করে কাউণ্টারের ওপার থেকে ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, 'স্কটল্যাণ্ডের কোন অঞ্চলে তোমার দেশ ভাই?' তার কথাতেও স্কচ্ টানের আভাস।

বললাম, 'শিয়ারিংটনে, ডামফ্রিজ থেকে সাত মাইল দূরে।'

'তাই নাকি ? তবে তো তুমি আমার ভাই, আয়ারশায়ার ইম্পিরিয়্যাল ইয়োম্যানরির মেজর ক্রুইকশ্যাঙ্ক্‌স্‌কে চিনবে ?'.

এখন, আয়ারশায়ারে আমি ছিলাম একজন ট্রুপার, আমার অফিসার ছিলেন মেজর ক্রুইকশ্যাঙ্ক্‌স্‌। তাঁর সঙ্গে আমার সদ্ভাব ছিল।

এ কথা শুনে ব্যাঙ্কের ভদ্রলোক আর কোন কথাই শুনতে রাজি নন, তাঁর কাছে বসে আমার সমস্ত অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী শোনাতে হল। যখন শুনলেন আমি হার মেনে বাড়ি ফিরে চলেছি, সে কথায় কানই দিলেন না তিনি।

বললেন, 'স্কটল্যাণ্ডের মানুষ কখনো হার মানে না ভাই; ওসব কথা আর আমি শুনছি না। আমার এক বন্ধু রেলে কাজ করে, সে তোমায় একটা গার্ডের চাকরি দেবে। যতদিন না ভাল কিছু মিলছে ততদিন এতেই তোমার চলে যাবে।'

এর সপ্তাহখানেক পরেই আমার মোম্বাসা নাইরোবি রেলপথে গার্ডের চাকরি জুটে গেল। তিন মাস আগে এই পথেই আমি এসেছিলাম। একটা সুন্দর খাকি পোশাক আমায় দেওয়া হল, তার বুকে আড়াআড়িভাবে বেল্ট লাগানো। এ পোশাক অবশ্য আমার একটুও ভাল লাগত না, এবং গাড়িতে কোন রেলের কর্মচারী না থাকলে কখনো পরতাম না। দেখলাম রেলের গার্ড হলে শিকারের খুব সুবিধে। প্রায়ই চোখে পড়ত, লাইনের ধারেই কোন সিংহ তার শিকার-করা প্রাণীকে খেয়ে চলেছে, এবং ভোরের দিকে বা সন্ধ্যার দিকে যেকোন দিন চিতাবাঘের দেখা পাওয়া যেত। গার্ডের খাবার রাখার জায়গায় আমার মসার বন্দুকটা রাখতাম, আর যখনই বেশ একটা মনের মত কিছু চোখে পড়ত, জানলায় ঝুঁকে পড়ে গুলি করতাম। তারপরেই চেন টেনে গাড়ি থামানো, আর একটা স্থানীয় ছেলের সঙ্গে লাফিয়ে পড়ে গিয়ে তার ছালটা ছাড়িয়ে নেওয়া। তখনকার দিনে মানুষজনের অত তাড়া ছিল না, আর ইঞ্জিনের ড্রাইভারদের ও সাহায্য পাওয়া যেত। ইঞ্জিনিয়ার লোকটিও বেশ উৎসাহী ছিল; আর সামনের দিকটা তার দেখার সুবিধে থাকায় কোন শিকার চোখে পড়লে সে হুইস্‌ল্‌ দিয়ে জানিয়ে দিত। তিনটে হুইস্‌লের অর্থ চিতাবাঘ, আর দুটোর অর্থ সিংহ। আর যদি কেবল কোন যাত্রী তোলবার দরকার হত তা হলে একটা হুইস্‌ল্‌।

একদিন ইঞ্জিনিয়ার অনেকগুলো হুইস্‌ল্‌ দিয়ে উঠল। জানলা দিয়ে তাকিয়ে জীবনে এই প্রথম দেখলাম একপাল হাতি,—রেললাইনের পাশের

একটা ঝোপে একমনে খেয়ে চলেছে। এর আগে আমি কখনো হাতি দেখিনি, কিন্তু তা হলে কী হয়, রাইফেলটা বাগিয়ে ধরে ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়লাম। ইঞ্জিনিয়ার তাড়াতাড়ি ছুটে এল আমায় বাধা দিতে। বললে, 'দেখতে বলেছি,—গুলি করতে বলি নি। যদি ওরা আমাদের তাড়া করে আসে তাহলে কী হবে বল তো?'

'ভয় নেই, খরগোসের মত ওদের গুলি করে মারব।' আমি আশ্বাস দিলাম।

দু-জনে একসঙ্গে চুপিচুপি হাতির পালের দিকে অগ্রসর হলাম। বুদ্ধি করে যেদিকে বাতাস বয়ে যাচ্ছিল সেদিক থেকে ওদের দিকে অগ্রসর হলাম,— আমাদের গন্ধ ওরা পায় নি। কাছাকাছি যখন এসে পড়েছি, দলটা ততক্ষণে চরতে চরতে আমাদের আর ট্রেনটার মাঝামাঝি জায়গায় এসে পড়েছে। সবাই যে দল বেঁধে একসঙ্গে এগিয়ে আসছিল না নয়, উঁচু ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছিল তারা। হঠাৎ মনে হল যেন ওরা আমাদের চারিদিকে এসে পড়েছে; তবে, তখনও আমাদেব হাওয়া ওদের কাছে পৌঁছয় নি, নতুবা ওরা গন্ধ পেয়ে ভয়ে পালাতো। ইঞ্জিনিয়ার ছিল একটু নার্ভাস প্রকৃতির মানুষ, সে আমায় গুলি করতে বারণ করল, বললে তাহলে সবাই ভয় পেয়ে দৌড়তে শুরু করবে আর আমরা ওদের পথে পড়ে যাব। তাই সে আমায় ওখান থেকে চলে যেতে অনুনয় করল।

কিন্তু গুলি না করে আমি কিছুতেই নড়ছি না। হাতি শিকারের কোন অভিজ্ঞতাই আমার ছিল না এবং এও আমার জানা ছিল না যে হাতির শরীরের মাত্র কয়েকটা জায়গাই ২৭৫ গুলির পক্ষে ভেদ করা সম্ভব। তা সত্ত্বেও আমি আমার মসার বাগিয়ে ধরলাম, তারপর একটা চমৎকার দাঁতাল হাতি বেছে নিয়ে তার কাঁধ লক্ষ্য করে ঘোড়া টিপে দিলাম।

মুহূর্তমধ্যে শুরু হল এক বীভৎস নারকীয় কাণ্ড। ভীষণ বৃংহিত ধ্বনি তুলে হাতির পাল চারিদিকে দৌড়তে শুরু করল। আমাদের পায়ের নিচে মাটি কাঁপতে লাগল। কয়েকটা হাতি তো আমাদের প্রায় গা ঘেঁসে চলে গেল। ধুলো যখন কেটে গেল, দেখলাম ইঞ্জিনিয়ার হাঁটু পেতে বসে প্রার্থনা করছে, আর হাতিটা পড়ে যায় নি। যখন বললাম চল হাতিটার পিছু নেওয়া যাক, উত্তরে সে শুধু বললে, 'ঈশ্বরের অসীম কৃপায় যদি এ যাত্রায় আবার ট্রেনে ফিরে যেতে পারি তো ভুলেও আর এমন ট্রেন থেকে নামছি না!' পরে জেনেছিলাম

যে আমার গুলি একেবারে ব্যর্থ হয় নি, কারণ পরদিন মোম্বাসা থেকে ফেরার পথে দেখা গেল হাতিটা রেল লাইনের কাছেই মরে পড়ে রয়েছে। ট্রেন থামিয়ে গিয়ে খুলে নিলাম দাঁতদুটো। পাঁচ টাকা পাউণ্ড হিসেবে দুটো দাঁতের দাম পেলাম সাঁইত্রিশ পাউণ্ড—গার্ড হিসেবে আমার দু-মাসের মাইনের চেয়েও বেশি।

এই প্রথম আমার খেয়াল হল যে শিকারী হিসেবেও জীবন ধারণের উপযুক্ত অর্থ উপার্জন করা সম্ভব—বেশ ভাল উপার্জনই সম্ভব। স্কটল্যাণ্ডে শিকার হল একটা অবসর বিনোদন মাত্র, এ ছিল বিশেষ ধনীদের জন্যে। শিকার করে যে জীবিকা নির্বাহ করা যায়, এ এমনই একটা সুখবর যে বিশ্বাস করাই কঠিন, —অথচ নাইরোবিতে সত্যিই অমন লোকের অভাব নেই। রেলের গার্ড হওয়ার একটা সুবিধে এই যে অনেক মানুষের সঙ্গে আলাপের সুযোগ মেলে। সেকালের কয়েকজন বিখ্যাত শ্বেতাঙ্গ শিকারীর সঙ্গে আমার আলাপ হল,—শিকারীদের এমন বিচিত্র সমাবেশ অতি অল্পই দেখা যায়। অ্যালান ব্লেক মেরেছিল চোদ্দটা সিংহ, তাদের ল্যাজগুলো দিয়ে সে তার টুপি সাজিয়েছিল। বিল জাড ছিল আফ্রিকার শ্রেষ্ঠ শিকারীদের অন্যতম, একটা খ্যাপা হাতির কবলে পড়ে শেষ পর্যন্ত তার মৃত্যু হয়। ফ্রিট্জ্ স্কিণ্ডেলার সর্বদা নিখুঁত সাদা ব্রীচেস পরত; তার দেহে নাকি রাজরক্ত ছিল। রয়্যাল হাঙ্গারিয়ান হাসারদের দলে সে ছিল অফিসার, ঘোড়ায় চড়ে সিংহের পেছনে ধাওয়া করে শিকার করত; শেষ পর্যন্ত এক সিংহের কবলে তার মৃত্যু হয়—সিংহটা তাকে ঘোড়ার উপর থেকে টেনে নিয়ে যায়। বুড়ো কারামোজো বেল-এর সঙ্গে দেখা হল, একটা হালকা ওজনের '২৫৬ রাইফেল দিয়ে সে হাতি শিকার করত—বড় বড় হাতির শরীরের দুর্বল অংশগুলো তার এত ভাল করে জানা ছিল যে এর চেয়ে ভারি অস্ত্র তার দরকার হত না। মার্কিন শিকারী লেসলি সিম্পসনের সঙ্গেও আলাপ হল, তার সময়ের সবচেয়ে বড় সিংহশিকারী হিসেবে তার খ্যাতি ছিল—এক বছরে সে ৩৬৫টা সিংহ মেরেছিল। এরাই ছিল আমার আদর্শ পুরুষ, আমার খুব ইচ্ছে হত আমিও এদের মত হই।

শিকারকে জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করে প্রথমে চামড়ার জন্যে সিংহ শিকার শুরু করলাম। সিংহচর্মের দাম মোম্বাসায় এক পাউণ্ড হিসেবে একটা। চিতাবাঘের চামড়ারও প্রায় তাই। তখন সাভো অঞ্চলে অসংখ্য সিংহ ছিল,—নাইরোবি থেকে শ-দুই মাইল দূরে এ জায়গা। সিংহকে একটা উৎপাত বলেই ধরা হত, কারণ তারা গরুবাছুর তো মারতই, সুবিধে পেলে মানুষ মারতেও ছাড়ত না। রেল লাইনে কাজ করতে করতে অসংখ্য কুলি সিংহের কবলে মারা পড়ার ফলে কয়েক বছর আগে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল যে যতদিন না এ অঞ্চলের সমস্ত সিংহ মেরে শেষ করা হচ্ছে ততদিন কাজ বন্ধ রাখার আদেশ হয়েছিল।

আমার ব্যক্তিগত মত হল এই যে, সিংহরা মানুষখেকোয় পরিণত হবার জন্যে দায়ী কুলিরা নিজেরাই। মৃত কুলিদের কবর দেওয়ার জন্যে রেল কোম্পানি যথেষ্ট টাকা দিত, কিন্তু তবুও তারা তা না করে ঝঞ্ঝাট এড়াবার জন্যে মৃতদেহগুলো জঙ্গলের আড়ালে রেখে আসত আর সেখানে সেগুলো সিংহ বা হায়েনার পেটে যেত। সিংহের অভ্যাস হল খুব পরিষ্কার করে খেয়ে ফেলা। খেয়ে খেয়ে নরমাংসের উপর তাদের এমন লোভ জন্মাতো যে বছরের পর বছর তারা অসংখ্য মানুষ খেয়ে চলত।

সিংহ শিকার অত্যন্ত বিপদজনক ব্যাপার। নাইরোবিতে এমন অসংখ্য কবর দেখা যাবে যার উপর লেখা—'সিংহের কবলে মৃত'। প্রায় জন-চল্লিশ শিকারী নাইরোবি অঞ্চলে ছিল, তাদের মধ্যে অন্তত জন কুড়ি কোন না কোন সময়ে সিংহের কামড় খেয়েছে। সিংহের স্বভাব সম্বন্ধে প্রায় কোন খবর না রেখেই আমি আমার মসার রাইফেলটা আর একটি স্থানীয় বালককে সঙ্গে নিয়ে বিখ্যাত সিংহশিকারী হব এই উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

সিংহশিকার করতে হলে সিংহের চিন্তাধারা ও স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা দরকার। কুকুরকে বোঝা কঠিন নয়, কারণ কুকুরের চিন্তাধারা মানুষেরই মত কতকটা। কিন্তু সিংহ হল বেড়াল জাতীয়; অদ্ভুত ধরনের জন্তু। তার ব্যবহার তার মেজাজের উপর অনেকখানি নির্ভর করে। ঝোঁকের মাথায় কখন যে কী করে বসে তার ঠিক নেই। আবহাওয়ার পরিবর্তনও তাদের মধ্যে প্রচুর পরিবর্তন আনে। বর্ষাকালে তারা খানিকটা

নার্ভাসগোছের হয়ে পড়ে, তখন তাদের কর্মশক্তি ও একাগ্রতা বৃদ্ধি পায়; আর খর গ্রীষ্মের সময় তারা হয়ে পড়ে অলস; তাদের উৎসাহে ভাঁটা পড়ে। সাধারণত রাত্রেই তারা শিকারে বেরোয়,—অন্ধকারে যেন তাদের মধ্যে উদ্দীপনার সঞ্চার হয়। রাত যত অন্ধকার, সিংহের দেখা মেলার সম্ভাবনা ততই বেশি। পূর্ণিমার রাত্রে সিংহ কিছু শিকার করেছে, এমন নজির বড়-একটা মেলে না বলতে গেলে। মানুষ ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে প্রবেশ করে সিংহ শিকার করেছে এমন ঘটনা যেমন দুর্লভ নয়, তেমনি মানুষের লোভে মানুষ-বোঝাই লরি আক্রমণ করে লরি প্রায় উল্টে দিয়েছে, এমন সিংহের কথাও শোনা গেছে। সে কাহিনী পরে বলছি।

সিংহ সঙ্গপ্রিয় প্রাণী, তারা দল বেঁধে থাকতে ভালবাসে: কুকুররা যেমন আনন্দ করে একসঙ্গে ঘোরে ফেরে, সিংহের সঙ্গপ্রিয়তাটা ঠিক সেই পর্যায়ের না হলেও সিংহ যদি জানে যে সে নিঃসঙ্গ নয় তাহলে নিশ্চিন্ত থাকে সে। সিংহের দলকে ইংরেজিতে বলা হয়, 'প্রাইড'। খুব পুরোনো এই কথাটা, এবং কয়েক শতাব্দীর অব্যবহারের পরে আবার আফ্রিকায় নতুন করে ব্যবহৃত হচ্ছে,—এখন তো প্রায় সকলের মুখে মুখে। এক একটা প্রাইডে আঠারোটা পর্যন্ত সিংহ আমি দেখেছি,—খুব বুড়ো পুরুষ সিংহ থেকে শুরু করে মায়ের-ল্যাজ-নিয়ে-খেলা-করা সদ্যোজাত বাচ্চাও থাকে সে দলে। সিংহ বহুপত্নীক প্রাণী; প্রতিটি সিংহীর ঋতুকালে সিংহ তাকে দল থেকে সরিয়ে এনে কিছুদিন সঙ্গদান করে, তারপর আবার গিয়ে দলে যোগ দেয়। এক দলে একাধিক পুরুষ সিংহের অস্তিত্বও সম্ভব, কিন্তু সে ক্ষেত্রেও প্রত্যেকের হারেম আলাদা। তবে, প্রত্যেক দলে সর্দার হয় কোন এক পুরুষ সিংহ, দলের সকলে মেনে চলে তাকে।

সিংহ দল বেঁধে শিকার করে—একথা বলা ঠিক হবে না বটে, কিন্তু তবুও তাদের কাজের মধ্যে বেশ খানিকটা শৃঙ্খলা দেখা যায়। আসল হত্যাকাণ্ডটা সঙ্ঘটিত হয় দলের কোন সিংহী বা অর্ধবয়স্ক সিংহ দ্বারা। বয়স্ক সর্দার অনেক সময় পেছন থেকে কখন কী করতে হবে তার নির্দেশ দেয়—নিতান্ত প্রয়োজন না হলে সে দেহের ওজন ও শক্তি প্রয়োগ করে না। শিকারের সময় সিংহেরা গম্ভীর ঘড-ঘড শব্দে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা চালায়,—সে শব্দের আশ্চর্য দূরপ্রসারী ক্ষমতা। ঠিক কোথা থেকে শব্দটা আসছে তা আন্দাজ করা একরকম অসম্ভব। সত্যিকার গর্জন যাকে বলে সিংহ পারতপক্ষে তা করে না, জীবনে মাত্র কয়েকবার আমি সিংহের প্রকৃত গর্জন শুনেছি। মিশকালো অন্ধকার

রাতেও আশ্চর্য তাদের দেখার ক্ষমতা—এবং আমার ধারণা যে তারা শিকার করে ঘ্রাণশক্তির সাহায্যে নয়, দৃষ্টিশক্তির সাহায্যে। শিকারের সময় একরকম ঘড়-ঘড় শব্দ করে তারা শিকারকে ভয় পাইয়ে দিয়ে এমন জায়গায় তাড়িয়ে নিয়ে যায়, যেখানে দলের অন্যান্য সিংহেরা তার জন্যে প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। শিকারের দেখা পেলে সিংহ চুপি-চুপি তার দিকে এগিয়ে যায় আর মার্জার শ্রেণীর যেকোন জন্তুর মতই তার উপর লাফিয়ে পড়ে।

সিংহ যে রোজই শিকার করে এমন নয়। একটা শিকারের প[illegible] তখনকার মত খুব পেট পুরে খেয়ে নেয়। তারপর পরদিন রাত্রে আমার বাকিটুকু খেয়ে শেষ করে। কখনো বা হজম করবার জন্যে বা বিশ্রা[illegible] জন্যে শিকারের পরের রাতটা ঘুমিয়ে কাটায়; আবার শিকার করে তৃতীয় রাতে। বর্ষাকালে তারা প্রায়ই তাদের আড্ডা ছেড়ে অনেক দূর পর্যন্ত চলে যায়। তখন আর তারা দল বেঁধে চলে না। ঘুরতে ঘুরতে কখনো বা এমন অঞ্চলে গিয়ে পড়ে যেখানে শিকারের অস্তিত্ব নেই। বাধ্য হয়েই তখন তাকে স্থানীয় বাসিন্দাদের গরু বাছুরেব উপর হানা দিতে হয়। রাত্রে গরুদের কাঁটাবেড়ায় ঘেরা খাটালে রাখা হয়, সিংহ পারতপক্ষে ঢুকতে চায় না সেখানে। কিন্তু তবুও সে বেশ কায়দা করে গরুদের খাটাল থেকে বের করে আনে। যেদিক থেকে হাওয়া বইছে সেদিকে গিযে তারা সন্ত্রস্ত গরুদের কাছে তাদের গায়ের গন্ধ পৌঁছে দেয়, এবং তাতেও যদি তারা আতঙ্কে দৌড় শুরু না করে তখন ইচ্ছে করেই সেখানে প্রস্রাব করে; প্রস্রাবের তীব্র গন্ধে আতঙ্ক-বিহ্বল গরুর পাল তখন দিশাহারা হয়ে খাটাল থেকে বেরিয়ে ঝোপ ঝাড়ের মধ্যে এসে পড়ে এবং তখন আর তাকে শিকার করতে সিংহের কোন অসুবিধে হয় না। বন্য পশুদের ভয় পাওয়াতে হলেও নিশ্চয় সিংহ এই একই পন্থা অবলম্বন করে থাকে।

কোন স্থানীয় বাসিন্দা হয়ত এসে খবর দিল যে সিংহ তার গরু মেরেছে। তখনই আমি অকুস্থলে গিয়ে হাজির হই; তারপর সেখান থেকে অগ্রসর হই পায়ের চিহ্ন অনুসরণ করে। ঝোপে ছাওয়া বেলেমাটির উপর পায়ের চিহ্ন সহজেই চোখে পড়ে। সাধারণত কাছেই কোন ঘন জঙ্গলের আড়ালে সে দিনের বেলায় বিশ্রাম করে। আমাদের এগিয়ে আসা দেখে অন্তরাল থেকে ক্রুদ্ধ আওয়াজ করে ওঠে আর তা থেকেই আমরা জানতে পারি যে আমরা তার কাছেই এসে পড়েছি। তখন আমার সঙ্গী ঝোপের ভিতরে ঢিল ছুঁড়তে

থাকে। ফলে সিংহের বিরক্তি ক্রমেই বৃদ্ধি পায়, এবং শেষ পর্যন্ত সে আক্রমণ করে বসে। এত দ্রুত গতিতে সে ধেয়ে আসে যে একটার বেশি দুটো গুলি করার সময় পর্যন্ত পাওয়া যায় না।

সিংহের আক্রমণের থেকেও ভয়াবহ দৃশ্য কিছু আছে কি না সন্দেহ। তার গতিবেগ ঘণ্টায় চল্লিশ মাইলের কাছাকাছি। শুরু থেকেই একেবারে পূর্ণ বেগে ধেয়ে আসে সে। কোন রকমে যদি সে কোন অ্যান্টোলোপকে তার পঞ্চাশ শিকার মধ্যে পেয়ে যায় তাহলে আর তার নিস্তার নেই, কারণ যত দ্রুতই বোঝাইলোপ ছুটুক না কেন, গোটা বারো লাফেই সিংহ ঠিক তাকে ধরে শোয়াবে। তেড়ে-আসা সিংহকে ত্রিশ গজ দূর থেকে যদি নির্ভুল গুলি না করা যায় তাহলে নিশ্চিত মৃত্যু, কারণ পূর্ণাকৃতি সিংহের ওজন হয় প্রায় ৪৫০ পাউণ্ড,—সুতরাং সে যদি সবেগে কোন মানুষের উপরে এসে পড়ে, সামান্য আগাছার মতই সে মানুষ কোথায় ছিটকে পড়বে।

সিংহের আক্রমণের আশায় আমার সঙ্গী সমানে ঢিল ছুড়তে থাকে আর আমি উদ্যত রাইফেল হাতে করে তৈরি হয়ে থাকি। আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে রাইফেল কাঁধে তুলে জঙ্গলের মধ্যে গুলি করি কামানের গোলার বেগে ধেয়ে আসা পিঙ্গল আকৃতিটাকে লক্ষ্য করে। মাঝে মাঝে মনে হয়, ছেলেবেলায় লোচার মস্-এর উপর দিয়ে উড়ে যাওয়া বনমোরগ শিকারের অভ্যাস পরবর্তী জীবনে এই ধরনের শিকারে আমার বিশেষ কাজে এসেছিল। নির্ভুল গুলিতে মৃত সিংহ কখনো কখনো তার গতিবেগে গড়াতে গড়াতে ডিগবাজি খেতে খেতে প্রায় শিকারীর দশ বারো ফুটের মধ্যে এসে পড়ে। আর গুলি যদি ব্যর্থ হয় তাহলে দ্বিতীয়বার গুলি করার সুযোগ পারতপক্ষে মেলে না, কারণ সঙ্গে সঙ্গে সিংহ শিকারীর উপরে এসে পড়ে কামড়ে কামড়ে আর পেছনের পায়ের থাবার আঁচড়ে আঁচড়ে তাকে ফালাফালা করে ফেলে।

তবুও বলব, শিকারীর যদি নিজের উপর আর তার রাইফেলের উপর আস্থা থাকে তাহলে এ ধরনের শিকারে খুব একটা বিপদের আশঙ্কা থাকে না। কিন্তু যদি যার উপর তাকে নির্ভর করতে হয় তার উপর আস্থা না থাকে, ব্যাপারটা তখন সত্যিই অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। সে সময়ে আমি একজনের সঙ্গে একসঙ্গে শিকার করতাম। লোকটি ছিল বয়স্ক, সিংহশিকারী হিসেবে তার প্রচুর নাম ছিল। 'বোবা বন্দুক' দিয়ে শিকার করত সে। একটা গাছের সঙ্গে সে বেশ হিসেব করে বন্দুকটা বেঁধে রাখত, আর বন্দুকের

ঘোড়ার সঙ্গে একটা সুতো বেঁধে রাখত ; সেই সুতোর অপর পারে বাঁধা থাকত টোপ। সিংহ টোপ খেতে এসে সুতোয় টান দিতেই গুলিটা সঙ্গে সঙ্গে ছিটকে এসে তার গায়ে বিঁধত।

প্রথমে যেবার আমি ওর সঙ্গে শিকারে গিয়েছিলাম, একটা সিংহ ওর বোবা বন্দুকের গুলিতে আহত হয়েছিল। চারিদিকে তার গায়ের লোম আর রক্তের দাগ পড়ে ছিল, কিন্তু সিংহের দেখা মিলল না। হতাশভাবে মাথা নেড়ে সে আর-একটা বোবা বন্দুক যেখানে পাতা ছিল সেখানে দেখতে যাবে বলে ব্যস্ত হয়ে উঠল। আমার মন কিন্তু তাতে সায় দিল না; আমার চিরকালের বিশ্বাস এই যে কোন আহত জন্তুকে যন্ত্রণায় ভুগে তিলে তিলে মৃত্যুর পথে না রেখে একেবারে মেরে ফেলাই উচিত। এ কথায় সে আপত্তি করে বললে, এতে মিথ্যেই বিপদের মধ্যে জড়িয়ে পড়তে হবে। কিন্তু আমি একরকম জোর করেই তাকে নিয়ে আহত সিংহের রক্তচিহ্ন ধরে অগ্রসর হলাম।

অগ্রসর হতে হতে রক্তের রঙ দেখে বুঝলাম, আহত সিংহটা নিশ্চয় খুব কাছেই কোথাও আছে। আমার সঙ্গীর ইচ্ছে সে একটা গাছে ওঠে, কারণ তাহলে সে চারিদিকটা ভাল করে দেখতে পারবে।

লোকটা যে-রকম নার্ভাস, তাতে ও যে কখন কী করে বসবে কে জানে, আর আমিও চাই না যে কোন নার্ভাস মানুষ গুলিভরা বন্দুক নিয়ে আমার পেছনে থাকুক। তাই ওর সঙ্গ থেকে নিষ্কৃতি পেতে আমার কোন আপত্তিই ছিল না। ওকে গাছে উঠতে বলে আমি আগের মত চিহ্ন ধরে অগ্রসর হলাম।

ঝোপ ভেঙে অগ্রসর হতে হতে হঠাৎ দেখলাম, সামান্য দূরে, বড় বড় ঘাসের মধ্যে সিংহটা ওত পেতে বসে আমায় লক্ষ্য করছে। চমৎকার পরিস্থিতি, লক্ষ্য স্থির করবার পক্ষে অপূর্ব। ধীরে ধীরে তুলে নিলাম রাইফেলটা। গুলি করতে যাচ্ছি, ঠিক এমন সময় হঠাৎ আমার সঙ্গীর রাইফেল গাছের উপর থেকে গর্জন করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে সিংহটা যন্ত্রণাসূচক চিৎকার করে সোজা আমায় তাড়া করে এল। তখন আর সময় ছিল না, ভাল করে লক্ষ্য স্থির না করেই গুলি করে দিলাম। প্রায় আমার পায়ের কাছে এসে সিংহটা মরে পড়ল।

গাছের উপর থেকে সঙ্গী চিৎকার করে উঠল, 'জন, জন, বেঁচে আছ তো ?' উত্তরে আমি বললাম, 'আছি, এবং সেজন্যে তোমায় একটুও ধন্যবাদ দিতে পারছি না!' পরীক্ষা করে দেখলাম, আমার সঙ্গীর গুলিতে সিংহের

ল্যাজটা কেবল উড়ে গেছে, যেজন্যে আমায় এত কাছ থেকে তার আক্রমণের সম্মুখীন হতে হল আর তার চামড়াটাও নষ্ট করতে হল। তবে, একটা বুড়ো সিংহের চামড়া আমাদের কাছে ছিল যেটা আমাদের কোন কাজে আসত না; তার ল্যাজটা কেটে এই সিংহের চামড়ার সঙ্গে সেলাই করে দিলাম। কাজটা এত নিখুঁত হল যে এ সম্বন্ধে কোন কথা না বলেই চামড়াটা দিব্যি মোম্বাসায় বিক্রি হয়ে গেল।

এই অভিজ্ঞতার পর আমি ঠিক করলাম, এবার থেকে আবার আমার স্থানীয় ছেলেটির সঙ্গে শিকারে যাব। সঙ্গী একজন দরকার, কারণ সিংহের ছাল ছাড়ানো একজনে হয় না; একজনে পা দুটো ফাঁক করে ধরবে আর আরেক জন ছুরি চালাবে। কয়েক মাসের মধ্যেই আমরা সিংহশিকার ব্যাপারটা বেশ একটা শৃঙ্খলার মধ্যে এনে ফেললাম।

কোন ছোট স্টেশনে গাড়ি থামিয়ে আমি সঙ্গের ছেলেটিকে নিয়ে নেমে যেতাম,—সঙ্গে থাকত শুধু রাইফেল, গুলি, ছাল ছাড়াবার জন্যে একটা ছুরি আর একটা জলের ফ্লাস্ক। ঝোপ ভেদ করে অগ্রসর হতাম যতক্ষণ না কোন ডোঙ্গায় গিয়ে পৌঁছতাম। ডোঙ্গা হল অগভীর গিরিপথ, সাধারণত উঁচু উঁচু ঘাস আর আগাছায় ঢাকা,—লুকিয়ে থাকবার পক্ষে চমৎকার জায়গা। গ্রীষ্মকালে দিনের বেলা সিংহ প্রায়ই অমনি জায়গায় শুয়ে বিশ্রাম করে। আমি ডোঙ্গার এক প্রান্তে গিয়ে দাঁড়াতাম আর আমার সঙ্গী উল্টোদিক দিয়ে গিয়ে সেই ঝোপে ঢিল মারত। সিংহের ক্রুদ্ধ ডাক কানে যেতেই সে ক্রমাগত সেখানে ঢিল ছুড়ে চলত যতক্ষণ না সিংহটা আক্রমণ করতে বাধ্য হত। সিংহ-শিকারের পর আমরা সেটাকে পেছনের পায়ে বেঁধে কোন গাছে ঝুলিয়ে রাখতাম, তারপর যেতাম অন্য শিকারের সন্ধানে। এক যাত্রায় কখনো চারটের বেশি সিংহ মারতাম না, কারণ ঐসব কাঁচা চামড়ার ওজন এক একটার প্রায় আধ মণের মত,—ঝোপের মধ্যে দিয়ে চলতে হলে অমন দুটো চামড়াই বেজায় ভারি হয়ে উঠত।

এহেন শিকারের সবচেয়ে বড় অসুবিধে হত যখন ঢিল খেয়ে একটার বদলে দুটো সিংহ বেরিয়ে আসত। একবার একটা ডোঙ্গার পাশ দিয়ে যেতে যেতে খানিকটা উঁচু ঘাসের মধ্যে থেকে একটা ঘুমন্ত সিংহের নাক ডাকার শব্দ আমার কানে এল। আমি ঢিল ছুড়তেই একটা নয়, দু-দুটো সিংহ আমায় তেড়ে এল। তখন আর ভেবে দেখবার সময় নেই, সঙ্গে সঙ্গে একটাকে গুলি

করলাম, আর সেটা পড়ে যেতেই অপরটা প্রকাণ্ড এক লাফ মেরে আমার মাথার উপর দিয়ে চলে গেল,—তার ধাক্কা লেগে আমার মাথার টুপি ছিটকে পড়ল।

আক্রমণ করা বলতে যা বোঝায় এই সিংহদুটো যে ঠিক তাই করেছিল তা কিন্তু নয়। ঢিল খেয়ে ওরা ভয় পেয়ে পালাচ্ছিল, ভাগ্যক্রমে আমি ওদের পালাবার পথে পড়েছিলাম।

কয়েক মাস এভাবে শিকার করার পর আমার ধারণা হল, এ ধরনের শিকারের কৌশলটা আমার ঠিকমত রপ্ত হয়েছে এবং অল্পবয়স্ক শিকারীদের সচরাচর যা হয় আমারও তাই হল—নিজের উপর অত্যন্ত উচ্চ ধারণা জন্মালো। আমার মনে হয় প্রত্যেক শিকারীর জীবনেই তিনটে অধ্যায় আছে। প্রথমটা হল নার্ভাস ভাব, যথেষ্ট আত্মপ্রত্যয়ের অভাব। তারপর, শিকারের গোড়ার কথাগুলো যখন তার শেখা হয়ে গেছে তখন তার মধ্যে একটা অহং-ভাব দেখা দেয়,—তার ধারণা হয়, কোন কিছুতেই তার ভুল হতে পারে না। এর পরে সে শেখে কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে ঝুঁকি নিতে হবে আর কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে ঝুঁকি নিতে যাওয়া নিছক বোকামি হবে।

কিছুকাল আমি আমার অনুচরটিকে নিযে সাভো অঞ্চলের ঝোপ ঝাড়ের মধ্যে শিকার করে ফিরছিলাম। সাভো থেকে মাইল সাতেক দূরে কায়ুলু পাহাড়। রেল লাইনের পাথর সংগ্রহের জন্যে একদল লোক সেখানে তাঁবু ফেলেছিল। এই দুই জায়গার মধ্যবর্তী অঞ্চলে কেবল বন্য আগাছার বিস্তার, কোন রাস্তা বা রেলপথ এদিকে নেই। প্রচুর সিংহ আছে বলে এ অঞ্চলের খ্যাতি। ঠিক করলাম সাভো থেকে জঙ্গল কেটে কেটে আর শিকার করতে করতে কায়ুলু পাহাড় পর্যন্ত চলে যাব।

সাত মাইল একটা এমন কিছু পথ মনে হল না। খুব ভোরে বেরিয়ে পড়লাম, যাতে বেলা দুপুর নাগাদ পৌছে যেতে পারি। কোন কম্পাস ছিল না, এমনকি একটা দেশলাইয়ের বাক্স বা জলের পাত্র পর্যন্ত সঙ্গে নিতে অবহেলা করলাম। নিলাম কেবল আমার মসার রাইফেল, আর প্রচুর গোলাগুলি। আমার অনুচরটি তার কোন আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ায় আমি একাই বেরিয়ে পড়লাম।

প্রথম কয়েকটা মাইল কোন অসুবিধে হল না। ঘনসন্নিবদ্ধ কাঁটাগাছের আড়ালে সূর্য একেবারে ঢাকা, কিন্তু এতে করে ঠাণ্ডার মধ্যে হাঁটতে বেশ ভালই

লাগছিল। দিব্যি চলেছি, হঠাৎ কতকগুলো পায়ের ছাপ আমার চোখে পড়ল। 'আরে!' নিজের মনেই আমি বলে উঠলাম, 'এ আবার কী!' কারণ আমি নিশ্চয় করে জানতাম যে আমি ছাড়া আর কেউ এখানে প্রবেশ করে নি। দাগগুলো পরীক্ষা করে বুঝলাম, ও পা আমার নিজেরই। অর্থাৎ আমি বনের মধ্যে গোল হয়ে ঘুরছি।

বিশেষ কিছুতেই ঘাবড়ে যাওয়ার মত ছেলে আমি ছিলাম না, তার উপর আমার মধ্যে বেশ খানিকটা দেমাকও ছিল। কিন্তু এই ব্যাপারে আমার নিজের উপর যা বিশ্বাস ছিল সমস্ত হারিয়ে ফেললাম। ব্যাপারটা হয়ত সামান্য বলে মনে হবে, কিন্তু আমি বলতে পারি, যে মানুষ জঙ্গলের মধ্যে একা চলেছে এবং নিজের বিচার-বুদ্ধির উপর নির্ভর করা ছাড়া যার আর গতি নেই, তার কাছে এ এক অত্যন্ত ভয়াবহ অনুভূতি। জীবনে এই প্রথম আমি আতঙ্কের বশীভূত হয়ে উঠলাম, বুঝলাম এ সময়ে স্থানীয় ছেলেটি আমার কতটা উপকারে আসত; কারণ ওরা কখনো জঙ্গলে পথ হারায় না, কম্পাস যেন ওদের মাথার ভিতরে থাকে।

মাথা ঠাণ্ডা করে ভেবে দেখবার জন্যে বসে পড়লাম। অনেক চেষ্টা করলাম যদি কোন গাছের উপর উঠে সূর্যের অবস্থিতি দেখতে পাই, কিন্তু চার ইঞ্চি বড় বড় কাঁটায় ঘেরা গাছ বেয়ে ওঠা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। ভাবলাম সাভোয় ফিরে যাব কি না, কিন্তু তাতে অনেক সময় লাগবে, এবং জঙ্গলের ভিতরে রাত কাটাবার ইচ্ছে আমার নেই। তাই ঠিক করলাম কায়ুলুর দিকেই অগ্রসর হব,—যেমন করে হোক পথ চিনে পৌঁছতেই হবে।

ক্রমে রাত্রি এল, কিন্তু তখনও আমি সেই জঙ্গল থেকে বেরোতে পারলাম না। অথচ এখানেই যে রাত কাটাবো তারও উপায় নেই কারণ বিনা জলে এই শুকনো জঙ্গলে আর একটা রাত কাটানো সম্ভব নয়। তাই আবার চলা শুরু করলাম। চমকে-যাওয়া গণ্ডারেরা মেল ট্রেনের মত বেগে আমার পাশ দিয়ে ছুটে যেতে লাগল—আমার উপর দিয়ে যে যায়নি এ আমার নিতান্ত সৌভাগ্য। ভোরের আলো যখন ফুটল তখন আমার ক্লান্তিতে পড়ে যাওয়ার মত অবস্থা। কিন্তু তখনও আমি জলের সন্ধান পেলাম না।

আরও কয়েক ঘণ্টা চলবার পর আবার আমার পায়ের দাগ চোখে পড়ল। আর আমার কোন আশাই নেই,—এবার বুঝলাম, আমি একেবারে পথ হারিয়ে ফেলেছি। আরও বুঝলাম যে এখন আর ফেরার পথ ধরেও কোন লাভ হবে

না, কারণ এই জঙ্গল ভেদ করার আগেই আমার মৃত্যু হবে। চলেছি আর চলেছি—এ জঙ্গলের যেন শেষ নেই! কখনো হয়ত কোন কাঁটাগাছের তলায় একটা গণ্ডারের দেখা মিলেছে। কোন গণ্ডার দৌড়ে পালিয়েছে, কিন্তু যখনই কোন গণ্ডার আমায় তাড়া করেছে তাকে গুলি করেছি, কারণ তখন আর তাকে এড়িয়ে যাবার, বা দৌড়ে পালাবার ক্ষমতাটাও আমার অবশিষ্ট নেই। যাকে মেরেছি তাকে ফেলে আসতে হয়েছে, তার খড়্গ বা চামড়া ছাড়িয়ে নেওয়া সম্ভব হয়নি, যদিও গণ্ডারের খড়্গের দাম গজদন্তের চেয়েও বেশি—এক পাউণ্ড ওজনের খড়্গের দাম এক পাউণ্ড অন্তত।

আবার যখন রাত্রি এল, তখনও আমি জঙ্গল থেকে বেরোতে পারি নি। জ্বরগ্রস্তের মত হেঁটে চলেছি, আর যা কিছু চোখে পড়ছে বা ঐ অন্ধকারে মনে হচ্ছে চোখে পড়ছে, তাকেই গুলি করছি। আবার যখন দিনের আলো ফুটল তখন আর আমার মাথার ঠিক নেই। কাঁটাগাছের ডালগুলো আমার মুখে এসে লাগছে, টলতে টলতে আমি চলেছি। কিন্তু কোথায় যাচ্ছি বা কী করছি সে সম্বন্ধে আর তখন কোন ধারণাই আমার নেই। মারাই যেতাম সেদিন যদি গণ্ডারের প্রস্রাবে ভরা একটা ডোবার সন্ধান না মিলত,—কাদায় আর পাঁকে আর গণ্ডারের বিষ্ঠায় তা পূতিগন্ধময়। সেখানে গিয়ে সেই তরল পদার্থ আকণ্ঠ পান করলাম।

ঘণ্টাদুই সেই ডোবার মধ্যে শুয়ে থাকবার পর একটু সুস্থ হলাম, আবার চলা শুরু করলাম। সন্ধ্যা এল, কিন্তু তখনও আমার অবস্থার কোন উন্নতি হল না। সে রাত্রিও তেমনি যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে কাটল। সকাল যখন হল তখন আমি খিদের জ্বালায় মরিয়া হয়ে উঠেছি, তেষ্টায় পাগলের মত হয়ে পড়েছি। সীমাহীন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে আমি টলতে টলতে অগ্রসর হলাম। এদিকে আমার বন্দুকের গুলিও ফুরিয়ে এসেছে, বাধ্য হয়েই তাই কোন গণ্ডারকে দেখলে পথ ছেড়ে দিতে হচ্ছে। দুর্বল দেহ নিয়ে গণ্ডারদের এড়িয়ে যেতে গিয়ে যতটা পেছিয়ে পড়তে হয়েছে, এক ঘণ্টা চলার ফলেও ততটা অগ্রসর হতে পেরেছি কি না সন্দেহ।

এমন সময় হঠাৎ জঙ্গলের ভিতর দিয়ে কি একটা ঝলমল করে উঠল,—রুপোলি তাপ-তরঙ্গের মত। প্রথমটা তা আমার বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে নি। আরো কাছে গিয়ে আমি থেমে দাঁড়ালাম; তীক্ষ্ণ, একাগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম সেদিকে। রেল লাইন থেকে কাযুলু পর্যন্ত যে টেলিগ্রাফের তার গেছে

এ হল সেই তার। সেই তারে লক্ষ্য রেখে আমি জঙ্গল ভেঙে অগ্রসর হলাম। তখনও আমার মনে সন্দেহ, এ স্বপ্ন না সত্যি। টেলিগ্রাফের খুঁটির কাছে পৌঁছে আমি হাঁটু গেড়ে বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না শুরু করলাম। বেঁচে গেলাম এ যাত্রা,—এবার শুধু রেললাইন ধরে কায়ুলুর দিকে যাওয়া, তাহলেই আমার তাঁবুতে গিয়ে পৌঁছব।

এই ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা থেকে সুস্থ হয়ে ওঠার সময়টা আমি নাইরোবিতে কাটালাম। শ্বেতাঙ্গ শিকারী হিসেবে ইতিমধ্যে আমার কিছু নাম হয়েছিল। কয়েকটা নাচের আসরে নিমন্ত্রণ আসতে লাগল। এমনি একটা আসরে আমার মিস্ হিলডা ব্যানবেরির সঙ্গে আলাপ হয়। তার বাবার নাইরোবিতে একটা চমৎকার গান বাজনার দোকান ছিল। হিলডাকে আমার মনে হয় যত মেয়ে আমি দেখেছি তাদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী আর শান্ত। আর হিলডারও, আমার মনে হল, আমাকে ভালই লেগেছে। কিন্তু তাহলেও, যখন তাকে মিসেস হাণ্টার হতে অনুরোধ করলাম আর সে তাতে রাজি হল, তখন আমার বিস্ময়ের সীমা রইল না।

সুন্দরী হিলডার দায়িত্ব ঘাড়ে পড়ায় এবার আমি ঠিক করলাম শিকার-জীবির জীবনের অনিশ্চযতা ত্যাগ করে নতুন করে জীবন আরম্ভ করব। স্কটল্যাণ্ডে আমার এক আত্মীয়ের মৃত্যুতে কিছু টাকা আমি পেয়েছিলাম। ঠিক করলাম সেই টাকা দিয়ে যান পরিবহনের ব্যবসা শুরু করব। নাইরোবি দ্রুত বড় শহরে পরিণত হচ্ছে, জিনিসপত্রের প্রচুর চাহিদা সেখানে। ঐ টাকায় খচ্চর আর ঘোড়া আর গাড়ি কিনে আমি ব্যবসা শুরু করলাম। কিন্তু ব্যবসার আমি কিছুই বুঝতাম না, তাই প্রচুর পরিশ্রম সত্ত্বেও এক বছরের মধ্যেই আমি সর্বস্বান্ত হলাম।

দুঃসংবাদটা হিলডা খুব শান্তভাবে গ্রহণ করল, যদিও তখন একটি সন্তানের শুভাগমনের সময় এগিয়ে আসছে।

প্রফুল্ল স্বরে হিলডা বললে, 'আমি তো অপেক্ষা করেই ছিলাম, কবে তোমার পয়সা ফুরিয়ে যাবে। ব্যবসা করা কস্মিন কালেও তোমার কর্ম নয়। যাক, এখন তো পয়সা ফুরিয়েছে, এবার তুমি শ্বেতাঙ্গ শিকারীর কাজ নিতে পারবে—তোমার জীবনের যা একান্ত আকাঙ্ক্ষা।

এমন বিশ্বাস যার উপর, তার আর কীই বা করবার আছে? গেলাম তখন আমার বন্ধু, আমেরিকান শ্বেতাঙ্গ শিকারী লেসলি সিম্পসনের কাছে।

আমার তক্ষুনি কোন কাজ চাই এ কথা শুনে আর আমার শিকারিদের শিকারে নিয়ে যাবার ইচ্ছে এ কথা জেনে থুতনি চুলকে লেসলি বললে, 'এইমাত্র দু-জন আমেরিকান শিকারী এসেছে, তারা সাফারি নিয়ে সেরেঙ্গেতি মালভূমি অতিক্রম করে যেতে চায়। ও অঞ্চলের মাঝামাঝি একটা নিভে-যাওয়া অগ্নিগিরি আছে, তার নাম ঙরোঙ্গরো। শোনা যায় সেখানে যেমন শিকার মেলে অত শিকার মানুষ আগে দেখেনি কখনো। যতদূর জানি কোন কেতাদুরস্ত সাফারি ও অঞ্চল অতিক্রম করেনি, যদিও কয়েকজন গজদন্তের লোভে ওখানে গিয়েছিল ; আর এক অদ্ভুত মানুষ, নাম তাঁর ক্যাপ্টেন হার্স্ট, ঐ অগ্নিগিরির মুখে একটা বাড়ি করে বাস করেন। আমেরিকান দু-জনকে বলে দিয়েছি তেমন কোন শিকারীর সন্ধান আমাব জানা নেই,—তবে, তুমি রাজি থাকলে যেতে পার।'

লেসলিকে ধন্যবাদ দিয়ে বাড়ি ফিরলাম। হিলডাকে বললাম, শ্বেতাঙ্গ শিকারীর বৃত্তি গ্রহণ করেছি।

॥ চার ॥ সেরেঙ্গেতি সাফারি

পরের দিন ওদের হোটেলে গিয়ে আমেরিকান দু-জনের সঙ্গে দেখা করলাম। লম্বা চওড়া হাসিখুশি মানুষ তারা, ব্যবসায় সাফল্য লাভ করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম অঞ্চলে তাদের বাস। তারা বললে, 'ক্যাপ্টেন, এমন টাটকা অঞ্চলে আমাদের নিয়ে চলুন যেখানে এখনো সব শিকার মেরে শেষ করা হয়নি। আমরা চাই স্মারকচিহ্ন, এজন্যে যদি কিছু কষ্ট করে কোন ভাল জায়গায় যেতে হয় তো আপত্তি করব না।'

ওদের খুব ইচ্ছে ঙরোঙ্গরোয় যায়। আমি ওদের সোজাসুজি বলে দিলাম যে ও অঞ্চল সম্বন্ধে আমার কিছুই জানা নেই, তবে, শুনি যে ঐ অগ্নিগিরির মুখটাই নাকি আফ্রিকার মধ্যে সবচেয়ে ভাল শিকারের ঘাঁটি। এই গ্রীষ্মে সেরেঙ্গেতি অঞ্চল অতিক্রম করতে হবে, এই ছিল আমার ভাবনা। বিস্তীর্ণ সে অঞ্চল, প্রায় মরুভূমির মতই কতকটা,—দক্ষিণে কেনিয়া অতিক্রম করে শত-শত মাইল পর্যন্ত চলে গেছে, জানা নেই কোথায় কোথায় জলের দেখা মিলবে বা সঙ্গের কুলিদের জন্যে পথে শিকার মিলবে কি না মিলবে। পথের

কষ্ট সম্বন্ধে ওদের সাবধান করে দিলাম, বিপদ আপদের সম্ভাবনার কথাও বললাম; কিন্তু তা শুনে ওদের উৎসাহ যেন আরও বর্ধিত হল।

ওদের এই উৎসাহটা আমার ভাল লেগেছিল বটে, কিন্তু ও অঞ্চলে সাফারি নিয়ে যাওয়ার মধ্যে যে বিপদ আছে সে কথাটাও ভেবে দেখবার মত। উপদেশের জন্যে লেসলি সিম্পসনের সঙ্গে দেখা করতে সে একটা চমৎকার মতলব বাতলে দিলে।

বললে সে, 'ফুরি নামে এক পুরোনো হল্যাণ্ডের শিকারীর কথা আমি জানি। অবশ্য গজদন্ত আর গরু চুরির ব্যাপারে তার খানিকটা বদনাম আছে, কিন্তু তা হলেও যে সামান্য ক-জনের ও অঞ্চল সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আছে, ও হল তাদের একজন। ফুরি এখন নাইরোবিতে আছে, হয়ত সে পথপ্রদর্শক হয়ে তোমাদের ঙরোঙরোয় নিয়ে যেতে পারে।'

ফুরি মানুষটি রোগা, চোখে তার ধূর্ত দৃষ্টি। বয়সে সে আমার ঠাকুর্দার কাছাকাছি। ওর যখন বয়স অল্প ছিল, একটা গণ্ডার হঠাৎ একদিন পেছন থেকে এসে ওর উরুর মাংসপেশীগুলো এমনভাবে যখম করে দিয়েছিল যে সেই থেকে সে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে। সেকালের গজদন্তশিকারীদের মত সেও যেমন অনেক টাকা করেছে, আবার অনেক টাকা নষ্টও করেছে। একটা সাফারিতে সাফল্য লাভ করেই সঙ্গে সঙ্গে আবার তার চেয়েও বড় আর একটা সাফারিতে টাকা খাটিয়েছে। যতদিন কপাল ভাল গেছে প্রচুর উপার্জন করেছে, কিন্তু তারপরেই আবার কয়েকটা সাফারিতে লোকসান দিয়ে আবার সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছে। এরপর সে গরু চুরি শুরু করে,—গভর্মেন্টের প্রহরা এড়িয়ে গরু তাড়িয়ে অন্য জেলায় নিয়ে গিয়ে বেশি দামে বিক্রি করত। নীতিবোধের এই শিথিলতা থাকলেও এ কথা সত্যি যে জঙ্গলে চলাফেরার ব্যাপারে তার চেয়ে বেশি অভিজ্ঞতা অতি অল্প লোকেরই আছে। তার দিনকাল ভাল যাচ্ছিল না, তাই মাত্র কয়েক পাউণ্ড পারিশ্রমিকের বিনিময়ে সে আমাদের পথপ্রদর্শকের কাজ গ্রহণ করল।

সেরেঙ্গেতির পথে নাইরোবি থেকে দুশো মাইল দক্ষিণে আরুশা, সেখানে গিয়ে আমাদের প্রস্তুতি শুরু হল। প্রথম সমস্যা হল কুলি। কুলি যা মিলল তারা হল ওয়া-আরুশা জাতির; অপদার্থের দল, যেমন কুঁড়ে তেমনি ঝগড়াটে। চাষ বাস করে খায়, কাজকর্ম যা তা করে ওদের স্ত্রীলোকেরা আর পুরুষেরা নেশা করে আর পোড়া হাড় আর লাল মাটি দিয়ে ভুতুড়ে সব ছবি এঁকে নিজেদের

শরীর চিত্রবিচিত্র করে। ভাগ্যে লেসলি সিম্পসন কুলি-সঙ্কুলে ছুরি বাগিয়ে একজন লোককে দিয়েছিল! লোকটির নাম আন্দোলেরি আর আমি সর্বশ্রেষ্ঠ ট্যাক্সিডার্মিস্ট (জীবজন্তুর চামড়া ইত্যাদি যারা সংরক্ষণ করে) গিয়েছিল, বছর কয়েক আগে নিউ ইয়র্কের আমেরিকান মিউজিয়াম অব্ ন্যাচারাল হিস্টরির এক অভিযানে সে এই শিক্ষা পায়। বুঝলাম আন্দোলো আমাদের অনেক কাজে আসবে,—কেবল স্মারক-চিহ্ন রক্ষার ব্যাপারে নয়, অবাধ্য কুলিদের সর্দারের কাজও ওকে দিয়ে বেশ চলবে।

এ যুগের শ্বেতাঙ্গ শিকারীর পক্ষে তখনকার দিনের পায়ে-হাঁটা সাফারির অসুবিধে আর ঝঞ্ঝাট উপলব্ধি করা কঠিন। আজকের দিনে ভারি ভারি লরি নিয়ে সাফারিতে বেরোনো হয়, সঙ্গে থাকে প্রচুর সাজ সরঞ্জাম। খাদ্যের চিন্তা থাকে না বা প্রচণ্ড রোদের তাপও সহ্য করতে হয় না। দিনে শ-খানেক মাইল পথ দিব্যি আরামেই অতিক্রম করা যায়,—পায়ে হেঁটে যেখানে তখনকার দিনে কুড়ি মাইল পথ অতিক্রম করাও ছিল অত্যন্ত কষ্টসাপেক্ষ। আর, সবচেয়ে যা সুবিধে, লরি কখনো তার মেজাজ-মাফিক চলে না। কুলিরা যখন তখন কাজ ছেড়ে চলে যেতে পারে—হয়ত হঠাৎ বৌয়ের জন্যে মন কেমন করে উঠল, কিংবা হয়ত জলকষ্ট আর সহ্য হল না। লরির ব্যাপারে তেমন কোন সম্ভাবনা নেই। লরির এই সুবিধের কথা সে-ই বেশি করে বুঝবে অমন অসংখ্য কুলিকে নিয়ে যার কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে।

আমাদের সাফারিতে ছিল দেড়শো কুলি—এই তিন মাসের জন্যে যা কিছু আমাদের দরকার সমস্তই তাদের মাথায় করে বহন করতে হবে। এ ছাড়াও পথে আমাদের শিকার করতে করতে চলতে হবে,—রসদে যাতে ঘাটতি না পড়ে। আফ্রিকার শিকার ব্যাপারটা শুনতে যতই ভাল হোক, শিকারের পিছু নিতে সময় লাগে যথেষ্ট। পদে পদে অগ্রগতি ব্যাহত হয়। কখনো বা এমন অঞ্চল পথে পড়ে যেখানে শিকারের একান্ত অভাব। জলও খুব বেশি সঙ্গে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, তাই কোথায় জল মিলতে পারে তারও সন্ধান রাখা দরকার।

সমস্ত মাল ষাট পাউণ্ড ওজনের এক-একটা আলাদা বাণ্ডিল করে বাঁধা হল,—কুলিরা এতটা করেই মাল বহন করে থাকে। খাবারের ব্যাপারে আমার ঝোঁক টিনের খাবারের উপর, কারণ ভারি হলেও অনেক সুবিধে তাতে। তাঁবু, ক্যাম্পখাট, মশারি, বাসনপত্র, বন্দুক, গুলি, এসব ছাড়াও আমাদের সঙ্গে

কষ্ট সম্বন্ধে ওদের টাটকা রাখার জন্যে অপর্যাপ্ত পরিমাণে নুনের সংগ্রহ। বললাম; ি‌ক বেরোবার আগে ফুরি বললে কুলিদের একটা ভাল করে ওদে‌য় দিতে, তাহলে ওদের মেজাজ ভাল থাকবে। ওয়া-আরুশাদের নিজে‌গল বিশেষ নেই, আর শিকারেও তারা বিশেষ পটু নয়; তাই মাংসের ৃর তাদের প্রচুর লোভ। একটা মস্ত বলদ কেনা হল, কুলিরা ভোজের জন্যে তৈরি হয়ে নিল আর যেখানে যত আত্মীয় বন্ধু ছিল সকলকে নিমন্ত্রণ করল। সকলেই কোন-না-কোন ভাবে পরস্পবের সঙ্গে আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ থাকায় ও অঞ্চলে যে যেখানে ছিল সবাই ভোজ-সভায় নিমন্ত্রিত হল।

ভোজ শুরু হবার বেশ কয়েক ঘণ্টা আগে থেকেই চারিদিক থেকে অসংখ্য মানুষ সারিবদ্ধ হয়ে আসতে শুরু করল। পুরুষদের কোমর ঘিরে তৈলাক্ত খাটো কাপড,—স্থানীয় চিকিৎসকের কাছ থেকে পাওয়া মন্ত্রঃপূত জুজু তাতে আঁকা, যাতে পথে কোন বিপদ আপদ না আসে। স্ত্রীলোকদের শরীরে তেল মাখা, আর পরিধানে সামান্য বুনো ফুলের পোশাক। ওদের চেহারা সাধারণত বিশেষ আকর্ষণীয় নয়, বিশেষ করে যদি ওরা মাথার খুলির অসমানতা জাহির করবার জন্যে মাথা কামিয়ে থাকে। কিন্তু তাহলেও ওদের মধ্যে এমন মেয়ে স্দুর্লভ নয় যার রূপ আছে, এবং এমন লক্ষণ আছে যা থেকে তাকে সদ্বংশজাত বলেই মনে হয়। কুলিরা উদ্গ্রীব হয়ে আছে কখন খাদ্য পরিবেশন করা হবে আর এমন বক্-বক্ করে চলেছে যে শুনে মনে হয় যেন কতগুলো বানর কিচির-মিচির শব্দ করছে। ওদের ফুর্তি যত বাডছে ততই ওরা পরস্পরকে গালাগালি করছে আর এত দ্রুত কথা কয়ে চলেছে যে আশ্চর্য হতে হয়। প্রতিটি কথার পরই ওরা হাসিতে ফেটে পডছে,—ছোট-ছোট মেয়েগুলো তো একেবারে গডিয়ে পড়ছে হাসির দমকে।

আমেরিকানদের একজন বললে, 'কুলিগুলোকে দেখে তো ভালই মনে হচ্ছে, মনে হয় না ওদের নিয়ে কোনো ঝঞ্ঝাটে পড়তে হবে।' আমারও তাই মনে হল। ফুরিকে কিন্তু অতটা নিশ্চিন্ত মনে হল না। এবং ওর সন্দেহ যে অমূলক নয়, পরদিনই তা প্রমাণিত হল। পথ চলার পক্ষে ভোরের ঠাণ্ডা সময়টা বিশেষ উপযোগী, কিন্তু কখন সূর্য উঠেছে, তার অনেক পরে পর্যন্ত কুলিরা আগুনের ধারে বসে নিশ্চিন্ত আরামে প্রাতরাশ খেতে ব্যস্ত। কুলিদের সর্দার আন্দোলো তো রেগেই আগুন! কুলিদের কেটলিতে লাথি মেরে মেরে তাদের তাডাতাডি করতে বললে। সঙ্গে সঙ্গে কুলিরা সবাই ক্ষেপে উঠল,—রাগের চোটে কেউ

মাটিতে শুয়ে পড়ে ঘাস চিবোতে শুরু করল, আর বাকি সকলে ছুরি বাগিয়ে আন্দোলোকে তেড়ে গেল। রাইফেলের ভয় দেখিয়ে তবে ফুরি আর আমি তাদের নিরস্ত করি। আন্দোলো এই ব্যাপারে অত্যন্ত ভয় পেয়ে গিয়েছিল, বললে এক্ষুনি সে নাইরোবিতে ফিরে যাবে। অনেক বলে কয়ে তবে তাকে শান্ত করা গেল।

এমনি একটা অশুভ সূচনার পব আমরা ধীরে ধীরে প্রস্তুত হয়ে নিলাম। কুলিরা আধ মাইল জায়গা জুড়ে দাঁড়ালো,—তখনো তাদের মুখ কালো হয়ে রয়েছে। ভাগ্যক্রমে আমরা ভারি মোটগুলো বহন করবার জন্যে কয়েকটা খচ্চর পেয়েছিলাম, এতে আমাদের বিশেষ সুবিধে হয়েছিল। এ অঞ্চলের জমি উঁচু-নিচু বলে আমরা কোন গাড়ি সঙ্গে নিতে ভরসা করিনি।

প্রথম দিকটায় আমরা বিশেষ পথ অতিক্রম করতে পারিনি,—আমাদের উদ্দেশ্য ছিল আমেরিকানদের দীর্ঘ পথশ্রমের জন্যে প্রস্তুত করে নেওয়া। তা ছাড়া সাফারির প্রথম কয়েক দিনে এত রকমের অসুবিধের সৃষ্টি হয় আর কুলিদের মধ্যে এমন কলহের সূত্রপাত হয় যে বিশেষ অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয় না। কয়েকজন কুলি তো রাত্রিবেলা আমাদের ছেড়েই চলে গেল। যতদিন গ্রামের কাছাকাছি থাকা হয়, ধরে রাখা ভাল যে কিছু কুলিকে হারাতে হবে। একটা ভাল রাঁধুনি পাওয়াও এক মহা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আরুশা থেকে একজনকে নিয়েছিলাম যাকে দেখে আমার বেশ ভালই মনে হয়েছিল। কিন্তু একদিন সন্ধ্যায় রান্নার তাঁবুতে গিয়ে দেখি, যে হরিণের মাংস রান্না হচ্ছিল তার থেকে খানিকটা চর্বি নিয়ে নিজের গায়ে মাখাচ্ছে। আমার মুখের ভাব লক্ষ্য করে সে অপরাধীর মত সেই চর্বি শরীর থেকে ঘসে ঘসে তুলে আবার রান্নার পাত্রে রেখে দিল।

আফ্রিকা সম্বন্ধে লিখতে বসে যাঁরা বলেন সমস্ত দেশটায় কেবল গ্রীষ্মপ্রধান দেশের মত ছায়াবহুল গাছপালা আর নদীনালার ছড়াছড়ি, তাঁরা আমাদের সঙ্গে এই নিরস্তপাদপ জলহীন বন্ধ্যা অঞ্চলে এলে ভাল করতেন। সমস্ত অঞ্চলটা এক অখণ্ড সমতল ভূমি। থেকে থেকে গরম বাতাসের হল্‌কা এর উপর দিয়ে বয়ে চলে। এখানে ছায়ার একান্ত অভাব। আমাদের জামা কাপড় ঘামে ভিজে গিয়েই তক্ষুনি আবার শুকিয়ে যেতে লাগল, খাকি জামার উপর দেখা গেল নুনের আস্তরণ পড়েছে। ক্বচিৎ কখনো যখন কোন বদ্ধ জলে মুখ দিয়েছি, সে জল যেমন বিস্বাদ তেমনি দুর্গন্ধ। কুলিরা ক্রমাগত মাংসের দাবি

করে চলেছে, অথচ একেই শিকার এখানে অত্যন্ত দুর্লভ, তার উপর মড়কের ফলে যেকটি জীবজন্তু এদেশে ছিল তারাও একেবারে অস্থিচর্মসার হয়ে পড়েছে। চারিদিকে কেবল জন্তুজানোয়ারের সাদা সাদা হাড ছডানো। সন্ধ্যা হলে আমরা তাঁবু খাটিয়ে শুয়ে পডতাম, বিস্তীর্ণ অঞ্চলের উপর উষ্ণ বাতাসের গর্জন শুনতে শুনতে কখন ঘুমিয়ে পডতাম।

এই পরিক্রমার সময় অনেকবার আমরা মরুভূমির সেই আশ্চর্য ব্যাপার লক্ষ্য করেছি—যার নাম মরীচিকা। দিনের বেলা মাঝে মাঝে বাতাস থেমে থাকে, উত্তাপের তরঙ্গগুলো তখন আন্দোলিত অনন্ত শৃঙ্খলের মত যেন বন্ধ্যা অঞ্চলের উপর দিয়ে বয়ে যেতে থাকে। তখন চোখের সামনে সমস্ত অঞ্চলটা একটু একটু করে জলে জলময় বলে মনে হয়। মরুভূমির মধ্যে জলহারা পথিককে কী সাঙ্ঘাতিক মৃত্যু-কবলেই না পডতে হয় তখন! সাভোর জঙ্গলেও আমার প্রায় এইরকম অবস্থাই হয়েছিল। স্বচ্ছ জলাশয়ের সন্ধানে টলতে টলতে এগিয়ে চলে বেচারা, কিন্তু যতই এগোয় ততই যেন তা পেছিয়ে যেতে থাকে। মরীচিকার আলোয় শেয়ালের মত ছোট প্রাণীকেও অতিকায় বলে মনে হয়, ছোট ছোট হরিণদের মনে হয় বিশালকায় শিঙাল হরিণ এক একটা।

এই কষ্টকর দীর্ঘ পথ কিন্তু আমেরিকানরা সহজেই অতিক্রম করল। বলতে কি, পথকষ্টটা যেন উপভোগই করল তারা। দিনের পর দিন তারা এগিয়ে চলল নিজেদের মধ্যে বা আমার সঙ্গে ঠাট্টা তামাসা করতে করতে, আর যখনই ভাল শিঙাল গ্র্যাণ্ট গ্যাজেল চোখে পড়ল, অত্যন্ত উল্লসিত হল। এই গ্র্যাণ্ট গ্যাজেলই হল আমাদের প্রথম স্মারক, সুতরাং ওদের এ পছন্দ হওয়ায় আমি খুশি হলাম। গ্যাজেলগুলো ছিল খুবই বড, কিন্তু তবুও ফুরি সেগুলোর দিকে তাকিয়ে হাসল শুধু। বললে,—'এখনই এই! দাঁডাও, একবার আগ্নেয়গিরির মুখের কাছটায় যাই!'

একশো মাইলেরও বেশি পথ অতিক্রম করলাম, কিন্তু তবুও গরোঙ্গরোর দেখা না পেয়ে আমি চিন্তিত হলাম। কুলিরা কেবলই মাংস আর জলের অভাবের জন্যে অনুযোগ জানাচ্ছে আর থেকে থেকে ফিরে যাবে বলে ভয় দেখাচ্ছে। যত অগ্রসর হচ্ছি, ততই যেন এ অঞ্চল আরও বিশ্রী হয়ে উঠছে। ফুরিকে বলতে সেও সায় দিল—বললে যে কুলিদের আর সামলে রাখা যাচ্ছে না। সে বললে, 'তবে, কাল তো আমরা ঙারুকা ঝরনার কাছে গিয়ে পৌছব, কদিন সেখানে বিশ্রাম করলেই হবে।'

ফুরি যাকে বলছে ঝরনা আসলে হয়ত তা আরেকটা অমনি কর্দমাক্ত দুর্গন্ধ ডোবা ছাড়া আর কিছু নয় যেমনটি দেখে এসেছি, কিন্তু অগত্যা তারই সন্ধানে এগিয়ে যাওয়া হল।

বিস্তীর্ণ নিরম্ভপাদপ অঞ্চলের যেন আর শেষ নেই। পরদিন বিকেলের দিকে ফুরি থেমে পড়ে যা দেখিয়ে দিল তাতে আমার নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারলাম না। মরুভূমির নোংরা ধূসর বিস্তার অতিক্রম করে দৃষ্টি গিয়ে পড়ল এক পান্নার মত সবুজ জলরাশির উপরে,—মায়াদৈত্যের হাতে যেন সবুজ তুলি দিয়ে আঁকা। ফুরি বললে, 'ঐ হল ঙ্গারুকা ঝরনা। পরিষ্কার জল আর প্রচুর ডুমুর ফল ওখানে। ঐ গাছগুলোর ছায়ায় আমরা তাঁবু খাটাবো।'

মরুদ্যানটা চোখে পড়তে পথশ্রান্ত কুলির দল উল্লাসে চিৎকার করে উঠল, খচ্চররাও জলের গন্ধ পেয়ে এমন পাগলের মত সেদিকে ছুটে গেল যে ধরে রাখাই দায় হয়ে উঠল। গাছগুলোর কাছাকাছি হতেই সমস্ত সাফারিটা অত্যন্ত বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ল। আমরা ছায়াঘেরা অঞ্চলে গিয়ে পৌছলাম। সূর্যের প্রখর তাপ সেখানে প্রবেশ করতে পারে না, বাতাস শীতল, স্নিগ্ধ। গাছের লম্বা লম্বা গুঁড়ির তলা দিয়ে কাকচক্ষু জলের স্রোত বয়ে চলেছে। সেই জল পান করে আর রোদে-পোড়া মুখে দিয়ে আমরা তীরে শুয়ে পড়ে সেই অপূর্ব শোভা লক্ষ্য করতে লাগলাম।

অসংখ্য পায়রা ডুমুরের ফল খেয়ে চলছিল। আমেরিকানরা শিকার করল ঘণ্টাখানেক, আর কুলিরা তাঁবু খাটাতে ব্যস্ত রইল। পায়রারা অত্যন্ত দ্রুত-গতি,—উডন্ত পাখি মারার হাত পরীক্ষা করার বিশেষ উপযোগী। জলে একটা জলহস্তীর মাথা দেখা দিল, অথচ জল এত কম যে তার সমস্ত শরীরটা জলের নিচে ডোবে কি না সন্দেহ। কী করে যে জলহস্তীরা এখানে এল বোঝা গেল না। কুলিদের আহারের জন্যে একটা জলহস্তী মেরে দিলাম। আশ্চর্য অল্প সময়ের মধ্যেই সমস্ত মাংস নিঃশেষ হয়ে গেল।

দশ দিন এখানে রইলাম আমরা। বিশ্রাম করে, আর পথ চলার সময় যত চোট লেগেছে তার শুশ্রূষা করে কটা দিন কাটল। একদিন ভোরে আমরা ভারাক্রান্ত মনে এই মনোরম পরিবেশ ছেড়ে ঙ্গরোঙ্গরোর অগ্নিমুখ লক্ষ্য করে বেরিয়ে পড়লাম।

ক-দিনের কঠোর পথশ্রমের পর নিভে-যাওয়া অগ্নিগিরির লম্বা লম্বা গাছের

শ্রেণী আমাদের চোখে পড়ল। সমতল ভূমি থেকে রুয়েঞ্জরোর উচ্চতা ন-হাজার ফুট, তার মুখ কুয়াসায় ছাওয়া। অগ্নিগিরির দক্ষিণ অঞ্চলে একটা ছোট নদী, সন্ধ্যার দিকে আমরা সেখানে পৌছে তাঁবু খাটালাম। এ যেন কোন গ্রীষ্মপ্রধান দেশের রূপকথার রাজ্য! চারিদিকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছ, গাছের ডালে ডালে যুক্ত হয়ে মাথার উপর প্রকাণ্ড ছাদের সৃষ্টি হয়েছে। বড-বড গুঁড়ির মধ্যে দিয়ে রঙ-বেরঙের কত পাখি উড়ে বেড়াচ্ছে। বিশেষ করে ভাল লাগছে কদলীভুক অপূর্ব পাখিগুলো। ঘোর নীল রঙের শরীরে রক্তবর্ণ তাদের ডানা। মাথার উপর ডালে ডালে বানরের লম্ফঝম্ফ আর কচকচানি। হাতি, গণ্ডার আর সিংহেরও অজস্র চিহ্ন সর্বত্র।

সেদিন সন্ধ্যায় আমরা আগুনের পাশে বসে আছি, অন্ধকার থেকে সিংহের বিরক্তিসূচক গর্জন ভেসে আসছে। খচ্চরের দল মহাভয়ে বিকট চিৎকার শুরু করল, পালাবার চেষ্টায় দড়িতে টান দিতে লাগল। আগুনের বৃত্তাকার আলোয় ফুরি আর আমি আরো মজবুত করে তাদের বেঁধে রাখলাম। ফুরি বললেন সিংহ পারতপক্ষে বেঁধে রাখা জন্তুকে আক্রমণ করে না, সে চেষ্টা করে যাতে সে ভয় পেয়ে অন্ধকারের মধ্যে ছুটোছুটি করে, তখন সিংহ আক্রমণ করে তাকে। আমার কিন্তু বিশ্বাস, সিংহদের কাছে খিদের চেয়েও কৌতূহলই অধিক প্রবল। সিংহ অত্যন্ত কৌতূহলী প্রাণী। সিংহের দল সাধারণত কয়েক বর্গ-মাইল সমচতুষ্কোণ জায়গা অধিকার করে থাকে। এ জায়গাটাকে তারা মনে করে তাদের নিজস্ব এলাকা। মানুষ যখন এখানে এসে পৌছয়, সিংহেরা এই অজানা জীবদের দেখবে বলে এগিয়ে আসে।

শুয়ে পড়বার পরে আমি তাঁবুর চারিদিকে সিংহের পাদচারণার শব্দ শুনছিলাম। পায়চারি করছে আর দীর্ঘশ্বাসের মত শব্দ করছে—ওদের গভীর নিশ্বাসের শব্দও কখনো কখনো আমার কানে আসছে, কিন্তু তবুও ওরা আগুনের ধারে বেঁধে-রাখা খচ্চরগুলোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েনি, কৌতূহল চরিতার্থ হতে শেষ পর্যন্ত চলে গেছে।

আমেরিকানদের ইচ্ছে কব্জির সঙ্গে রিভলভার বেঁধে ঘুমোয়। এই মারণাস্ত্রটি আমেরিকানদের অত্যন্ত প্রিয়, অথচ আমি কখনও এর মধ্যে কোন সুবিধে দেখতে পাই না। এমন কোন রিভলভার তৈরি হয়নি যাতে করে হয়ত গণ্ডার বা সিংহের আক্রমণ প্রতিহত করা সম্ভব। তার উপর আবার এ দিয়ে নির্ভুল গুলি করাও প্রায় অসম্ভব বলতে গেলে, কারণ পেছনদিকটা বেরিয়ে

না থাকায় কাঁধের সঙ্গে লাগিয়ে লক্ষ্যস্থির করা যায় না, ফলে হাত কাঁপতে থাকে। তবে, এমন অনেক আমেরিকানও আছে দেখেছি যারা অনেক কালের অভ্যাসের ফলে রিভলভারের ব্যবহারে খুব রপ্ত হয়ে পড়েছে।

পরদিন ভোর থেকে আমাদের অগ্নিগিরি আরোহণ শুরু হল। শিকারের চিহ্ন ধরেই অগ্রসর হওয়া গেল, কারণ পাহাড়ে জঙ্গলে পথ খোঁজার ব্যাপারে জীবজন্তুরা অত্যন্ত নিপুণ,—সবচেয়ে সহজ পথটা ঠিক তারা আবিষ্কার করবে। তা সত্ত্বেও সেই বাঁশ আর সিমোসার ঝোপের খাড়াই বেয়ে চলতে চলতে কুলিরা বেজায় হাঁপাতে শুরু করল। নিভে যাওয়া অগ্নিগিরির মুখে যখন এসে পৌঁছলাম, বিকেল তখন গড়িয়ে গেছে।

ক্রেটারের মুখে পৌঁছে নিচের গভীর গহ্বরের দিকে তাকিয়ে নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইল সবাই। ঘেরা মুখটার অপর প্রান্ত ওখান থেকে পনেরো মাইলের কম হবে না। ঙ্গরোঙ্গরোর সম্বন্ধে যত গল্প শুনেছি, ঐ বিস্তীর্ণ সবুজ এলাকা জুড়ে অসংখ্য জীবজন্তুর যে দৃশ্য এখন আমাদের চোখে পড়ল সে তুলনায় কিছুই নয় তা। সমস্ত ক্রেটারটা জুড়ে গিজ-গিজ করছে শিকার। হাজার হাজার পশুর চারণক্ষেত্র এই প্রান্তরের সমস্ত ঘাস যেন কে সুন্দরভাবে ছেঁটে দিয়েছে। চারিদিকে কেবল জন্তু আর জন্তু—যতদূর পর্যন্ত দৃষ্টি যায়, জন্তুতে জন্তুতে যেন সাদা আর বাদামির মাখামাখি। জেব্রা, এলাণ্ড, জিরাফ, টোপি, ওয়াটারবাক, রীডবাক, বুশবাক, স্টেইনবক, টমসন গ্যাজেল, গ্র্যাণ্ট গ্যাজেল, ইমপালা, ডুইকার, অরিবি আর অস্ট্রিচ—অসংখ্য, অসংখ্য! শ্বেতাঙ্গদের আবির্ভাবের পূর্বে সমস্ত আফ্রিকারই দৃশ্য ছিল এইরকম। যত রাজ্যের শিকার সব এখন এই নিরালা ক্রেটারে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেছে।

আমেরিকান দু-জন এই দেখে এমন কাণ্ড শুরু করল, যেন ছোট ছোট ছেলেদের হঠাৎ মিঠাইয়ের দোকানের ভিতরে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। সমানে ওরা গুলি চালিয়ে গেল, থামল কেবল যখন আর গরম রাইফেলে হাত দিতে পারল না। দিনের মাত্র কয়েকটা ঘণ্টা যেন ওদের হত্যার নেশা চরিতার্থ করার পথে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। চামড়া আর শিং সংগ্রহের ব্যাপারে ওদের যেন শ্রান্তি নেই, ক্লান্তি নেই। গুলির নেশা তখন ওদের পেয়ে বসেছে। পরে জেনেছিলাম, নিজেদের দেশে শিকারের ব্যাপারে অনেক বাধা নিষেধের নিগড় থাকায় প্রথম আফ্রিকায় এসে শিকারের প্রাচুর্য দেখে আমেরিকানরা অমনিই হয়ে উঠে।

নূতনত্বের উত্তেজনা স্তিমিত হতে তাদের ঝোঁক হল এমন একটা কিছু স্মারক নিয়ে যাবে যা হবে পৃথিবীর রেকর্ড। বলতে কি, প্রতিদিন প্রাতরাশের টেবিলে রোল্যাণ্ড ওয়ার্ডের 'রেকর্ডস্ অব্ বিগ গেম' (বড় শিকারের রেকর্ড-সংগ্রহ) বইটা দেখে দেখে আমার বিরক্ত ধরে গিয়েছিল। বিশেষ করে চমৎকার হল ক্রেটারের ইমপালাগুলো। দিনের পর দিন আমাদের কাটল বাইনোকুলার দিয়ে এমন একটা জন্তুর সন্ধানে যার মাথাটা রেকর্ড হওয়া সম্ভব। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল একটা,—চমৎকার একটা জন্তু, শিংদুটো তাব মনে হল তিরিশ ফুটেরও বড। তার পাশেও ছিল একটা চমৎকার পুরুষ ইমপালা, যদিও ওর চেয়ে সেটা সামান্য ছোট। একজন শিকারী ভাল করে লক্ষ্য স্থির করে গুলি ছুড়ে দিল। কিন্তু হায়, মারা পডল, ছোট জন্তুটা। কী দুঃখের কথা! তার লম্বা, বাঁকানো শিংদুটো যতরকম ভাবে সম্ভব মাপা হল, কিন্তু কোনমতেই সেটা আটাশ ইঞ্চির বেশি হল না। স্মারক হিসেবে অপূর্ব সন্দেহ নেই, কিন্তু তাহলেও রেকর্ড তো নয়! একেই বলে শিকারীর ভাগ্য! এ বিষয়ে আর কিছুই করা যায় না।

ভোরের দিকে শিকারে বেরিয়ে প্রায়ই দেখতাম কোন আকাশিয়া গাছের ছায়ায় একটা সিংহ রয়েছে। অপূর্ব এই ক্রেটারের সিংহ,—সাইজ বা কেশরের দিক দিয়ে আমার মনে হয না এর তুলনা আফ্রিকায় আর কোথাও আছে। চমৎকার এখানকাব জলবায়ু, তার উপব জীবজন্তুর খাদ্যও অপর্যাপ্ত, সুতরাং ওদের এই অতিকায় আকৃতিতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। শিকাবিদেব খুব ইচ্ছে কয়েকটা সিংহ শিকার করে এবং আমারও এতে উৎসাহের অভাব ছিল না। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল যে ক্রেটারের খোলা মেঝেয় শিকার করা আর ডোঙ্গায় শিকার করার মধ্যে প্রচুর পার্থক্য।

আজকের দিনে শিকারিরা মোটরে করে একদল সিংহের নিকটবর্তী হয়ে নির্বিঘ্নে ছবি তুলতে পারে, কারণ সিংহ মোটরগাড়িকে ভয় করে না। কিন্তু ক্রেটারের মেঝেয় ছোট ছোট ঘাসের মধ্যে সিংহ শিকার ব্যাপারটা একেবারে অন্য রকম। সিংহের দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, একবার চোখে পডলে ওরা ঠিক মানুষের নডাচডা বা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসা লক্ষ্য করে থাকে। যদি বা শুয়ে পেটে ভর করে অগ্রসর হবার চেষ্টা করা যায়, সিংহও উঠে বসে ভাল করে লক্ষ্য রাখে। অনেকটা ঘুরে গেলে হয়ত তাকে এডিয়ে যাওয়া সম্ভব হতে পারে, কিন্তু তখনও পরিস্থিতি সিংহের অনুকূলে থাকায়, যেই সে গুলির পাল্লার

মধ্যে গিয়ে পৌছয় সঙ্গে সঙ্গে উঠে পেছিয়ে যায় সিংহ। আর একবার যদি সে চলতে শুরু করে তাহলে আর কোন আশাই নেই, কারণ আশ্চর্য তার লুকোবার ক্ষমতা। এমন ছোট ছোট ঘাসের মধ্যে সিংহকে লুকিয়ে থাকতে দেখা গেছে যে অমন জায়গায় যে কোন খরগোসেরও লুকিয়ে থাকা সম্ভব, এ কথাও বিশ্বাস করা কঠিন।

কীভাবে অগ্রসর হওয়া উচিত এ বিষয়ে ফুরির সঙ্গে যুক্তি করলাম। দেখা গেল, সবচেয়ে সহজ উপায় হল আমাদের শিকারীদের একজনের উটপাখির চামড়ায় সেজে এমনভাবে সিংহদের কাছে যাওয়া যাতে তার গন্ধ সিংহেরা না পায়। মতলবটা চমৎকার মনে হল। একটা উটপাখি গুলি করে আন্দোলোকে বললাম তার ছাল ছাড়াতে। তার অর্ধেকটা কাজ হয়ে গেছে, এমন সময় ফুরি এগিয়ে এল। বললে, 'একটা কথা মনে হল। উটপাখি যে সিংহের প্রিয় খাদ্য!'

আবার নতুন করে আলোচনার পর ঠিক হল, এভাবে নয়, অন্য কোন উপায় গ্রহণ করতে হবে।

এবার টোপ দেবার চেষ্টা হল। ঠিক হল ফুরি বা আমি একটা অ্যান্টেলোপ মেরে সেটাকে টানতে টানতে নিয়ে যাব এমন একটা ঝোপের আড়ালে যেটা কোন সিংহের দিনের বেলার আড্ডা হওয়া সম্ভব। পেট চিরে পেটের গ্যাস বের করতেই প্রচুর গন্ধ বেরোবে, আর এমন জায়গায় সেটা ফেলে রাখা হবে যেখান থেকে গন্ধটা ঠিক সিংহদের কাছে পৌছোয়। সন্ধ্যাবেলা এমনি কয়েকটা টোপ ফেলে আমরা পরদিন সকালে গিয়ে দেখব সিংহ এসেছিল কি না।

টোপে কোন জন্তু এসেছিল কি না এটা বুঝতে পারা কঠিন নয়। সিংহের সবচেয়ে পছন্দ পাঁজরার উপরের নরম হাড়গুলো, তাই প্রথমটা সেগুলো খাওয়াই ওর পক্ষে স্বাভাবিক। সিংহের আরও একটা অভ্যাস হল শিকারের কাছেই প্রস্রাব করা আর তারপরেই পেছনের পা দিয়ে খুব জোরে জোরে মাটি আঁচড়ানো—সে দাগ খুব স্পষ্ট হয়েই ফুটে ওঠে। চিতাবাঘেরও স্বভাব প্রায় সেইরকম, তবে, সে কোন খাবার চিহ্ন রাখে না। হায়েনা খাওয়ার পর ভাঙা ভাঙা হাড় ফেলে রাখে আর তার পায়ের চিহ্নও ফুটে ওঠে।

খুব সাবধানে লক্ষ্য করা হয় সিংহের কোন কেশর শিকারে লেগে আছে কি না, কারণ তা থেকে সিংহের গায়ের রঙ আন্দাজ করা হয়ে থাকে। যে

সিংহের কেশর কালো তার চাহিদাই সবচেয়ে বেশি। ক্রেটারের সিংহের কেশর কখনো কখনো তাদের পা পর্যন্ত লম্বা হতে দেখা গেছে।

দুর্ভাগ্যবশত এ অঞ্চলে মুর্দাফরাসের এতই প্রাচুর্য যে সিংহ টোপের কাছে যাবার সুযোগ আদৌ পায় কি না সন্দেহ। সিংহ এসে পৌছবার আগেই বনের মুর্দাফরাস হায়েনা আর শিয়ালরা এসে সমস্ত মৃতদেহ খেয়ে পরিষ্কার করে রাখে, আর দিনের বেলা আর-এক মুর্দাফরাস শকুনের পাল এমনভাবে তা ঘিরে রাখে যে কেবল শকুনের কালো কালো ডানার ঝাপটা আর লম্বা লম্বা সরু গলা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাওয়া যায় না। কচিৎ কখনো কোনো হায়েনা হয়ত এই ভিড়ের মধ্যে লাফিয়ে পড়ে তার দেহের ভারে একটা জায়গা করে নেয়, আবার এমনও কখনো দেখা গেছে যে শকুনদের পাশাপাশি চিতাবাঘও ভোজনে ব্যস্ত। এও লক্ষ্য করেছি যে কোন চিতাবাঘ খাওয়া শেষ করে একটা শকুনকে ধরে নিয়ে চলে গেছে,—ভোজের শেষ পদ হিসেবেই হয়ত।

টোপের উপর এমন কয়েকটি মুর্দাফরাস থাকা অবশ্য একপক্ষে ভাল, কারণ এতে সিংহের সাহস বাড়ে। শেয়ালের হুক্কাহুয়া আর হায়েনার ইউ-এ-ইউ ডাকে সিংহ আকৃষ্ট হয়, কিন্তু যে অঞ্চলে মুর্দাফরাসের সংখ্যা এত বেশি যে সিংহ গিয়ে পৌছবার আগেই সমস্ত শেষ হয়ে যায়, সেখানে টোপ ফেলা নিরর্থক। কাঁটা দিয়ে টোপ চাপা দেবার চেষ্টাও করে দেখা গেছে, কিন্তু যত পুরু করেই কাঁটা ডাল চাপানো হোক, মুর্দাফরাসের দল ঠিক সে সমস্ত সরিয়ে ফেলে।

শিকারের দিকে সন্তর্পণে অগ্রসর হওয়া বা টোপ ফেলা দুইই যখন ব্যর্থ হল, ফুরি আর আমি ঠিক করলাম এই সিংহদের অভ্যাস লক্ষ্য করে দেখব, যদি তাতে কোন উপায় উদ্ভাবন করা যায় যাতে আমাদের শিকারিরা গুলি করার সুযোগ পেতে পারে। বেশ কয়েকদিন লক্ষ্য করার পর ফুরি বললে, 'রাত্রিবেলাই দেখছি সিংহেরা শিকার করে আর সেই শিকার খেয়ে থাকে, আর ভোর হতে নলখাগড়ার ঝোপের আড়ালে তাদের ডেরায় ফিরে যায়। শিকারী দুজন কোন ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থাকলে হয়ত সিংহের ফেরার পথে তাকে গুলি করতে পারে।'

এ মতলব পরীক্ষা করে আমরা সাফল্য লাভ করলাম। কয়েকদিনের মধ্যেই চমৎকার চারটে সিংহ শিকার করা হল। তার মধ্যে তিনটের হল কালো কেশর, আর বাকিটার কেশর হল প্ল্যাটিনাম আর কমলা রঙের। বিরাট সে সিংহ, সে পর্যন্ত আমি যত স্মারক দেখেছি সে সমস্তর সেরা।

এই সাফারির সাফল্যের জন্যে আমি ফুরির কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। যেমন তীক্ষ্ণ তার বুদ্ধি, বন্দুকের লক্ষ্যও তেমনি নির্ভুল। আমাদের শিকারীরা একটা সিংহ শিকার করায় ছেলেদের বললাম সেই সিংহের ছালটা একটা খচ্চরের পিঠে বেঁধে দিতে তাঁবুতে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। চামড়াটা যখন তার পিঠে বাঁধা হচ্ছে তখন পর্যন্ত সে কিছু লক্ষ্য করেনি ; কিন্তু ছেড়ে দেওয়া-মাত্র সে পাগলের মত দৌড়োদৌড়ি শুরু করল, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই পিঠের বোঝা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে ছুটল ক্রেটার পার হয়ে। মনে হল, হারালাম বুঝি সেটাকে। কিন্তু কয়েকদিন পরেই দেখা গেল সে একপাল জেব্রার সঙ্গে ঘুরছে—যেন কতদিনের পুরোনো বন্ধু। ছেলেরা ধরতে যেতেই সেও জেব্রার দলের সঙ্গে পালালো। ফুরির কথা শুনে তখন আমরা বাকি খচ্চরগুলোর পেছনের দু-পা বেঁধে ছেড়ে দিলাম, আর দূর থেকে স্বজাতিদের দেখা পেয়ে পালানো খচ্চর আপনা থেকেই ফিরে এল।

এই ক্রেটারের জঙ্গলে হাতি আর গণ্ডার শিকারের ব্যাপারেও আমরা ফুরির প্রচুর সাহায্য পেয়েছিলাম। ঙরোঙ্গরোয় যে এত বড় বড় শিকার পাব তা আগে থেকে আন্দাজ করতে পারি নি, তাই তার উপযুক্ত গুলি আমরা খুব বেশি আনি নি। যে গুলি আমাদের ছিল, হাতি বা গণ্ডারের মোটা খুলি ভেদ করার পক্ষে তা যথেষ্ট নয়। এ সমস্যারও সমাধান ফুরি করল গুলিগুলো খুলে খুলে সেগুলোর সফ্ট্ পয়েন্ট উল্টোমুখ করে বসিয়ে। এর ফলে গুলির নিকেল করা দিকটা সামনে থাকায় তা হাতি বা গণ্ডার শিকারের পক্ষে যথেষ্ট হল।

এতদিনেও আমরা ক্যাপ্টেন হার্স্টের কোন খবর পাই নি। ক্যাপ্টেন হার্স্ট হলেন একমাত্র ইংরেজ যাঁর এই ক্রেটারে একটা ছোটখাট গোলাবাড়ির মত ছিল। আমরা তখন ঙরোঙ্গরোয় আছি, আরুশার ডিস্ট্রিক্ট কমিশনারের একজন রানার একটা খবর নিয়ে এল। এই গরমে সে এতটা পথ পায়ে হেঁটে এসেছে, পথে কোথাও জলের চিহ্নমাত্রও নেই। একটা চেরা লাঠির মাথায় করে সে খবরটা নিয়ে এসেছে। কমিশনার আমায় লিখেছেন ক্যাপ্টেন হার্স্টের মৃত্যুর তদন্ত করতে আর তাঁর জিনিসপত্র সব আরুশায় নিয়ে যেতে।

ক্যাপ্টেন হার্স্টের গোলাবাড়িতে গিয়ে দেখি, ছেলেরা সব সেখানে চুপচাপ বসে রয়েছে কাজের কোন নির্দেশ না পেয়ে। তাদের সর্দার বললে, 'ক্যাপ্টেন দিন-দশেক হল একটা হাতির কবলে পড়ে মারা গেছেন। কাঁধে গুলি খেয়ে আহত হাতিটা একটা ঘন ঝোপের মধ্যে পালিয়ে যায়, আর তার পথ

আটকাবার জন্যে ক্যাপ্টেন উল্টোদিক দিয়ে অগ্রসর হন। একেবারে হাতির মুখোমুখি পড়ে যান তিনি। রাইফেল তোলার সময় পর্যন্ত তিনি পান নি, সঙ্গে সঙ্গে হাতিটা তাঁকে শুঁড়ে জড়িয়ে ধরে।'

ক্যাপ্টেনের প্রধান অনুচর বললে, 'হাতিটা ক্যাপ্টেনকে নিকটবর্তী একটা গাছের কাছে নিয়ে গিয়ে তাঁকে গাছের গুঁড়িতে আছাড় মারে। বাওয়ানা চিৎকার করে উঠতেই আবার এক আছাড়। বাওয়ানা দ্বিতীয়বার চিৎকার করে ওঠেন, হাতিও আবার তাঁকে সেই গাছের সঙ্গে আছাড় মারে,—এবার আগের চেয়েও বেশি জোরে। এরপর আর বাওয়ানা কোন শব্দ করেন নি, হাতিও তাঁকে ফেলে চলে যায়।'

ছেলেটির এই কাহিনী অবিশ্বাস করবার কোন হেতু নেই।

ক্রেটারের কাছেই একটা ছোট খড়ে ছাওয়া কুটিরে বাস করতেন ক্যাপ্টেন হার্স্ট। কুটিরের সামনের বারান্দায় বসে তিনি সন্ধ্যাবেলা জীবজন্তুর যে সমারোহ দেখতে পেতেন, মানুষের পক্ষে সুদুর্লভ সে দৃশ্য। ঙরোঙ্গরোর জলবায়ু অপূর্ব। বিষুবরেখা থেকে মাত্র কয়েকশো মাইল দূরে হলেও উচ্চতার জন্যে এখানকার আবহাওয়া শীতল ও স্নিগ্ধ,—চিরবসন্ত এখানে, শীতের বা গ্রীষ্মের প্রাবল্য এখানে অনুভূত হয় না। চারিদিকে শিকারের প্রাচুর্য, আর কুটিরের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে এক ঝিরঝিরে ঝরনা। বনেও ফলের অভাব নেই। মানুষ এখানে স্বর্গসুখে বাস করতে পারে। চারিদিকে তাকিয়ে মনে হল, জীবনের বাকি দিনগুলো দিব্যি আরামে এখানে কাটিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

ক্যাপ্টেনের সম্পত্তি বলতে ছিল যৎসামান্যই। তার মধ্যে ছিল একপাল উটপাখি,—কাঁটার ঝোপে ঘেরা একটা জায়গায় তাদের ব্যবস্থা হয়েছিল। মনে হয় উটপাখির পালকের ব্যবসার কথা ক্যাপ্টেনের মনে ছিল। পাখিদের মুক্তি দেবার জন্যে দরজাটা খুলে দিলাম, কিন্তু কিছুতেই তারা ওখান থেকে বেরোতে রাজি হল না। তাদের বের করার জন্যে শেষ পর্যন্ত আমায় তাদের ডেরায় আগুন দিয়ে দিতে হল। কিন্তু বোকা পাখিগুলো আগুন নিভে যেতেই আবার ফিরে এসে গরম ছাইয়ের উপর গিয়ে দাঁড়াল। শেষ পর্যন্ত তাদের কী হল জানি না, তবে, তাদের হাবভাব দেখে মনে হল যে না খেতে পেয়ে মরতে হলেও তারা ওখান থেকে নড়তে রাজি নয়।

এর চেয়েও বড় সমস্যা হল ক্যাপ্টেনের সিংহ-শিকারের জন্যে পোষা

চমৎকার অস্ট্রেলিয়ান ক্যাঙারু-হাউণ্ডগুলোকে নিয়ে। এই প্রকাণ্ড হাউণ্ডগুলোর সঙ্গে বড় বড় কর্কশচর্ম গ্রে হাউণ্ডের সাদৃশ্য আছে। এদের অবস্থা বিশেষ সঙিন, কারণ প্রভুর মৃত্যুর পর থেকে কেউ এদের দিকে ফিরেও তাকায়নি। এদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করলাম। এরাও যেন কেমন করে বুঝতে পেরেছিল যে আমি তাদের প্রতি প্রসন্ন, তাই যেখানেই যাই তারা আমার পিছু ছাড়ল না।

আমার শিকারিদের ইচ্ছে নয় ক্যাপ্টেন হার্স্টের মালপত্র নিয়ে আরুশায় ফিরে যায়; তাদের মতলব হল সেরেঙ্গেতি পার হয়ে পুবমুখো হয়ে তাবোরা পর্যন্ত গিয়ে সেখানে ট্রেন ধরা। ওদের ইচ্ছেই অবশ্য আমায় মানতে হবে, তাই ফুরি আর আমি ঠিক করলাম, তাবোরা পর্যন্ত ওদের সঙ্গে গিয়ে ওদের ট্রেনে তুলে দেব, তারপর ফুরি ওখানে থেকে যাবে স্মারকচিহ্নগুলো রওনা করে দেবার জন্যে আর আমি কুলিদের নিয়ে ঙ্গরোঙ্গরোয় ফিরে ক্যাপ্টেন হার্স্টের মালপত্র গুছিয়ে নিয়ে আরুশায় ফিরব।

ক্রেটারের পূর্ব প্রান্ত ধরে সেরেঙ্গেতি পার হয়ে তাবোরা পর্যন্ত পথে কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেনি। সেখানে আমাদের শিকারিদের কাছে বিদায় নিয়ে আমি কুলিদের নিয়ে ঙ্গরোঙ্গারোয় যাবার পথ ধরলাম, প্রধান কুলি আন্দোলোকে রেখে এলাম যাতে সে স্মারকগুলো রওনা করে দেবার ব্যাপারে ফুরিকে সাহায্য করতে পারে। ফুরির শেষ উপদেশ হল, লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে কুলিদের কখনো মাংসের অভাব না হয়, তাহলেই আর তারা কোনরকম ঝঞ্ঝাটের সৃষ্টি করবে না। এই অমূল্য উপদেশের সারবত্তা উপলব্ধি করতে আমার দেরি হল না।

ঙ্গরোঙ্গরোয় পৌঁছে আমি ক্যাপ্টেন হার্স্টের কুটিরে কয়েক দিন কাটালাম আর ইতিমধ্যে প্রস্তুত হয়ে নিলাম আরুশা সফরের দীর্ঘ পথ পাড়ি দেবার জন্যে। ক্যাঙারু-হাউণ্ডগুলো চমৎকার হয়ে উঠেছিল, ওদের নিয়ে কয়েকটা দিন শিকারের লোভ সামলাতে পারলাম না। সিংহ-শিকারের ব্যাপারে কুকুরের ভূমিকাই বলতে গেলে প্রধান। সমতল অঞ্চলে কোন সিংহের দেখা পাওয়ামাত্র কুকুরের পাল তাকে তাড়া করে, চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলে তার পালাবার পথ বন্ধ করে দেয়। কুকুরের তাড়ায় সিংহকে এমন ব্যস্ত থাকতে হয় যে শিকারী তাকে মাত্র কয়েক গজের ব্যবধান থেকেই গুলি করার সুযোগ পেতে পারে। যে কুকুর চালাক সে কখনো সিংহের একেবারে কাছে যায় না,

তার মারাত্মক থাবা থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে চলে। সিংহ আক্রমণ করা মাত্র কুকুর তাকে পথ ছেড়ে দেয়, তারপর সুযোগ বুঝে সিংহকে তাড়া করতে থাকে আর সুবিধে পেলে পেছন থেকে কামড় পর্যন্ত লাগাতে ছাড়ে না যতক্ষণ না ফিরে দাঁড়ায় সে। ভাল ভাল পাঁচটা সিংহ আমি শিকার করলাম, কারণ আমি জানতাম এদের ছাল নাইরোবিতে ভাল দামে বিকোবে। এ কথা তখন মনে হয়নি যে এমন দিনও আসতে পাবে যখন বহুমূল্য শিকারী জন্তু হিসেবে সিংহ-শিকার নিষিদ্ধ হবে। তখনকার দিনে সিংহকে এক মারাত্মক ও অনিষ্টকর প্রাণী হিসেবেই ধরা হত।

অবশ্য সিংহেরাও যে তার প্রতিশোধ নেয়নি তা নয়। ব্যাপারটা ঘটেছিল ক-দিন পরে। আমি তখন আরুশার পথে বেরিয়ে পড়েছিলাম। ক্যাপ্টেন হার্স্টের সম্পত্তির মধ্যে ছিল অনেকগুলো দুধের পাত্র—পূর্ব-আফ্রিকায় সেগুলোর দাম অনেক। এই পাত্রগুলো আমরা খচ্চরের পিঠে বেঁধে নিয়েছিলাম। সেরেঙ্গেতির সমতল ভূমিতে পৌঁছতে এত অসহ্য গরম হতে লাগল যে সবাই অনুরোধ করল দিনে বিশ্রাম করে রাত্রে পথ চলতে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমাদের তাতে রাজি হতে হল, যদিও রাত্রে পথ চলা সম্বন্ধে আমার মনে সন্দেহ ছিল যথেষ্ট। দিনের বেলা গরমের সময় বিশ্রাম করে সন্ধ্যায় বেড়িয়ে পড়া—এভাবে কয়েক মাইল পথ অতিক্রম করলাম। এমন সময় হঠাৎ কুকুরগুলো খুব ঘেউ-ঘেউ চিৎকার শুরু করল। কয়েক মিনিট লাগল তাদের এই চিৎকারের অর্থ বুঝতে। কিছুক্ষণ পরেই চারিদিক থেকে সিংহের সাড়া পাওয়া গেল। খচ্চরদের গন্ধ তারা পেয়েছে, তাই সমস্ত সাফারির দলটাকে ঘিরে তারা আক্রমণের সুযোগের অপেক্ষা করছে। চিৎকার করে কুলিদের নির্দেশ দিলাম, খচ্চরগুলোকে যেন এক জায়গায় জড়ো করে রেখে সকলে তাদের ঘিরে গোল হয়ে থাকে। সেই ব্যবস্থাই হল, কিন্তু তাতে করে সিংহদের হটিয়ে দেওয়া সম্ভব হল না। মতলব করেই তারা গেল যেদিক থেকে হাওয়া বইছে সেদিকে, খচ্চররা যাতে তাদের গন্ধ পেয়ে আতঙ্কে বিহ্বল হয়ে উঠে।

সিংহের গন্ধ পাওয়ামাত্র খচ্চরগুলো সত্যিসত্যিই আতঙ্কে পাগলের মত হয়ে উঠল। কুলিরা তাদের মুখ চেপে ধরল, কিন্তু তবুও তারা শান্ত হল না, দুর্দান্তভাবে পা ছুড়তে লাগল। সিংহেরা আরো কাছে আসতেই আতঙ্কিত খচ্চরদের আর আটকে রাখা গেল না। সর্বত্র চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা—খচ্চরের

চিৎকার, সিংহের গর্জন, কুলিদের চেঁচামেচি আর টিনের পাত্রের ঠোকাঠুকির প্রচণ্ড শব্দে চারিদিক মুখরিত হল। সিংহদের দিকে আন্দাজ করে গুলি ছুড়লাম, কিন্তু তার প্রত্যুত্তরে এল কেবল ক্রুদ্ধ গর্জনের পর গর্জন। খচ্চরদের আটকে রাখা অসম্ভব হয়ে উঠছে দেখে কুলিদের বলে দিলাম তাদের ছেড়ে দিতে। ছাড়া পেতেই সঙ্গে সঙ্গে তারা অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেল— তাদের পিঠে বাঁধা টিনের পাত্রগুলো থেকে এমন শব্দ হতে লাগল যে মনে হল যেন কোন বয়লার ফ্যাক্টরির আওয়াজ। যদি না আটকে রাখা যেত, কুকুরগুলোও তাহলে তাদের মত পালাতো।

আমি নিশ্চিত জানি যে খচ্চরগুলো সিংহের উদরস্থ হবে, কিন্তু তখন আর কীই বা করবার ছিল! কুলিদের বললাম যে রাতটা ওখানেই কাটানো হবে। বসে পড়লাম; পাইপ ধরালাম একটা—বড় শান্তি পাই এই ধূমপানে। তারপর খানিকটা বালি খুঁড়ে শয়নের ব্যবস্থা করলাম। মাথার হেলমেটটা হল বালিশ। ঘুমোলাম ভোর পর্যন্ত।

আলো হতে, বেরিয়ে পড়লাম খচ্চরদের সন্ধানে। কিছুক্ষণের মধ্যেই দশটা সিংহের পায়ের ছাপ চোখে পড়ল। নটা পুরুষ আর একটা স্ত্রী সিংহ। আশ্চর্য হলাম দেখে যে সিংহের পায়ের ছাপগুলো অন্যদিকে চলে গেছে। আর কয়েক মাইল যেতেই খচ্চরের দলটার দেখা মিলল,—একফালি সমতল জমির উপর তারা এক জায়গায় জড়ো হয়ে রয়েছে,—আর সিংহের কোন চিহ্নই নেই।

খচ্চরদের নিয়ে ফিরতে ফিরতে লক্ষ্য করলাম, তারা একেবারে সিংহের দলের মধ্য দিয়ে ছুটে চলে এসেছিল। তাদের পিঠে বাঁধা টিনের পাত্রগুলো থেকে এমন শব্দ হয়েছিল যে সিংহেরা ভয় পেয়ে পালিয়েছিল, হয়ত মনে করেছিল না জানি এ আবার কোন জন্তু তাদের আক্রমণ করল। পৃথিবীর ইতিহাসে সিংহের পরাজয়ের এমন নজির আর দ্বিতীয় আছে কি না সন্দেহ।

আরুশার পথে এর পর আর বিশেষ কোন ঝঞ্ঝাট হয় নি। ক্যাপ্টেন হার্স্টের সম্পত্তি নাইরোবিতে তাঁর ভাইয়ের ঠিকানায় জাহাজে তুলে দিলাম। এই ঘটনার কিছুকাল পরে আমার এই ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়। তিনি বললেন যে ভাইয়ের মৃত্যুতে তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে একটা দলিল পান, তাতে ঙরোঙ্গরো গিরিমুখের একটা নিরানব্বই বছরের লীজ তাঁর উপর বর্তায়। তিনি বললেন, 'এ জায়গাটা আমার কোন কাজে লাগবে না; তুমি যদি চাও

তো একরে পঁয়তাল্লিশ টাকা হারে আমি এটা তোমাকে লীজ দিতে প্রস্তুত।'

হিলডার সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে এলাম যে ও লীজের কোন মূল্যই থাকবে না যদি না জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ওখানেই কাটাতে প্রস্তুত থাকি; কারণ অত্যন্ত দুর্গম ও অঞ্চল। হায়, তখন যদি জানতাম যে ঙরোঙরো থেকে নাইরোবি মোটরে মাত্র দু-দিনের পথ হয়ে যাবে আর তা আফ্রিকার একটি বিশেষ দর্শনীয় স্থান বলে পরিগণিত হবে! সে সময়ে স্থাবর সম্পত্তির মূল্য ছিল অতি সামান্য, হাজার হাজার বর্গমাইল জমি তখন নামমাত্র মূল্যে পাওয়া যেত। ভবিষ্যতে যে এ অঞ্চল গোলাবাড়ি আর ব্যাঙের ছাতার মত ছোট-ছোট শহরে ভবে উঠবে, এর কোন আভাস পাওয়া তখন সম্ভব ছিল না। আমাদের কাছে তখন একমাত্র মূল্যবান বস্তু হল গজদন্ত আর পশুচর্ম। মিঃ হার্স্টকে তাই আমার অনিচ্ছা জানিয়ে দিলাম।

॥ পাঁচ ॥ শিকারী—কেউ সাহসী কেউ ভীতু

এখন থেকে কুড়ি বছরের বেশিরভাগই আমার কেটেছে শ্বেতাঙ্গ শিকারী হিসেবে—নাইরোবিকে কেন্দ্র করে বেলজিয়ান কঙ্গো থেকে দক্ষিণ আবিসিনিয়া পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চলটা ছিল আমার শিকারের ক্ষেত্র। এই সময়ে আমি শিকারে নিয়ে গিয়েছি যুবরাজ ও রাজকন্যা স্কোয়ার্জেনবার্গকে, ব্যারন ও ব্যারনেস রথস্‌চাইল্ডকে, তাছাড়া ইউরোপের অনেক বিত্তবানকে, অনেক রাজা-মহারাজাকে আর আমেরিকার অসংখ্য কোটিপতিকে। এমন অনেক শিকারীকেও আমি নিয়ে গিয়েছি যারা মধ্যবিত্ত ঘরের,—বছরের পর বছর টাকা জমিয়ে তবে আফ্রিকায় আসতে পেরেছে বড় শিকারের সন্ধানে।

নাইরোবিতে কয়েকটা সমিতি আছে যারা শিকারিদের সাফারির ব্যবস্থা করে দেয়। এহেন কোন সমিতির পক্ষেই সাধারণত আমি কাজ করতাম। অনেকগুলো বিভিন্ন সমিতির সঙ্গে যুক্ত থাকলেও আমার বেশিরভাগ কাজ হত সাফারিল্যাণ্ড ইনকর্পোরেটেড-এর সঙ্গে। বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই ওরা কাজ করে আসছে এবং র‍্যাডক্লিফ ডাগমোর, মার্টিন জনসন দম্পতি, আগা খাঁ, আর সাম্প্রতিক কালের মেট্রো-গোল্ডুইন মেয়ারের 'কিং সলোমন্‌স্ মাইন্‌স' ছবির মত বিশিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সাফারির বন্দোবস্ত করেছে।

সাফারিল্যাণ্ডের ছিল বেতনভুক শিকারীদের লম্বা এক তালিকা, আর কাজকর্ম যখন খুব ভাল ছিল তখন একটা সাফারি থেকে ফিরে এলেই সঙ্গে-সঙ্গে শ্বেতাঙ্গ শিকারীকে অন্য একটা সাফারিতে বেরোতে হত।

যাকে নিয়ে শিকারে যেতে হচ্ছে সম্পূর্ণ অজানা সে, বোঝবার উপায় নেই সে কী ধরনের মানুষ। হয়ত সে নার্ভাস প্রকৃতির মানুষ, নাইরোবি থেকে মাত্র কয়েক মাইল এগিয়েই খুশি,—ফিরে গিযে যাতে বলতে পারে যে আফ্রিকার গহন অরণ্যে শিকার করে এসেছে। কিংবা সে বিশেষ উৎসাহী,—ভাল স্মারক সংগ্রহের আশায় জীবন পর্যন্ত বিপন্ন করতে প্রস্তুত। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করতাম শিকারীর ইচ্ছামত চলতে। কারুর হয়ত চাই এমন একটা মাথা যা রেকর্ড হিসেবে রয়ে যাবে,—কেউ বা কেবল এই শিকারের দেশে ঘুরে ফিরেই খুশি।

লোকে বলে, শ্বেতাঙ্গ শিকারী হিসেবে সাফল্য লাভ করতে হলে যেমন চাই সৈনিকের মত দৃঢ় মানসিক শক্তি, তেমনি চাই ধনিক ও অভিজাত সম্প্রদায়ের সঙ্গে সহজভাবে মেলামেশার ক্ষমতা। সাফারিল্যাণ্ডের একজন বিশিষ্ট শিকারীর কিন্তু মত অন্য রকম। তিনি বলেন, 'দেখ হাণ্টার, সব সময়ে মনে রাখবে যে তোমার কাজের শতকরা নব্বই ভাগই হল তোমার শিকারিদের খুশি রাখা, আর মাত্র দশ ভাগ শিকার করা।' গল্পগুজবে আমার তেমন ব্যুৎপত্তি না থাকায় সাফারিল্যাণ্ড এমন শিকারিদের সঙ্গেই আমায় পাঠাতো, স্মারক সংগ্রহের দিকে যাদের ঝোঁক বেশি। কিন্তু চাপের সময় যখন অত বাছাবাছি সম্ভব হত না তখন আমায় চেষ্টা করতে হত শিকারীর কোন্ দিকে ঝোঁক তা লক্ষ্য করে তাকে খুশি করা এবং এতে যে আমি একেবারে ব্যর্থ হয়েছিলাম তা নয়।

প্রথমদিককার অভিজাত খদ্দেরদের মধ্যে ছিলেন এক ফরাসী কাউণ্ট ও কাউণ্টেস, দুর্গ সাজাবার মত কিছু স্মারক পেলেই তাঁরা সন্তুষ্ট। ইউরোপের অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা ফ্যাশন ছিল ভয়ঙ্কর আফ্রিকায় গিয়ে বন্য জন্তু শিকার করা এবং এর ফলে আমরা শিকারীরা লাভবান হয়েছিলাম। সাফারিল্যাণ্ডের মাধ্যমে এই দম্পতির জন্যে একটা খুব আরামের সাফারির ব্যবস্থা হল। বড-বড় তাঁবু খাটানো হল, তাতে অনেকগুলো খোপ করে সাজঘর, স্নানঘর ইত্যাদির ব্যবস্থা হল। তাঁদের সেবার জন্যে স্থানীয় শিক্ষিত ভৃত্যই হল আটজন, আর রসদ যা সঙ্গে নেওয়া হল, একটা ছোটখাট হোটেলের পক্ষেও তা পর্যাপ্ত।

বেরিয়ে পড়বার আগে কাউণ্ট স্পষ্টই বলে দিলেন যে একমাত্র যে জিনিসে তাঁর উৎসাহ সে হচ্ছে হুইস্কি,—এ যেন প্রচুর পরিমাণে সঙ্গে নেওয়া হয়। ফলে বন্দুকের গুলি যত না নিলাম তার চেয়ে বেশি নিলাম হুইস্কি,—ভাগ্যে তাই করেছিলাম! গুলি একেবারে না নিলেও হয়ত চলত, কিন্তু হুইস্কি না নিলে যে কাউণ্টকে বাঁচানোই সম্ভব হত না তাতে সন্দেহ নেই।

কয়েকদিন পরে একদিন একটা চমৎকার কৃষ্ণকেশর সিংহ আমাদের চোখে পড়ল। সিংহটাকে দেখে তো কাউণ্টেস চিৎকার করে অস্থির, বললেন, এক্ষুনি তিনি নাইরোবিতে ফিরে যাবেন. আর কাউণ্ট কম্পিত হাতে বন্দুকটা তুলে ধরে চিন্তিতভাব বললেন, 'কিন্তু ধর যদি আমার গুলিতে না মরে সিংহটা, তাহলে ও কী করবে?'

'হয়ত তেড়ে আসবে আমাদের; কিন্তু ভয় নেই, আমি তাকে রাইফেল দিয়ে রুখে দেব।' আমি বললাম।

এ কথায় মাথা নাড়লেন কাউণ্ট। বললেন, 'একটু হুইস্কি খেয়ে নিলে ভাল হত।' ফেরা হল তাঁবুতে।

কাউণ্টের সিংহ-শিকার ঐ পর্যন্তই। সেদিন সন্ধ্যায় কাউণ্ট দম্পতি আমায় তাঁদের সঙ্গে সুরাপানে নিমন্ত্রণ করলেন। কাউণ্ট বললেন, 'একটা খাসা মতলব আমার মাথায় এসেছে। তুমি তো শিকারী, কেমন? বেশ। আমি এখানে রয়ে গেলাম; বেশ সুন্দর সুন্দর কয়েকটা স্মারক আমায় এনে দাও দেখি, ফিরে গিয়ে যা বন্ধুদের দেখাতে পারব!'

স্বীকার করলাম, মতলবটা ভালই; এতে করে অনেক সময় বাঁচবে, আর অনেক দুর্ভাবনা থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। অনেক ভাল ভাল জন্তু আমি তাঁদের মেরে দিলাম, আর কাউণ্টেস তাদের প্রত্যেকটার সঙ্গে নিজের ছবি তুললেন শিকারের পোশাকে, রাইফেল বাগিয়ে ধরে; আর প্রতিবারই ব্যগ্র হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেমন মানাচ্ছে আমায়, হাণ্টার?'

এসব ব্যাপারে আমি ছিলাম যাকে বলে আনাড়ি, তাহলেও বললাম, 'চমৎকার!' আর তা শুনে খুশি হলেন তিনি। কাউণ্টেসের ইচ্ছে তাঁর স্বামীও অমন ভঙ্গিতে কয়েকটা ছবি তোলেন, কিন্তু তা আর সম্ভব হল না, কারণ ক্যামেরায় ছবি তুলতে যেটুকু সময় দরকার ততক্ষণ বসে থাকবার মত অবস্থাও তাঁর কোন সময়েই হত না। বেশিরভাগ সময়েই তাই আমায় কাউণ্টেসের সঙ্গে কাটাতে হত,—হয় জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতাম, কিংবা হয়ত কোন ঝরনার

ধারে কিংবা কোন বড় আকাশিয়া গাছের নিচে বসে দু-জনে চা পান করতাম।

শ্বেতাঙ্গ শিকারীর একটা বড কাজ হল দু-মাস বা তিন মাসের মত সরঞ্জাম সংগ্রহ করে গুছিয়ে নিয়ে যাওয়া। বিরক্তিকর কাজ সন্দেহ নেই, আর বড় বড সাফারির বেলায় এ দায়িত্ব রীতিমত গুরুত্বপূর্ণ হয়েই দেখা দেয়। কোন-কোন শিকারীর সঙ্গে আবার এত বড বড তাঁবু থাকে যে তাকে একটা ছোটখাট শহর বলা চলে। নিজেদের ব্যবহারের জন্যে বিদ্যুতের ব্যবস্থা পর্যন্ত কারুর কারুর থাকে। প্রতিটি তাঁবুর আলাদা স্নানের টব, প্রসাধন আর আরামের আরও কতরকম ব্যবস্থা। গাডি আর ট্রাক চালু রাখবার জন্যে যন্ত্রপাতি যা নেওয়া হয়, তাকে একটা ছোটখাট দোকান বলা যেতে পারে। ছ-টা বা সাতটা পদের যে নিয়মিত রান্নার ব্যবস্থা হয়, লণ্ডন বা প্যারিসের সেরা হোটেলের সঙ্গে তা পাল্লা দেবার যোগ্য। এসব ছাড়াও থাকে সেরা মদ্যের সরবরাহ। এমনি এক একটা বিরাট সাফারির সঙ্গে দু-জন, কখনো বা তিনজন শ্বেতাঙ্গ শিকারীও থাকে,—তাদের কারুর কাজ মালপত্র আর ট্রাকের তদারক করা, কারুর কাজ শিকারের সন্ধান করা।

এইসব বিলাসপ্রিয় শিকারিদের কিন্তু শিকারে বিশেষ উৎসাহ দেখা যায় না। একবার আমি এক রাজাকে শিকারে নিয়ে গিয়েছিলাম। একটা গণ্ডারের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল যার খড়্গটা ছিল পৃথিবীর রেকর্ড হবার যোগ্য। কিন্তু কিছুতেই রাজা গাডি থেকে নামতে রাজি হলেন না, পাছে লম্বা লম্বা ঘাসে তাঁর প্যাণ্ট ভিজে যায়; বললেন গাড়ি করে ওর পিছু নিতে। কিন্তু গণ্ডারটা ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল।

এই ঘটনার অল্প কিছুদিন পরে আমি কম্যাণ্ডার গ্লেন কিডস্টন নামে এক ব্রিটিশ শিকারীকে শিকারে নিয়ে গিয়েছিলাম। তাঁর ইচ্ছে সিধে-শিঙাল অ্যাণ্টেলোপ অরিক্স-এর সন্ধানে উত্তর সীমান্ত অঞ্চলে যাবেন। কেবলমাত্র যা না নিলে নয় তা ছাড়া আর কিছুই আমরা সঙ্গে নিলাম না। আবিসিনিয়া সীমান্তের মরুভূমি অঞ্চলে গরম এত বেশি যে গণ্ডাররা দিনের বেলায় বালিতে গর্ত করে থাকে। আবিসিনিয়ার ক্রীতদাস-ব্যবসায়ী আর ডাকাতদের অত্যাচার এ অঞ্চলে অত্যন্ত বেশি। জল এখানে সোনার চেয়েও দামি। অনেকক্ষণ ধরে বালি খোঁড়ার পর সামান্য যেটুকু নোংরা জল চুইয়ে উঠত তাতেই ওরা নিজেদের কৃতার্থ বোধ করত। একটা তাঁবু থেকে তো আমাদের জলপাত্র-গুলোই চুরি গেল। এই সমস্ত কষ্টের পুরস্কার স্বরূপ ক্যাপ্টেন কিডস্টন যে

অরিক্স শিকার করেছিলেন, সেটা তখন পর্যন্ত পৃথিবীর রেকর্ড ; আর যে কুডু শিকার করেছিলেন সেটা কেনিয়ার রেকর্ড।

তখন পর্যন্ত শ্বেতাঙ্গ শিকারী হিসেবে আমার মাইনে ছিল পঞ্চাশ পাউণ্ড। এই সাফারি থেকে ফেবার পব আমার মাইনে ক্রমে বাডতে বাড়তে দুশো পাউণ্ডে গিয়ে উঠেছিল,—তখন পর্যন্ত শ্বেতাঙ্গ শিকারীর সবচেয়ে বেশি মাইনে ছিল তাই।

বড শিকারকে যেসব শিকারী ভয় কবে তাদেব নিয়ে অনেক সময়ে ভারি সুবিধে হয। একবার আমি সুইজারল্যাণ্ডের এক কোটিপতিকে শিকারে নিয়ে গিয়েছিলাম। নাইরোবি রেল স্টেশনে রেখে দেওযা দেডশো পাউণ্ড ওজনের চমৎকার গজদন্ত দেখে তিনি অবাক হয়ে গিয়েছিলেন, দেখা হতে প্রথমেই তাই বললেন, অমন দাঁত তাঁর চাই। উত্তবে আমি বললাম যে তিনি প্রায় তিরিশ বছর দেরি করে ফেলেছেন, অমন বড-বড-দাঁতওয়ালা হাতি আজকাল দুর্লভ। যাই হোক, কয়েকদিনের ঘোরাঘুরির পর একটা হাতির দেখা মিলল যার দাঁত ঐ মাপের চেয়ে কম হবে না। খুব সন্তর্পণে হাতিটাকে অনুসরণ করে শেষ পর্যন্ত তাকে নাগালের মধ্যে আনা গেল। গুলি করলেন ভদ্রলোক, কিন্তু সে গুলি গিয়ে লাগল হাতির ডান দাঁতে আর সঙ্গে সঙ্গে হাতি দৌড় লাগালো। এদিকে ভদ্রলোক ভাবলেন বুঝি হাতি তাঁকে তাডা করেছে, তাই তিনি উল্টোদিক লক্ষ্য কবে তীরবেগে দৌড লাগালেন। শেষ পর্যন্ত যখন আমরা তাঁর কাছে গিয়ে পৌছলাম, ভয়ে তখন তাঁর চলার শক্তি পর্যন্ত লোপ পেয়েছে। তখনো ভদ্রলোক করুণ স্বরে বলে চলেছেন, 'দাঁত! দাঁত! ঐ দাঁত আমার চাই!' অগত্যা তখন আমায় একাই হাতিটার পিছু নিয়ে তাকে মারতে হল। দাঁত পেয়ে ভদ্রলোক এতই খুশি হলেন যে একটা চমৎকার গাডি তিনি আমায় উপহার দিয়ে ফেললেন। স্কচম্যান আমি, তাই এহেন সাফারি স্বভাবতই আমার খুব পছন্দ।

কোন-কোন শিকারী আবার এতই দুঃসাহসী যে তাদের একরকম হঠকারীই বলা যেতে পারে। দু-জন ক্যানাডার শিকারীর সঙ্গে তখন আমি সিংহ-শিকারে এসেছি। একদিন সকালে টোপগুলো দেখতে গেছি। প্রথম টোপটার কাছে গিয়ে দেখলাম, সেটা অক্ষত। টোপটা লক্ষ্য করছি, এমন সময় হঠাৎ হাওয়া ঘুরে গেল। কয়েক গজ দূরে কতকগুলো লম্বা লম্বা ঘাসের মধ্যে একদল সিংহ ছিল, হাওয়ায় আমাদের গন্ধ তাদের কাছে পৌছতেই হঠাৎ তিনটে কেশরী

সিংহ সেই ঘাসের মধ্যে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে উঠল। তারা তখন ভোজনে ব্যস্ত ছিল।

আমরা যে জায়গায় ছিলাম তার একদিকে সিংহ আর অন্যদিকে ঘন জঙ্গলে ভরা নদীতীর। সেই জঙ্গলের মধ্যে আশ্রয় নেবার উদ্দেশ্যে সিংহেরা সবেগে আমাদের পাশ কাটিয়ে চলে গেল। আমি কিছু করার আগেই আমার তুই সঙ্গী গাড়ি থেকে নেমে সিংহদের পিছু ধাওয়া করে বসল। ফাঁকা জায়গাটা অতিক্রম করে ছুটে গেল মানুষ আর সিংহ। সিংহেরা চলল লেজ সাপটাতে সাপটাতে, যদি তাতে চলার বেগ আরও দ্রুত হয়। একটা সিংহ বাঁদিকে মোড় ফিরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কয়েকটা লাফে নদীর দিকের ফাঁকা জায়গাটা অতিক্রম করে গেল। সঙ্গে সঙ্গে থেমে পড়ল শিকারীরা। রাইফেল বাগিয়ে ধরে বাকি তুটো সিংহকে গুলি করতেই তারা খরগোসের মত ডিগবাজি খেয়ে পড়ে গেল। শিকার করাটা যেন ওদের কাছে ফুটবল খেলার মতই একটা মজার ব্যাপার ছাড়া আর কিছু নয়।

শিকারীর তুঃসাহসের ফলে মাঝে মাঝে প্রচুর তুর্ভাবনার মধ্যে পড়তে হয়; কারণ কে বলতে পারে কোন্ বন্য জন্তু কখন কী করে বসবে। অভিজ্ঞ শ্বেতাঙ্গ শিকারীর জন্তুর আচার ব্যবহার সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা থাকে এবং তার ধারণা সাধারণত দশ বারের মধ্যে ন'বার সঠিক হয়ে থাকে। কিন্তু এই যে একবার সঠিক হয় না, সেই একটিবার নিয়েই যত বিপদ। তার পক্ষে যা নিতান্ত অসম্ভব, সেরকম কোন ব্যাপার ছাড়া আর কোন ব্যাপারেই তার সম্বন্ধে নিশ্চয় করে কিছু বলা চলে না। কখনো হয়ত সে নিতান্ত অকারণে অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, আবার হয়ত কখনো মানুষের সান্নিধ্যে আশ্চর্যরকম শান্ত হয়ে থাকে। গণ্ডারকে সাধারণত বলা হয় আফ্রিকার বন্য জন্তুদের মধ্যে সবচেয়ে বদমেজাজি; কিন্তু একবার আমি একটা গণ্ডারকে দেখেছিলাম, সে ইচ্ছে করলেই একজনকে গুঁতিয়ে দিতে পারত কিন্তু তবু তা করেনি।

সেবার আমি এক রাজাকে শিকারে নিয়ে গিয়েছিলাম। তিনি কখনো তাঁর সেক্রেটারি আর ডাক্তারকে কাছছাড়া করতেন না। বলতে গেলে একটা পুরো ডাক্তারখানাই ডাক্তার সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। জঙ্গলে গিয়ে কিন্তু ডাক্তারকে সব রকমের কাজ করতে হল; একটা ভারি মুভি ক্যামেরা নিয়ে রাজার কীর্তিকলাপের ছবি তুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, এদিকে ওষুধের পর ওষুধে তাঁর পকেটগুলো ফুলে-ফুলে উঠেছে।

একবার আমরা মোষ শিকার করতে গেছি। রাজা আর আমি এগিয়ে যাচ্ছি, সেক্রেটারি আর ডাক্তার আমাদের পেছনে। একটা পালে চমৎকার একটা মোষ ছিল, রাজা গুলি করলেন তাকে লক্ষ্য করে। গুলির আওয়াজ শুনে মোষের দল ভয়ে আত্মহারা হয়ে কাঁটাঝোপ ভেঙে ছুটতে শুরু করল। রাজার যেমন স্থির বিশ্বাস গুলি ঠিক লেগেছে, আমারও তেমনি স্থির বিশ্বাস মোটেই তা নয়; কারণ মাংসে গুলি লাগলে যে আওয়াজ হয় সে আওয়াজ হয়নি।

ওঁদের মনিবের কথাই যে ঠিক তাই প্রমাণ করবার জন্যে ডাক্তার আর সেক্রেটারি রক্তের সন্ধানে গেলেন। ঘুরতে ঘুরতে ওঁরা গিয়ে পড়লেন একটা পুরুষ গণ্ডারের সামনে। মোষের দলের দৌড়োদৌড়িতে বিরক্ত হয়েই হয়ত সে একটা নির্জন জায়গার খোঁজে ছিল। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলে হয়ত কোন গোল হত না, কিন্তু তা না করে ডাক্তার হতচকিত সেক্রেটারির দিকে ছুটে গেলেন, এই আশাতেই হয়ত, যে যদি গণ্ডারটা তাঁকে ছেড়ে সেক্রেটারিকে তাড়া করে। ব্যাপারটা বুঝতে সেক্রেটারির বিলম্ব হল না, তাড়াতাড়ি তিনি একটা নিকটবর্তী গাছে গিয়ে উঠলেন। গাছের গুঁড়িতে নিজেকে বিজ্ঞাপনের মত লেপটে রেখে ডাক্তারকে উদ্দেশ্য করে চিৎকার করে উঠলেন, 'পালান পালান শিগগির!'

ডাক্তার দৌড় শুরু করতে গণ্ডার মুহূর্তকাল থেমে দাঁড়িয়েছিল। পরক্ষণে সে তাঁর পিছনে ধাওয়া করল,—ছুটছে আর গুঁতোবার ভঙ্গিতে বাতাসে মাথা নাড়ছে।

প্রাণভয়ে দৌড়ে চলেছেন ডাক্তার, মহাবেগে ধেয়ে চলেছেন। কিন্তু তাহলেও গণ্ডার খুব সহজেই তাঁকে ধরে ফেলল। এদিকে ডাক্তার আর গণ্ডার এক লাইনে হওয়ায় আমি গুলি করতে পারছি না। তবে, দেখলাম যে গণ্ডার তেমন একটা ভয়ঙ্কর আক্রমণ করছে না। কোন মানুষ হঠাৎ গণ্ডারের কাছে গিয়ে পড়ার চেয়ে কোন গণ্ডার হঠাৎ মানুষের কাছে গিয়ে পড়ার মধ্যে বিপদের সম্ভাবনা অনেকটা কম, কারণ প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে গণ্ডারের ভয় পাওয়ার যথেষ্ট হেতু আছে। 'বাঁচাও! বাঁচাও!' বলে চিৎকার করতে করতে ডাক্তার কাঁটাঝোপের মধ্য দিয়ে ছুটে চলেছেন আর গণ্ডার তাঁর পিছু-পিছু ছুটে চলেছে আর মাঝে মাঝে খড়্গ আস্ফালন করে ডাক্তারকে আরো জোরে ছুটতে উৎসাহিত করছে। শেষ পর্যন্ত যখন ডাক্তার অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে আর ছুটতে

পারছেন না, টলে টলে পড়ছেন, গণ্ডারও তখন গতিবেগ কমিয়ে দিল। কিন্তু তবুও পিছু নেওয়া ছাড়ল না। ব্যাপারটা দেখে আমার কৌতূহল এতই প্রবল হয়ে উঠল যে গুলি করার কথা আর আমার মনে রইল না। পরম উৎসুকভাবে দেখতে লাগলাম কিভাবে গণ্ডারটা তাঁকে দৌড় করিয়ে চলেছে। শেষ পর্যন্ত গণ্ডার বিরক্ত হয়ে চলে গেল। ডাক্তার আমাদের কাছে এলেন—প্রচুর ঘামছেন তিনি, ক্লান্তিতে প্রায় অবসন্ন হয়ে পড়েছেন। তাঁর প্রথম কথাই হল, "উঃ, কি বিপদেই যে পড়েছিলাম!'

সবচেয়ে বিরক্তিকর কাজ হল এমন লোককে শিকারে নিয়ে যাওয়া, রক্তের নেশায় নিছক হত্যাকাণ্ডেই যার আনন্দ। গোলাগুলি আমি প্রচুর ছুড়েছি সত্য, কিন্তু বিনা কারণে কখনো নয়। অনেক শিকারীই আমায় বলেছে, 'হাণ্টার, তিনশো প্রাণী মারার লাইসেন্স আমার আছে, অথচ এ পর্যন্ত মেরেছি মাত্র দুশো। কী মনে হয়, কয়েক দিনের মধ্যেই বাকিটা মারতে পারব তো?' অধিকাংশের মধ্যেই অবশ্য নেশাটা বেশিদিন থাকে না। এমন অনেক আমেরিকানকে আমি নাইরোবিতে নিয়ে গিয়েছি যারা অসংখ্য প্রাণী বধ করতে এসে মাত্র কয়েক দিন পরেই বন্দুক ফেলে ক্যামেরা ধরেছে আর সাফারির বাকি দিনগুলো ফোটো তুলেই কাটিয়ে দিয়েছে।

জ্যাক হলিডে, প্রধানত যাঁর উৎসাহে আমার এই বই লেখা, একবার একটা কাহিনী আমায় বলেছিলেন। তিনি আর তাঁর পথপ্রদর্শক রয় হোম একবার একটা চমৎকার পুরুষ হাতির পিছু নিয়েছিলেন। আমার বিশ্বাস, হাতির পায়ের চিহ্ন দেখে তার দাঁতের আকৃতি আন্দাজ করা যায় না, যদিও অনেক শিকারী এ বিষয়ে আমার সঙ্গে একমত নন; পায়ের দাগ ছোট এমন কোন-কোন হাতিরও বিরাটাকার হাতির চেয়েও বড় দাঁত দেখা গেছে। পায়ের ছাপের গোড়ালির দিকটা যদি বেশি বসে যায় তাহলে নাকি বুঝতে হবে খুব সম্ভব সে পুরুষ হাতি এবং বৃদ্ধ ও খুব সম্ভব প্রকাণ্ড দাঁতের অধিকারী। এই হাতিটারও পায়ের ছাপ দেখে মনে হয়েছিল অত্যন্ত বৃদ্ধ এবং তার দাঁতও প্রকাণ্ড। অনেকক্ষণ ধরে অনেক কষ্ট করে খোঁজার পর জ্যাক আর রয় দেখলেন, হাতিটা একটা ঝরনার ধারে দাঁড়িয়ে রয়েছে। নিশ্চয় কোন শব্দ তার কানে এসেছিল, কারণ তার দু-কান সম্পূর্ণ খাড়া, আর বাতাসে গন্ধ নেবার জন্যে শুঁড় উঁচু করে তোলা। তার দাঁতদুটোর মত এমন চমৎকার দাঁত বহু বছরের শিকারী জীবনেও রয় কখনো দেখেনি। অবিস্মরণীয় সেই ছবি: 'বনের

গহনে নির্ভীক দৃপ্ত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে হাতিটা, তার গায়ের স্লেট রঙের উপর ঝলমল করছে দাঁতদুটো। ধীরে ধীরে জ্যাক রাইফেলটা তুলে ধরলেন। চমৎকার তাঁর হাত। রয় তো অপেক্ষা করে আছেন কখন হাতিটা মরে পড়বে, হুলিডে কিন্তু গুলি করলেন না। রাইফেলটা নামিয়ে, মাথা নেড়ে বললেন, 'না না, অত চমৎকার প্রাণীকে বধ করা সম্ভব নয়!' ফিরে গেলেন ওঁরা; বুড়ো হাতি তার অভিজ্ঞ দৃষ্টিতে তাঁদের চলে যাওয়া লক্ষ্য করল।

সপ্তাহের পর সপ্তাহ একটা ভাল শিকারের পেছনে ঘোরার পর অতি অল্প শিকারীই এমন হৃদয়াবেগের বশে শিকার ছেড়ে চলে আসতে পারে। কিন্তু এহেন আরও দৃষ্টান্ত আমার অভিজ্ঞতায় আছে। একবার এক অল্পবয়স্ক ইয়েল-এর ছাত্রকে আমি শিকারে নিয়ে যাই। তার খুব ইচ্ছে একটা বঙ্গো শিকার করে—বঙ্গো হল এক ধরনের বন্য অ্যান্টোলোপ, অতি অপূর্ব এবং দুষ্প্রাপ্য। বঙ্গো শিকারের একমাত্র উপায় বলতে গেলে কুকুরের পাল নিয়ে তার পিছু ধাওয়া করা। তখন আমরা অনেক পরিশ্রমের পর বনের গহনে এক গ্রামে গিয়ে পৌঁছেছি। গ্রামের মোড়লকে বললাম, 'বঙ্গো শিকারের জন্যে একপাল কুকুর চাই।' খুশিমনেই সে গোটা বারো কুকুর আমায় দিল। কুকুরগুলো দেখতে বিশ্রী আর ছোট ছোট হলেও এ ব্যাপারে খুব ওস্তাদ। বেরিয়ে পড়লাম আমরা। কয়েকবার বিফল হবার পর কুকুরদের ডাক আর গ্রামবাসিদের গলার আওয়াজ শোনা গেল। ঘন ঝোপের মধ্যে পথ করে সবেগে সেখানে গিয়ে দেখলাম, কুকুরগুলো একটা চমৎকার বঙ্গোকে নদীর ধারে কোণঠাসা করে ফেলেছে। হাঁটুতে ভর করে এক পা তুলে দাঁড়িয়ে সে শত্রুদের যুদ্ধংদেহি ঘোষণা করছে। তাকে ঘিরে কুকুরের পাল, আর একপাশে দাঁড়িয়ে গ্রামবাসিরা চিৎকার করে চলেছে।

হাত বাড়িয়ে দেখিয়ে দিয়ে বললাম, 'ঐ আপনার শিকার!'

শিকারী বন্দুকটা তুলে ধরে কিন্তু পরক্ষণেই নামিয়ে নিল। বললে, 'আহা, বেচারা! ওকে কি মারা যায়! এতগুলো কুকুর আর গ্রামবাসিদের সঙ্গে কী করে ও পারবে! এ অবস্থায় ওকে মারা অন্যায় হবে!'

অগত্যা শিকার না করেই আমাদের ফিরতে হল এবং গ্রামবাসিরা যে এতে অত্যন্ত হতাশ হল এ বলাই বাহুল্য।

কত রকমের শিকারীই না দেখা যায়। একজনের ধারণা ছিল তাঁর লক্ষ্য অব্যর্থ। সেরা সেরা আগ্নেয়াস্ত্র তাঁর ছিল, বন্দুক আর গোলাগুলি সম্বন্ধে বেশ

গভীরভাবে অনেক জ্ঞানের কথাই তিনি বলতেন। একবার আমরা একপাল দাঁতাল শুয়োরের পিছু নিই,—সমতল ভূমির উপর দিয়ে মহাবেগে তারা ধেয়ে চলেছে। আমার সঙ্গী তাঁর ম্যাগাজিন রাইফেল বের করে গুলিবর্ষণ শুরু করলেন। কৌতুকের সঙ্গে লক্ষ্য করলাম, প্রত্যেকটা গুলিই হয় উপর দিয়ে, নয় তো এপাশ বা ওপাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে, একটাও শুয়োরদের গায়ে লাগছে না। এদিকে শিকারীর গুলি ফুরিয়ে গেছে। এই ভেবে আমি আশ্বস্ত হচ্ছি যে আফ্রিকার জঙ্গলে বন্দুকের গুলির দুর্ঘটনা বড একটা ঘটে না, এমন সময় শিকারী বললেন, 'হাণ্টার, আশা করি তুমি আমার এই হত্যাকাণ্ডতে আপত্তি করবে না! জন্তুগুলো চারিদিকে রোগ ছড়ায়, এই কারণেই ওদের নিঃশেষ করে দেওয়া আমার উদ্দেশ্য।' আমি তাঁকে আশ্বস্ত করলাম, বললাম আমার এতে কোন আপত্তি নেই, আর মনে মনে হাসলাম।

কোন-কোন শিকারীকে নিয়ে যেমন মাথাব্যথার শেষ নেই, মাঝে মাঝে তেমনি আবার এমন শিকারীও পাওয়া যায় যাদের সঙ্গ সত্যিই আনন্দদায়ক। এক অল্পবয়স্ক ইংরেজ মেয়ের কথা মনে পড়ে, নাম তার ফে। বয়স হয়ত তার সবে কুড়ি পূর্ণ হয়েছে। জীবনের সবচেয়ে বড আনন্দ তার শিকারে। ফে-কে শিকারে নিয়ে যাবার পর বহু বছর কেটে গেছে, কিলিমানজোরোর চূড়ায় অনেক তুষারপাত হযেছে; কিন্তু আজও তার ছবি আমার চোখে স্পষ্ট: প্রায় কাউবয়েব মত তার পোশাক, ঘোর রঙের চুলে সিল্কের ফিতে আলগাভাবে লাগানো আর চুলগুলো জামার নিচে দিয়ে দেওয়া; সরু কোমরে চামডার ফ্যান্সি বেল্টে গুলির সারি। ফে হল যাকে বলা যায় খাঁটি প্রকৃতির বুকের মেয়ে। তার মাছ ধরার হাত চমৎকার, বন্দুকের তাক নির্ভুল। ঘোডায় চডার ব্যাপারেও খুব ওস্তাদ সে। তার ঘোড়া আর কুকুরের দলের সমস্ত ভালবাসা সে পেয়েছিল। মুহূর্তের জন্যেও ফে-র মধ্যে উৎসাহের অভাব দেখা যায়নি, যেকোন পরিস্থিতির জন্যেই সর্বদা সে প্রস্তুত।

সাফারিতে বেরোবার সময় স্থানীয় অধিবাসিদের কাছ থেকে অনেকগুলো খচ্চর ভাড়া করা হয়েছিল মালমাত্র বহনের জন্যে। ইউরোপীয়দের গায়ের গন্ধ তারা পছন্দ করত না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা নষ্ট হল ঐ নার্ভাস প্রাণীদের মালপত্রে সাজিয়ে নিতে, অনেক ধমক দিতে হল। শেষ পর্যন্ত ওরা তৈরি হল। যাত্রার হুকুম করলাম, কিন্তু বিশেষ ভাল মেজাজে নয়। খচ্চরগুলো কিন্তু কিছুতেই নডতে চায় না। সমস্যার সমাধান করতে ফে-র সময় লাগল না। তার

ব্যাগের এক লুকোনো কোণ থেকে একটা অত্যন্ত ভারি চাবুক সে বের করল, ফে-র ছোট্ট হাতের পক্ষে সেটা মনে হল অসম্ভব ভারি। কিন্তু পরমুহূর্তেই ঐ দশ ফুট লম্বা চাবুকটা সে খচ্চরগুলোর' পিঠে মারতে শুরু করল, তাতে এমন আওয়াজ উঠল যেন হাতি-মারা বন্দুক ছোড়া হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে খচ্চরের দল ছত্রছান হয়ে চারিদিকে ছিটকে পড়ল। পলকের মধ্যেই দেখা গেল তাদের পিঠের বোঝা পেটের নিচে ঝুলছে। কুলিরা তাদের ধরে আয়ত্তে আনার আগেই সমস্ত মালপত্র চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। চার ঘণ্টার কঠোর পরিশ্রমের ফল দশ সেকেণ্ডে পণ্ড হল। ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে আমি ফে-র দিকে তাকালাম, সে কিন্তু মাটিতে বসে পড়ে চিৎকার করছে আর হো হো করে হেসে চলেছে।. চেঁচাতে চেঁচাতে, হাসতে হাসতে কোনরকমে সে বললে, 'কী হল হাণ্টার, অমন গোমড়ামুখো হয়ে আছ কেন?' আর যাই হোক, উৎসাহের অভাব কখনো ফে-র কোষ্ঠিতে লেখেনি।

খচ্চরগুলো লক্ষ্য করলাম বিশেষ কাজের নয়—মালপত্র বহনের জন্যে তাই একটা গরুর গাড়ির ব্যবস্থা করা হল। গাড়িটা অত্যন্ত ভারি, তার গতিও মন্থর; গাড়োয়ান তাই তাদের তাড়াতাড়ি চালাবার জন্যে নাম ধরে গালাগালি দিতে লাগল আর সমানে চাবুক চালাতে লাগল। গরুর গাড়ির মত মন্থরগতি কোন গাড়ি প্রাণচঞ্চল ফের পক্ষে অসহ্য; বললে সে, 'এভাবে গেলে জীবনে পৌছতে পারব না। আমি আমার গাড়ি নিয়ে আগে আগে যাচ্ছি।' কিন্তু আমরা যেখানে যাব সেখানে যাবার কোন রাস্তা তো নেই, আমার তাই সন্দেহ হল গাড়ি করে যাওয়া সম্ভব হবে কি না। কিন্তু সে বললে, তার স্টুডিবেকারের অগম্য স্থান নেই। বেশি দরকারি জিনিসগুলো গাড়িতে নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। আমি বসলাম মালপত্রের ঢিবির উপরে আর ফে বসল চালকের আসনে।

কয়েক মিনিট যেতে না যেতেই আমি বুঝলাম, গরুর গাড়িতে না এসে ভুল করেছি। ফে-র স্টুডিবেকারের মধ্যে আধুনিক জীপের যা গুণ তা আছে মনে হল, আর, পথ যেমনই হোক না কেন, সর্বদাই সে অত্যন্ত বেগে চালাতো। কাঁটা-ঝোপ ভেদ করে গাড়ি চলল, গাছের ডালগুলো দু-দিক থেকে সপাং সপাং করে আমার গায়ে লাগছে। ছোট ছোট ঝরনার উপর দিয়ে আমাদের গাড়ি এত বেগে ছুটে চলল যে গাড়ির চাকা কাদায় আটকাবার পর্যন্ত সময় পেল না; আর ফাঁকা জায়গায় তো ফে একেবারে পূর্ণ বেগে ধেয়ে

চপল। প্রচণ্ড বেগে চলতে চলতে গাড়িটা একটা উইটিবিতে ধাক্কা খেল আর সঙ্গে সঙ্গে মালপত্রের সঙ্গে আমিও শূন্যে ছিটকে পড়লাম। নিচে যখন পড়লাম, স্টুডিবেকার তখন সেখান থেকে সরে গিয়ে তেমনি বেগে ধেয়ে চলেছে। সমস্ত মালপত্রের উপরে আমি পড়লাম,—চমৎকারভাবে পড়লাম; আমার পাইপটা তখনো তেমনি আমার দাঁতের মধ্যে চেপে রাখা রয়েছে।

ফে যখন আমার অনুপস্থিতি আবিষ্কার করল গাড়ি ততক্ষণে মাইল-দুই পথ অতিক্রম করেছে—এও সে আবিষ্কার করেছে আরো কিছু মালপত্র পড়ে যাবার শব্দ পেয়ে। পূর্ণবেগে ফিরে এসে দেখল, আমি তখনো মালপত্রের উপর বসে তেমনি পাইপ টেনে চলেছি। সশব্দে ব্রেক কষে একলাফে সে গাড়ি থেকে নেমে পড়ল। অবাক হয়ে, অঙ্গভঙ্গি সহকারে ধমকে বলে উঠল, 'হান্টার, এ আবার কী খেলা শুনি?'

চমৎকার ফে-র হাত! আর বিশেষ ঝোঁক তার হাতি আর সিংহ শিকারে। তার প্রিয় রাইফেল হল ৩৬০নং দুনলা রাইফেল, লণ্ডনের উইলিযাম ইভান্সের তৈরি। রাইফেলটা হাতি শিকারের পক্ষে একটু হালকা মনে হওয়ায় আমি তাকে ফাঁকা জায়গায় শিকার করতে নিয়ে যেতাম, যাতে যথেষ্ট দূর থেকে হাতিদের দেখা যেতে পারে। হালকা রাইফেলের গুলিতেও হাতিকে মারা যায লক্ষ্য যদি নির্ভুল হয়, এবং ফাঁকা জায়গায় লক্ষ্য স্থির করে হাতির কানের ফুটোয় গুলি করার মত সময় মেলে। কিন্তু ঘন জঙ্গলের মধ্যে হাতি যখন অতর্কিতে খুব কাছ থেকে আক্রমণ করে বসে, ব্যাপারটা তখন দাঁড়ায় অন্যরকম। তখন দরকার ভারি হাতিয়ারের, যাতে সামনে থেকে গুলি করে হাতির মগজ ফুটো করে দেওয়া যেতে পারে।

ফে-র ছিল অফুরন্ত প্রাণশক্তি। সারাদিন শিকার করার পরেও আবার সারা রাত খেলতে পারত। আমার কিন্তু তেমন ক্ষমতা ছিল না। সকাল থেকে ঝোপ জঙ্গল মাড়িয়ে একদিন সন্ধ্যায় তাঁবুতে ফিরেছি; তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়েছি খাওয়া দাওয়া সেরে। ফে-ও শুয়ে পড়েছে বটে, কিন্তু প্রাণচঞ্চল ফে-র পক্ষে এরই মধ্যে ঘুমোনো সম্ভব হল না। দু-জনে ছোট তাঁবুটায় রয়েছি, কারণ আমাদের লোকজন যারা বড় তাঁবুগুলো আর অন্যান্য মালপত্র নিয়ে গরুর গাড়ি করে আসছিল, তখনো তারা এসে পৌঁছয়নি। কয়েক মিনিট বিছানায় গড়াগড়ির পর ফে বলে উঠল, 'হান্টার, বড় একা-একা লাগছে, উঠে পড়ুন, আসুন গল্প করি।' আমি অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম, মেয়েটার

সঙ্গে সারারাত হৈ-হুল্লোড করার মত অবস্থা ছিল না, তাই এমন ভান করে রইলাম, যেন ঘুমিয়ে পড়েছি। আবার ফে আমায় ডাকল। তারপর শুনতে পেলাম ফে বিড়-বিড় করে বলছে, 'দিচ্ছি জাগিয়ে!' পরমুহূর্তেই সে গুলিভর্তি একটা থলি নিয়ে আমার মাথার একপাশে ঠুকে দিল আর চিৎকার করে বললে, 'কী মোষের মত ঘুমোচ্ছেন! উঠুন, গল্পগুজব করি!' বাধ্য হয়েই তখন আমায় উঠে পড়তে হল।

শিকারী হিসেবে না হলেও রাত জাগার সঙ্গী হিসেবে মনে হয় আমি ততটা দক্ষ নই, কারণ পরবর্তী সাফারির সময় ফে একটি সুদর্শন যুবককে সঙ্গে নিয়ে এল—নাইরোবিতে তার সঙ্গে ফে-র আলাপ হয়েছিল। ফে-র মত মেয়ে ওর মধ্যে কী দেখল কী জানি, কারণ বন্দুকের হাত তার মোটেই ভাল নয়। শুনলাম তার অন্য অনেক গুণ আছে, যার পরিচয় সেই মুহূর্তে আমি পাইনি। ব্যবস্থাটা কিন্তু হল চমৎকার, কারণ সারাটা দিন আমার সঙ্গে শিকার করার পর ফে সন্ধে থেকে বন্ধুর সঙ্গে কাটাতো। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ফে-র ইচ্ছে তার বন্ধুও তার সঙ্গে শিকারের উদ্দীপনায় অংশ গ্রহণ করুক। ভারি বন্দুক ছেলেটির পছন্দ নয়, ছুড়লে তার কাঁধে ধাক্কা লাগে,—তাই সে ফে-র ২৭৫ নং বন্দুকটা ব্যবহারের জন্যে নিল, আর ফে নিল তার বিশ্বস্ত ৩৬০ নম্বর। আমরা এখন যাচ্ছি সিংহ-শিকারে, সুতরাং এইসব হালকা রাইফেল ব্যবহার করা চলতে পারে, তবুও আমি নিলাম আমার ৪৭৫টা—যদি দৈবাৎ কোন হাতি বা গণ্ডারের দেখা মেলে।

বন্য জন্তুর পায়ে-চলা পথ ধরে লম্বা লম্বা ঘাসের মধ্যে দিয়ে আমরা চলেছি। হঠাৎ দেখা গেল একটা মোষ একা ঘাস খেয়ে চলেছে। আফ্রিকার মোষ অতি সাঙ্ঘাতিক প্রাণী। মাথা নিচু করে যখন সে তেড়ে আসে, শিকারীর পক্ষে তখন একমাত্র গুলি করার জায়গা তার দুই শিং দিয়ে আগলে রাখা পুরু কপাল। ভারি রাইফেলের গুলি ভিন্ন সে-আক্রমণ প্রতিহত করা অসম্ভব।

আমার ইচ্ছে ছিল মোষটাকে ছেড়ে এগিয়ে যাওয়া, ফে কিন্তু সে কথায় কর্ণপাত করল না। তার ইচ্ছে, তার বন্ধু যেন নাইরোবিতে ফিরে গিয়ে বলতে পারে সে মোষ শিকার করেছে। বললে তাকে ফিস-ফিস করে, 'মারো ওর কাঁধ লক্ষ্য করে, তাতে যদি না পড়ে তো তোমার হয়ে আমিই ওকে মেরে দেব।'

নার্ভাসভাবে ছেলেটি রাইফেল তুলে গুলি করতে গুলিটা খানিকটা উপরে গিয়ে লাগল আর সঙ্গে সঙ্গে মোষটা পাক খেয়েই প্রচণ্ডবেগে আমাদের তাড়া করে বসল। আর কিছুই দেখতে পেলাম না, চোখে পড়ল কেবল সরু পথটা

ধরে ধেয়ে-আসা একজোড়া শিং। অদ্ভুত শান্তভাবে ফে রাইফেল তুলে তার কপালে দুটো গুলি ছুড়ে দিল, কিন্তু তাতেও তার কিছুই হল না। যখন দেখল তবুও মোষটা তেমনি তেড়ে আসছে, রাইফেল ফেলে দিয়ে ফে তার বন্ধুকে জড়িয়ে ধরল।

সরু পথটা জুড়ে দু-জনে যেভাবে জড়াজড়ি করে রয়েছে তাতে ওদের সামনে গিয়ে গুলি করার উপায় নেই, এদিকে মোষটা প্রায় আমাদের উপরে এসে পড়েছে,—তার কালো বুকে সাদা সাদা ফেনা আর প্রকাণ্ড শিংদুটো দেখতে পাচ্ছি। এই দু-শো পাউণ্ড ওজনের মোষ আমাদের উপর পড়লে আমরা একেবারে পিষে যাব। শিংদুটো যখন আর মাত্র গজ দুই দূরে, কোনরকমে বন্দুকের মুখটা দু-জনের মাঝখান দিয়ে গলিয়ে দিয়ে গুলি করলাম। সশব্দে পড়ে গেল মোষটা, তার ফেনায় আর রক্তে ফে-র ট্রাউজার্স ভরে গেল। এত জোরে পড়ল মোষটা যে ফে আর তার বন্ধু হয়ত মনে করেছিল বুঝি মোষটা মেরেইছে তাদের। কয়েক মুহূর্ত পরে চোখ মেলে ফে দেখল, মোষটা তার পায়ের কাছে মরে পড়ে রয়েছে।

ফুর্তিতে চেঁচিয়ে উঠল ফে, 'জান জান, হাণ্টার মেরেছে মোষটাকে! দুঃখ কোরো না যে তুমি মারতে পারনি, চল এক্ষুনি তোমায় আর একটা মোষ দেখিয়ে দিচ্ছি।'

'অনেক ধন্যবাদ!' কাঁপা হাতে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বললে ছেলেটি, 'একটা কথা শুধু আমার জানবার আছে—এখান থেকে নাইরোবি ফিরতে কত সময় লাগবে?'

বেচারা ফে! জানি না কী তার হয়েছে শেষ পর্যন্ত। বন্দুকে তার লক্ষ্য ছিল অব্যর্থ, আর সঙ্গী হিসেবেও সে ছিল চমৎকার।

শিকারের ব্যাপারে যত দুর্ঘটনা ঘটে, আমার ধারণা তার অধিকাংশই ঘটত না যদি শিকারীরা ভারি বন্দুক ব্যবহারে অনিচ্ছুক না হত। আমি জানি এ আমার নিজস্ব ধারণা-বিশেষ, এবং এ নিয়ে প্রচুর তর্ক-বিতর্কও হয়েছে। আমি জানি মোষ বা গণ্ডারকে ঠিক জায়গায় গুলি করতে পারলে হালকা বন্দুকেও তাকে মারা সম্ভব, কিন্তু তার আক্রমণ প্রতিহত করতে হলে এমন গুলি একান্ত প্রয়োজন যা তাকে সঙ্গে সঙ্গে ফেলে দিতে পারে। মোক্ষম জায়গায় গুলি করার পরও কখনো কখনো দেখা গেছে, মরে গিয়েও সেই জন্তুর আক্রমণের বেগে শিকারীর উপর পড়ে তার মৃত্যুর কারণ হয়েছে।

দুঃখের বিষয় অধিকাংশ শিকারীই দেখা গেছে ভারি বন্দুকের ধাক্কা সহ্য করতে নারাজ। কয়েকবার অভ্যাসের পরেও দেখা যায়, ঘোড়া টিপবার সময় অনিচ্ছাসত্ত্বেও শিকারীর মুখে কুঞ্চন দেখা দিয়েছে এবং ফলে সে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে। অগত্যা তাই সে হালকা বন্দুক ব্যবহার করে,—এ কথা ভুলে যায় যে শিকারের উত্তেজনায় ধাক্কার কথা তখনকার মত মনে থাকে না।

মারণাস্ত্র নির্বাচনের সময় শিকারীকে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। সকলেই চায় নিজ-নিজ হাতিয়ার ব্যবহার করতে, অথচ আফ্রিকায় শিকারের উপযোগী বন্দুক অতি অল্প শিকারীরই থাকে। আর ভাড়া-করা ভারি বন্দুক নিয়ে শিকাব করলে আবার দেশে ফিরে তা দেখিয়ে বাহাদুরি করা যাবে না যে এই বন্দুক দিয়ে আমি অমুক বড় জন্তুটা বধ করেছি। অনেক শিকারী আবার পুরোনো দিনেব শিকারিদেব লেখা কাহিনী পড়ে জেনেছে যে তারা প্রায়ই খুব হালকা বন্দুক ব্যবহার করত। তখনকাব দিনে ব্যাপারটা ছিল অন্যরকম; জীবজন্তু ছিল অনেক শান্ত, তাদের বেছে বেছে শিকার করা সম্ভব ছিল। তাছাড়া শিকারও সহজেই মিলত, তার সন্ধানে গভীর ঝোপের মধ্যে প্রবেশ করার ঝুঁকিও নিতে হত না।

শিকারিদের হালকা অস্ত্রেব প্রতি পক্ষপাতিত্বের ফলে একটা অত্যন্ত কুৎসিত অভ্যাস শ্বেতাঙ্গ শিকারিদের মধ্যে চালু হয়। শিকারী গুলি করার সঙ্গে সঙ্গে যার সঙ্গে তিনি এসেছেন সেই শ্বেতাঙ্গ শিকারীও সেই একই লক্ষ্যে তার ভারি রাইফেল দিয়ে গুলি করে। শিকারীর গুলি লক্ষ্যভেদ করে, না লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় এ নিয়ে শ্বেতাঙ্গ শিকারীর কোন মাথাব্যথা নেই, কারণ শিকার মারা পড়ে ঠিকই এবং সে সম্মানের অধিকারী হন শ্বেতাঙ্গ শিকারীর নিয়োগকর্তা। আমি যেসব শিকারিদের শিকারে নিয়ে গিয়েছি, যেমন, ম্যাকমার্টিন দম্পতি, কম্যাণ্ডার গ্লেন কিডস্টন, বা মেজর ক্রস—এঁদের সঙ্গে ওরকম চালাকি করলে যে তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে আমায় নাইরোবিতে ফেরত পাঠিয়ে দিতেন, তাতে সন্দেহের অবকাশমাত্র নেই। অবশ্য আজকালকার শ্বেতাঙ্গ শিকারীর মনোভাবও যে আমি বুঝি না তা নয়। জঙ্গলের একটা নিয়ম হল কোন প্রাণী আহত হলে তাকে না মেরে ফিরবে না; সুতরাং যদি অপটু শিকারী কোন শিকারকে আহত করে, আহত প্রাণী স্বভাবতই কোন ঘন ঝোপের আড়ালে আত্মগোপন করবে, এবং শ্বেতাঙ্গ শিকারিকেই তখন তার পিছু নিয়ে ঝোপের মধ্যে প্রবেশ করতে হবে, কারণ প্রথমত, মক্কেলের পক্ষে অতটা ঝুঁকি নেওয়া সম্ভব হবে না,

আর দ্বিতীয়ত, শ্বেতাঙ্গ শিকারীর পক্ষে এ কাজ অনেক সহজেই সমাধা করা সম্ভব হবে।

মনে পড়ে একবার এক ইউরোপীয় রাজপুত্র ও রাজকন্যাকে শিকারে নিয়ে গিয়েছিলাম কেনিয়ার অন্তর্গত ভই অঞ্চলের কাসিগাউএর নিকটবর্তী স্থানে। একটা পুরুষ মোষকে আমাদের দিকে আসতে দেখে আমরা শুয়ে পড়লাম, যাতে ও আমাদের দেখতে না পেয়ে আরো কাছে এগিয়ে আসে। মোষটা ক্রমে আমাদের পঞ্চাশ গজের মধ্যে এসে পড়ল। রাজকুমারীর হাতে ছিল একটা ছোট সরু নলের বন্দুক। তাঁর ইচ্ছে হল কারুর সাহায্য না নিয়েই তিনি মোষটাকে মারবেন। তাঁর গুলি মোষটার বুকে গিয়ে বিঁধল। বন্দুকটা ভারি বা মাঝারি ওজনের হলেও এ আঘাত মারাত্মক হতে পারত, কিন্তু এক্ষেত্রে আহত মোষটা একটা ঘন ঝোপের আড়ালে গিয়ে আত্মগোপন করল।

পায়ের দাগ লক্ষ্য করে যেতে যেতে ছোট-ছোট রক্তের বিন্দু চোখে পড়ল। শিকারীর একটা কাজ হল রক্ত পরীক্ষা করে আঘাতের পরিমাণ আন্দাজ করা। ফুসফুসের রক্তের রঙ হালকা, তা থেকে বুঝতে হবে শিকারের পেছনে অনেক সময় দিতে হবে। মূত্রাশয়ের রক্ত হয় খুব গাঢ় রঙের, তা থেকে বুঝতে হবে আঘাতটা মারাত্মক হয়েছে। আর গায়ের রক্ত হয় মাঝামাঝি রঙের, তা থেকে বুঝতে হবে যে গুলি বিশেষ ভিতরে প্রবেশ করে নি। এক্ষেত্রে এই শেষোক্ত ধরনের রক্ত দেখা গেছে,—অর্থাৎ মোষটা সুস্থ শরীরে আছে, দমেরও অভাব ঘটে নি; নিজের পছন্দমত জায়গায় লুকিয়ে সে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হয়ে থাকবে— তাকে মারা সহজ কাজ হবে না।

রাজকুমারীর তবু জেদ, তাঁর ঐ বন্দুক নিয়েই মোষটার পিছু নেবেন। আমি আপত্তি করায় তাঁর রাজরক্ত টগবগ করে উঠল, বেশ করে আমায় দু-কথা শুনিয়ে দিলেন। এইসব মানুষ জীবনে কখনো কারো কাছে কোন বাধা পায় নি, এদের সামলে কাজ করা কঠিন। তবুও আমি তাঁর এই আত্মহত্যার প্রচেষ্টায় বাধা দিলাম। রাজপুত্রের কাণ্ডজ্ঞানের অভাব ছিল না, শেষ পর্যন্ত তিনি মাঝখানে পড়ে রাজকুমারীকে নিরস্ত করলেন আর আমায় পাঠালেন মোষটাকে মেরে ফেলার জন্যে।

ওয়ালিঙ্গুলু পথপ্রদর্শককে নিয়ে আমি জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করলাম। আমার মনে হয় কেনিয়ার পথপ্রদর্শকদের মধ্যে ওয়ালিঙ্গুলুরাই সবচেয়ে ওস্তাদ, আর এই লোকটার উপর আমার প্রচুর আস্থা ছিল। পায়ের নিচে বেলেমাটি,

ঝোপের ভিতর দিয়ে তাই নিঃশব্দে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হল। নীরব নিস্তব্ধ. চারিদিক,—তার মানে এই বুঝতে হবে যে মোষটা কোন ঝোপের আড়ালে আমাদের প্রতীক্ষায় লুকিয়ে রয়েছে। এভাবে চিন্তা করলে অনেকটা সতর্ক হয়ে চলা সম্ভব হয়।

ক্রমে যেখানে এসে পৌছলাম, রক্তের দাগ সেখানে অনেক বেশি। নিশ্চয় মোষটা এখানে এসে কয়েক মিনিট থেমেছিল,—রাজকুমারী যখন চিৎকার করে আমার সঙ্গে কথা কইছিলেন, এখানে দাঁড়িয়ে সে তা শুনেছিল, এবং যখন আমাদের তর্ক বন্ধ হল আর আমরা তার পিছু পিছু অগ্রসর হলাম, সে তখন এগিয়ে চলেছিল।

হঠাৎ মোষটার গায়ের তীব্র গন্ধ আমরা পেলাম। থেমে দাঁড়ালাম দু-জনে। নিশ্চয় মোষটা কয়েক গজের মধ্যেই কোথাও রয়েছে। ওয়ালিঙ্গুলুটাও নাক খাড়া করে দাঁড়ালো খানিকক্ষণ, তারপর সে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল ঝোপের দিকটা। কিন্তু কিছুই আমার চোখে পড়ল না। মোষটা এখনো একটুখানি দূরে আছে এই মনে করে আমি আমার সঙ্গীকে ইঙ্গিত করলাম মোষটা যেদিকে আছে সেদিক লক্ষ্য করে ঢিল ছুড়তে। একটা পাথর তুলে নিয়ে সামনের ঝোপে ছুড়ে দিতেই সেটা ঠং করে মোষটার শিঙে গিয়ে লাগল। এবার তাকে পুরো দেখা গেল, তার কালো চামড়া গাছের ছায়ার সঙ্গে একেবারে মিশে গিয়েছিল বলেই এতক্ষণ সে আমার চোখে পড়েনি।

সঙ্গে সঙ্গে মোষটা আমাদের তেড়ে এল। লক্ষ্য স্থির করারও সময় মিলল না, ৫০০নং দোনলা এক্সপ্রেস রাইফেলটাকে শট-গানের মত করে তুলেই গুলি করলাম, গুলিটা লাগল তার বাঁ চোখের নিচে। তেমনি ছুটতে ছুটতেই মরে গেল মোষটা। রাইফেলটা যদি যথেষ্ট ভারি না হত তাহলে মোষটা নিশ্চয়ই পড়ে যাবার আগে আমাদের দু-জনকে শেষ করে ফেলত।

শিকারীর নির্দেশে যত বিপজ্জনক কাজ আমায় করতে হয়েছে তার মধ্যে বোধহয় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল একটা আহত বরাহের পিছু নিয়ে গুঁড়ি মেরে তার গর্তে প্রবেশ করা। আমি তখন আর্ল অব্ কার্নাভনকে শিকারে নিয়ে এসেছি। একটা বরাহ তাঁর গুলিতে আহত হয় এবং একটা গর্তের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। গর্তে প্রবেশ করার সময় বরাহ সর্বদাই তার শরীরের পেছনদিকটা আগে গর্তের ভিতরে প্রবিষ্ট করিয়ে দেয়, তার দাঁতাল মাথাটা থাকে গর্তের মুখের দিকে, পাছে কোন শত্রু অতর্কিতে আক্রমণ করে বসে। আর্লের কিন্তু

বরাহটা না পেলেই নয়। আমি তো ভেবেই পেলাম না কী করে তার পিছু নেওয়া সম্ভব। গর্ত খোঁড়বার যন্ত্রপাতি কিছু নেই, আর ধোঁয়া দিয়েও যে ওকে বের করে আনব তাও সম্ভব নয়।

কুলিদের যখন জিজ্ঞাসা করলাম তারা কেউ বরাহটার পিছু-পিছু গর্তে নেমে যেতে রাজি কি না, তারা বললে তারা মুসলমান, শুয়োর ছোঁয়া তাদের ধর্মে বারণ তাই, নতুবা খুব খুশি মনেই তাবা এ হুকুম পালন করত। অগত্যা নিজেকেই তাই করতে হল। কোটটা খুলে ফেললাম, আর আমি পা ছুড়লেই আমায় পা ধরে টেনে তুলে আনবে—কুলিদের এই নির্দেশ দিয়ে আমি সেই গর্ত দিয়ে নেমে গেলাম।

একেই গর্তটা আমার কোমরের পরিধির পক্ষে বিশেষ বড় নয়, তার উপর আবার ববাহটার দুর্গন্ধে আমার দম আটকে আসছে। প্রবেশ-পথটা আমার শরীবের আড়ালে পড়ে একেবারে অন্ধকার। সেই অন্ধকারের মধ্যে ডান হাত বাড়িযে হাঁচা করতে করতে এক সময় বরাহের দাঁতটা আমার হাতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে আমি ধরে ফেললাম সেটা। বরাহটা চেষ্টা করল গর্তের মাথার সঙ্গে আমার হাতটা পিষে দিতে, কিন্তু আমি কিছুতেই ছাড়লাম না, আর সেইসঙ্গে প্রাণপণে পা ছুড়তে লাগলাম। বাতাসের অভাবে আর তীব্র দুর্গন্ধে আমার প্রায জ্ঞান হারাবার উপক্রম হল। কুলিরা আমায় টেনে তুলল, আর আমি টেনে তুললাম দুর্গন্ধ বরাহটাকে।

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মুখটা মুছে ফেলতে আর্ল বললেন, 'চমৎকার, চমৎকার, হাণ্টার! কী জান, বরাহটা যে আমি ঠিক স্মারক হিসেবে চাই তা নয়. আমি চাই ওর চামড়াটা,—ওটা দিয়ে আমি আমার গাড়ির সীট তৈরি করব। ভাল কথা, গর্ত থেকে ওটাকে টেনে আনবার সময় ওর চামড়াটা নষ্ট হয়নি তো?'

আমি কেবল এইটুকুই আশা করতে পারি যে আর্ল নিশ্চয় ওর চামড়ার সীটে বসে প্রচুর আরাম পেয়ে আমার এই পরিশ্রম সার্থক করেছেন।

॥ ৬ ॥ মাসাইদের দেশে সিংহ-শিকার

১৯২৫ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি এক সময়ে একদিন কেনিয়া শিকার-বিভাগের অধিকর্তা ক্যাপ্টেন এ. টি. এ. রিচি, ও. বি. ই., এম্. সি-র দপ্তরে আমার ডাক

পড়ল। এমন একটা লোভনীয় প্রস্তাব ক্যাপ্টেন আমার কাছে করলেন, কোন শিকারীর কাছে তেমন প্রস্তাব আর কখনো করা হয়েছে কি না সন্দেহ।

ওঁর এই প্রস্তাব ভাল করে বুঝতে হলে কলোনির ঐ অঞ্চলের তৎকালীন অস্বাভাবিক অবস্থাটা উপলব্ধি করা প্রয়োজন।

কেনিয়ার মাঝামাঝি অঞ্চলে এক বিস্তীর্ণ অধিত্যকা আছে, এক লড়ায়ে জাতের সেখানে বাস—তারা হল মাসাই। তীর ধনুককে তারা কাপুরুষের হাতিয়ার বলে ঘৃণার চক্ষে দেখে,—বলে, শত্রুর সম্মুখীন হতে যারা ভয় পায় তাদেরই জন্যে ঐ অস্ত্র। মাসাইদের তরুণ যোদ্ধাদের, যাদের ওরা বলে মোরান, প্রধান খাদ্য তাজা রক্ত আর দুধ, কারণ তাদের ধারণা, যোদ্ধাদের খাদ্য ও ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না। আশেপাশের জাতিরা ওদের ভয়ে আতঙ্কিত থাকত, কারণ মাসাইদের সঙ্গে লড়বার যোগ্যতা তাদের কারুর ছিল না। ওদের খেলা হল বল্লম দিয়ে সিংহ শিকার করা,—ব্যাপারটা না দেখলে একরকম অসম্ভব বলেই মনে করা স্বাভাবিক। আততায়ী পশু যেমন দুর্বল প্রতিবেশীর উপর অত্যাচার করে, এই মাসাইরাও তেমনি পুরাকালে একান্তভাবে অন্যান্য জাতিদের উপর ভর করেই জীবন ধারণ করত।

একটা আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, শিকারী প্রাণীদের—যথা বাজপাখির বা বুনো কুকুরের কোন শত্রু না থাকার ফলে যে তাদের বিশেষ সংখ্যাবৃদ্ধি হয় তা কিন্তু নয়, কারণ জীবন ধারণের জন্যে এতই তাদের পরিশ্রম করতে হয় যে বেশিদিন বাঁচে না তারা। তা ছাড়াও, যতই তাদের শক্তি বা তেজ থাকুক না কেন, আসলে অদ্ভুত নরম তাদের শরীর,—এমনকি যে প্রাণীকে তারা শিকার করে তার দেহও তাদের চেয়ে শক্ত। এ কথা মানুষের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ব্রিটিশ গভর্মেন্ট যখন উপজাতিতে উপজাতিতে সঙ্ঘর্ষ বন্ধ করে দিলেন, মাসাইদের আশেপাশের উপজাতিদের তখন এতই সংখ্যাবৃদ্ধি হল যে তারা এক বিশেষ সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো। আর এদিকে মাসাইদের জীবনধারা আমূল পরিবর্তিত হওয়ার ফলে তাদের প্রায় নিঃশেষিত হবার মত অবস্থা। জীবন-ধারণের জন্যে বাধ্য হয়েই তখন তাদের বেশি করে গো-মহিষাদি পালন করতে হয়। এদিকে সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে এক সাঙ্ঘাতিক মড়ক সমস্ত জেলার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। হাজারে হাজারে গরু মোষ মারা পড়ে, থেকে যায় মাত্র স্বল্পসংখ্যক কয়েকটি, তাদের পরিচয় বহন করবার জন্যে।

সঙ্গে সঙ্গে সিংহের পাল মুর্দাফরাসের দায়িত্ব গ্রহণ করল। মরা গরু বাছুর

খেয়ে খেয়ে সিংহের সংখ্যা অসম্ভব বৃদ্ধি পেল। যেসব রুগ্ন সিংহশাবকের সাধারণ অবস্থায় অকালমৃত্যু হত, তারা পর্যন্ত পূর্ণাবয়ব হয়ে উঠল। অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত মাসাইয়ের দেশটা সিংহে সিংহে ছেয়ে গেল। মড়ক কেটে যাবার পর যখন আর পথে ঘাটে মরা গরু মোষ মিলল না, সিংহেরা তখন জ্যান্ত গরু বা মোষের দিকে মন দিল। মাসাইরা ঢাল বল্লম নিয়ে তাদের অবশিষ্ট গরু মোষদের বাচানোর জন্যে তৈরি হল। কিন্তু একটা সিংহ মরে তো একজন কি দু জন যোদ্ধা আহত হয়, আর সিংহের কবলে আহত প্রাণী প্রায়ই দেখা যায় রক্ত বিষিয়ে গিয়ে মারা পড়েছে, কারণ সিংহ যেসব প্রাণী শিকার করে, সিংহের নখে তাদের মাংসের টুকরো জমে পচে থাকে। এর ফলে সামান্য আঁচড়ের ক্ষতেও মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। এভাবে সেরা সেরা যোদ্ধাদের হারিয়ে মাতব্বররা মহা দুশ্চিন্তায় পড়ল। আগেকার দিন হলে মাসাইরা অন্য উপজাতির সঙ্গে লড়াই করে তাদের স্ত্রীলোক আর গরু মোষ হরণ করে খানিকটা পুষিয়ে নিত, কিন্তু এখন আর গভর্মেণ্টের কাছে সাহায্য ভিক্ষা ছাড়া অন্য গতি নেই।

মাসাই রিজার্ভের জেলা কমিশনার ছিলেন আর পেলথর্প নামক এক অল্পবয়স্ক ভদ্রলোক। একটা ম্যাগাজিন রাইফেল নিয়ে তিনি সিংহের সংখ্যা কমাতে বেরিয়ে পড়লেন। আমার মতে, ঘন জঙ্গলের মধ্যে সম্মুখ সংগ্রামের পক্ষে ম্যাগাজিন রাইফেল ঠিক আদর্শ অস্ত্র নয়, কারণ একবার গুলি করবার পর আবার গুলি ভরতে সময় লাগে প্রায় দু-সেকেণ্ড, এবং এই সময়টুকুই মারাত্মক হওয়া সম্ভব। যদিও লুকোনো জায়গা থেকে বা ফাঁকা জায়গায় আমি অনেক সময় ম্যাগাজিন রাইফেল ব্যবহার করে থাকি, ঝোপে ঝাড়ে কিন্তু দোনলা বন্দুকই ব্যবহার করতে অভ্যস্ত। দোনলায় দুটো গুলি ছোড়া যায় এবং দরকার হলে প্রায় একই সঙ্গে দুটো ছোড়া সম্ভব প্রথমটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হলে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দ্বিতীয়টা ছোড়া যেতে পারে। জন্তু যখন আক্রমণ করে আসে তখনই এ অস্ত্র বিশেষ করে উপযোগী।

সিংহ সাধারণত ঘন ঝোপের মধ্যে বাস করে, তাই সিংহ উচ্ছেদ করতে হলে দরকার ঘন ঝোপের মধ্যে প্রবেশ করা। মিঃ পেলথর্প এ পর্যন্ত কেবল শখের খাতিরেই সিংহ মেরে এসেছেন, তাও ফাঁকা জায়গায়। এবার তিনি জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করে একটা সিংহীকে লক্ষ্য করে গুলি করলেন। কিন্তু বন্দুকে আর-একটা গুলি ভরে নেবার আগেই আহত সিংহী তাঁকে আক্রমণ

করে বসল, ছিটকে ফেলে দিয়ে তাঁকে ধরে ফেলল। ঠিক এই সময়ে একজন স্থানীয় পুলিশ সিংহীটাকে গুলি করে তাঁকে নির্ঘাত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করে। কিন্তু এইটুকুতেও মিঃ পেলথর্প অত্যন্ত আহত হন। তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়।

ক্যাপ্টেন রিচি বললেন, 'পেলথর্পের অভিজ্ঞতার পর আর আমার মনে হয় না সাধারণ শিকারীর হাতে এ ব্যাপার ছেড়ে দেওয়া উচিত। অভিজ্ঞ শিকারীর কাজ এ। অনেক আলোচনার পর শিকার বিভাগ তোমাকেই এ কাজের উপযুক্ত বলে বিবেচনা করেছে। সিংহের সংখ্যা অত্যন্ত বেড়ে গেছে, তিন মাসের মধ্যে ওদের অনেকটা কমিয়ে ফেলতে হবে। মাইনে হিসেবে ওদের চামড়াগুলো তোমার।'

কালো কেশরী সব-সেরা সিংহের চামড়া তখন বিক্রি হচ্ছিল এক-একটা কুড়ি পাউণ্ড করে, আর সিংহীর চামড়া তিন পাউণ্ড করে। বিপদ প্রচুর, সন্দেহ নেই, কিন্তু এতে করে সংসারেও টাকা আসবে প্রচুর। ইতিমধ্যে আমাদের চারটি সন্তান হয়েছে, আশ্চর্য,—ছেলেপুলে মানুষ করতে যে এত খরচ পড়ে, তাও কেনিয়ার মত জায়গায়, এ আমার ধারণার বাইরে ছিল।

সন্ধ্যাবেলা হিলডার কাছে কথাটা পাড়লাম। ঝোপ অঞ্চলে দশটা, এমনকি কুড়িটা পর্যন্ত সিংহ মারা কোন অভিজ্ঞ শিকারীর পক্ষে খুব একটা বিপদের ব্যাপার নয়; কিন্তু নির্দিষ্ট অল্প সময়ের মধ্যে একশোটা সিংহ বধ করতে গেলে কোন-না-কোন সময়ে মারাত্মকভাবে আহত হবার সম্ভাবনা। তীক্ষ্ণবুদ্ধি হিলডার মাথায় একটা চমৎকার মতলব এল। বললে সে, 'ন্সরোঙ্গরোয় সিংহ-শিকারের সময় ক্যাপ্টেন হার্স্টের কুকুরের পালের কথা মনে আছে? তারা তো তোমার খুব কাজে এসেছিল। এ ব্যাপারেও কুকুরের সাহায্য নিয়ে দেখতে পার।'

মতলবটা চমৎকার সন্দেহ নেই। কিন্তু ক্যাপ্টেন হার্স্টের কুকুরগুলো তো তাঁর ভাই বিক্রি করে দিয়েছেন, জানি না কোথায় অমন আর-এক পাল কুকুর মিলবে। ভাল কুকুরের সন্ধানে অনেক বৃথা অনুসন্ধানের পর শেষ পর্যন্ত গেলাম নাইরোবির কুকুরের ঘাঁটিতে। বিভিন্ন জাতের বাইশটা কুকুর, অকর্মণ্যের দল, মৃত্যুর প্রতীক্ষায় দিন গুনছে। বিভিন্ন আকৃতির, বিভিন্ন চেহারার আর বিভিন্ন জাতের কুকুরগুলো। আমার হাতে পড়লে তবু হয়ত তাদের বেঁচে যাওয়া সম্ভব হবে, এই ভেবে প্রতিটি দশ শিলিং হিসেবে সমস্ত

কুকুরগুলো কিনে নিলাম। সিংহ-শিকারের কুকুর দেখে হিলডারের মুখটা ছোট হয়ে গেল—তার উপর আবার দেখা গেল, বাড়ির কুকুরের যেটুকু শিক্ষা থাকে সেটুকুও তাদের নেই। সারা দিন ঘেউ-ঘেউ করছে, আর সারা রাত বিকট চিৎকার করে চলেছে; সব সময়ে কামড়াকামড়ি লড়ালড়ি চলছে। যাই হোক, সপ্তাহখানেকের মধ্যেই আমি ওদের মধ্যে মোটামুটি একটা শৃঙ্খলা এনে ফেললাম, মনে হল এবার মাসাই রিজার্ভে যাওয়া যেতে পারে।

গভর্মেন্ট থেকে বনের বিভিন্ন অঞ্চলে টোপ বয়ে নিয়ে যাবার জন্যে ছ-টা বলদ দেওয়া হল। এই মন্থরগতি জানোয়ারদের নিয়ে আর কয়েকজন স্থানীয় কুলি আর আমার কুকুরের পাল সঙ্গে করে আমি বেরিয়ে পড়লাম।

প্রধান রাজপথ ধরে গেলাম কন্‌জা পর্যন্ত, নাইরোবি থেকে মাইল কুড়ি দক্ষিণ পূবে এ জায়গা। তারপর গেলাম পশ্চিম মুখে। এক দিন চলার পর বন হালকা হয়ে এল, আমরা সমতল অঞ্চলে এসে পৌঁছলাম। কিকুয়ুদের চালাঘরের সংখ্যা ক্রমেই কমে আসছে। এই কিকুয়ুরা চাষবাস করে জীবিকা-নির্বাহ করত, অনেক কাল ধরেই মাসাইরা এদের উপর অত্যাচার করেছে, লুটপাট করেছে। চাষজমি সব পেছনে পড়ে রইল, সামনে এখন কেবল ঘাসে ছাওয়া বিস্তীর্ণ প্রান্তর, এখানে ওখানে প্রচুর শিকার ছড়ানো। চারণভূমি হিসেবে আদর্শ এ অঞ্চল। কোন আবহমান কাল থেকে এখানে জেব্রা আর অন্যান্য বন্য জন্তুর পাশাপাশি মাসাইদের গরু মোষ চরে এসেছে। এখানকার বাতাস নির্মল, স্নিগ্ধ; নিশ্বাস নিয়ে আনন্দ। কোথাও একটা বাড়ি বা একটা রাস্তা পর্যন্ত এই বিস্তারের বাধা সৃষ্টি করছে না। চলেছি তো চলেছি, রিজার্ভের বন্য অঞ্চলের মধ্যে ক্রমেই এগিয়ে চলেছি। হিলডার জন্যে না হলে নাইরোবিতে ফেরার ব্যাপারে আমার কোন ভাবনাই থাকত না, কারণ এ-ই হল আফ্রিকা ঈশ্বর যেমনটি সৃষ্টি করেছিলেন ঠিক তেমনি; শ্বেতাঙ্গ মানুষ এসে গ্রাম আর গোলাবাড়ি তৈরি করে এর সৌন্দর্য নষ্ট করার আগেকার অবস্থা। রাত কাটাতাম যেখানে থামতে হত সেখানেই, আর পাহাড়ের বুকে সূর্য উঠতেই আবার বেরিয়ে পড়তাম।—পথের নির্দেশ কিছু নেই; আপন খেয়াল খুশি মত চলতাম।

একদিন সন্ধ্যায়, তখন আমরা রিজার্ভের মধ্যে অনেক দূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছি, হঠাৎ তাঁবুর চারিদিকে সিংহের ডাক শোনা গেল। গভীর টান্না টানা আওয়াজে বুঝলাম, পুরুষ সিংহ সেগুলো। পরদিন ভোরে আমি প্রথম

মাসাইয়ের দেখা পেলাম। দু-জন বীর জোয়ান, সিংহ-শিকারে বেরিয়ে তারা আমার তাঁবু দেখতে পেয়ে এসেছে। সম্পূর্ণ সপ্রতিভভাবে তারা তাঁবুর কাছে এগিয়ে এসে বল্লমে ভর করে দাঁড়িয়ে আমায় লক্ষ্য করতে লাগল। এতদিন যেসব আদিবাসিদের দেখেছি এরা তাদের থেকে আলাদা,—লম্বা, রোগা চেহারা, অত্যন্ত কোমল ও কমনীয় মুখভাব—শ্বেতাঙ্গদের চেয়ে সুন্দর দেখতে। একটা মতবাদ আছে যে, মাসাইরা হল পুরাকালের মিশরীয়দের উত্তরপুরুষ; সুদূর অতীতে কোন এক কারণে তারা দলে দলে দক্ষিণ অভিমুখে চলে আসতে বাধ্য হয়েছিল। এই তরুণ শিকারিদের মুখ লাল রঙ দিয়ে চিত্রবিচিত্র করা, হাড় গুঁড়ো করে যে খড়ি তৈরি হয় সেই খড়ি দিয়ে সেই ছবির আউটলাইন আঁকা। একটুকরো কাপড় মাত্র তাদের পরনে,- একটা কম্বল কোনরকমে শরীরে জড়িয়ে কাঁধের কাছে গেরো দিয়ে বাঁধা।

ওদের যখন বললাম আমি সিংহ-শিকারে এসেছি, মনে হল এটা তাদের কাছে মজার কথা বলে মনে হয়েছে। তারা বললে যে কেবলমাত্র বন্দুক নিয়ে সিংহ-শিকারে গেলে আমি বিপদে পড়ব,—সিংহ-শিকারের উপযুক্ত অস্ত্র হল বল্লম। বন্দুককে তারা ঘৃণার চক্ষে দেখে,—প্রাচীনকালে একবার তারা একদল আরব দাস-ব্যবসায়ীদের সহজেই হারিয়ে দিয়েছিল, সেই থেকে তাদের এই মনোভাব। এই আরবদের হাতে ছিল আদিম যুগের গাদা বন্দুক।

আমাকে পরীক্ষা করার জন্যেই বোধহয়, ওদের একজন বললে দুটো সিংহের খবর সে জানে, তাঁবু থেকে বেশি দূরে নয় সে জায়গা। সঙ্গে সঙ্গে ওর সঙ্গী এ কথায় সায় দিল, বললে চমৎকার সিংহদুটো, খুব খুশি হবে সে যদি আমি তাদের সঙ্গে যাই। এরকম ছিদ্রান্বেষী দর্শকের সামনে প্রথম সিংহ-শিকারে যাওয়া আমার ইচ্ছে ছিল না। আমার কুকুরগুলো শিক্ষিত নয়, তাছাড়া সিংহদুটো যেখানে আছে সেটা ঝোপ, না, ফাঁকা জায়গা না কি, তাও আমার জানা নেই। কিন্তু যেরকম তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ওরা আমার দিকে তাকাচ্ছিল তাতে আমি বাধ্য হয়েই ওদের সঙ্গে যেতে রাজি হলাম। ওদের পথ দেখাতে বলে কুলিকে বললাম কুকুরগুলোকে খুলে দিতে।

মাসাইদের অনুসরণ করে একটা শুকনো নালার বুকে এসে হাজির হলাম,— বর্ষায় এখানে প্রবল বেগে জলস্রোত বয়ে চলে। পায়ের নিচে বালি, সেই বালিতে মাসাইরা সহজেই সিংহের পায়ের ছাপ অনুসরণ করে অগ্রসর হল। কুকুরগুলোও এগিয়ে চলল, সন্দিগ্ধভাবে এই অজানা গন্ধ পরীক্ষা করতে করতে।

আঁকাবাঁকাভাবে চলতে চলতে একবার একটা মোড় ফিরতেই দেখলাম দুটো সিংহ বালির উপর লম্বা হয়ে শুয়ে আছে মস্ত বড় দুটো বেড়ালের মত। আমাদের দেখে তারা উঠে দাঁড়িয়ে কটমট করে তাকাতে লাগল। যাকে তারা এতক্ষণ ধরে অনুসন্ধান করে এসেছে তাদের দিকে একবার তাকিয়েই প্রায় সমস্ত কুকুরগুলো আতঙ্কে চিৎকার করতে করতে পালিয়ে গেল। সিংহ তারা কখনো দেখেনি, কল্পনাও করতে পারেনি যে এমন কোন জন্তুরও অস্তিত্ব সম্ভব। কিন্তু যে চারটে এয়ারডেল কুকুর ছিল, বীরের মত রয়ে গেল তারা।

মাসাইদের বা আমার আর তখন কুকুরদের কথা ভাববার সময় নেই। মাসাই দু-জন বল্লম উঁচিয়ে আক্রমণের প্রতীক্ষায় রইল,—অপূর্ব সে দৃশ্য! তাড়াতাড়ি বড় সিংহটার বুক লক্ষ্য করে গুলি করলাম। গুলির ধাক্কায় পেছিয়ে গেল সিংহটা, তারপর একটা বিরক্তিকর শব্দ করে সশব্দে একপাশে হেলে পড়ল আর তার সঙ্গী বেগে নালার বাঁ দিকে ঘন জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে এয়ারডেল কুকুরগুলো ঝাঁপিয়ে পড়ে মরা সিংহটাকে কামড়াতে শুরু করল। মনের সাধে তারা সিংহটার কেশর ধরে টানাটানি শুরু করল, আমি কোন বাধা দিলাম না এবং তারপর যখন পালের বাকি কুকুরগুলোও ভয়ে ভয়ে ফিরে এল তাদেরও আমি এ ব্যাপারে উৎসাহিত করলাম। আর দুটো কুকুর ছিল যাদের মধ্যে খানিকটা সাহসের পরিচয় মিলল,—আমার আশা হল হয়ত এই ছ-টা কুকুরকে সিংহ-শিকারের উপযুক্ত করে তুলতে পারব।

মরা সিংহটার উপর কুকুরগুলোর আক্রোশ মিটলে আমি তাদের নিয়ে গেলাম সেই ঝোপটার দিকে দ্বিতীয় সিংহটা যেখানে আত্মগোপন করে ছিল। কাছে হতেই সিংহটা নিচু চাপা গর্জন করে সাবধান করে দিল। সঙ্গে সঙ্গে এয়ারডেল আর কলি কুকুরগুলো ক্রুদ্ধ গর্জন করতে করতে ঝোপটার দিকে তেড়ে গেল আর বাকি কুকুরগুলো ঝোপটা চক্রাকারে ঘিরে চেঁচামেচি শুরু করল, কিন্তু অগ্রসর হতে সাহস করল না। একজন মাসাই একটা ঢিল ছুড়তেই সিংহটা খানিকটা তেড়ে এল; এমন ভাব দেখালো যেন একটা এয়ারডেলকে আক্রমণ করে বসবে, আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তার জায়গায় ফিরে গেল, আমি গুলি করার সুযোগ পাবার আগেই।

ইতিমধ্যে কুকুরগুলোর সাহস ক্রমেই বেড়ে চলেছে। ঝোপের উপরদিককার ডালপালার নড়াচড়া থেকে সিংহের সঠিক অবস্থিতিটা বুঝতে পারছি। কুকুরদের মধ্যে যারা বেশি দুঃসাহসী তারা খানিকটা ঝোপের ভিতর গুঁড়ি মেরে

ঢুকে খুব চিৎকার করতে করতে সিংহকে বের করে আনার চেষ্টা করল। বুঝলাম কিছুক্ষণের মধ্যেই সিংহ বেরিয়ে আসবে; তাই আক্রমণের জন্যে তৈরি হয়ে রইলাম।

হঠাৎ ঝোপঝাড়গুলো ভয়ানক দুলে উঠল আর সঙ্গে সঙ্গে অসম্ভব বেগে সিংহটা আমার দিকে ধেয়ে এল। তার দু-কান পেছন দিকে লেপটে রয়েছে, পিঠটা বেঁকে গেছে,—একটা গোলাকার সজীব পদার্থ যেন আমার দিকে ছুটে এল। বালির উপর দিয়ে যেন উড়ে এল সে। একটা সাহসী এয়ারডেল একেবারে সামনাসামনি ওর দিকে এগিয়ে গেল, চেষ্টা করল অতিকায় সিংহটার গলা কামড়ে ধরতে। সিংহ তাকে ছিটকে ফেলে দিল, শিশু যেমন অবলীলাক্রমে তার খেলনা ছিটকে ফেলে দেয়। গতিবেগ একটুও না কমিয়ে সে আমার দিকে ধাবিত হল,—আর যেসব কুকুর তাকে বিরক্ত করছিল, গ্রাহ্যই করল না তাদের।

দশ গজের মধ্যে এসে পড়তেই আমি গুলি করলাম। ঠিক দু-চোখের মাঝখানে গুলিটা গিয়ে বিঁধল এবং একটুও না নড়ে সঙ্গে সঙ্গে পড়ে গেল সিংহটা। ছোট্ট গুলির গর্ত থেকে ধোঁয়া বেরিয়ে সকালের স্নিগ্ধ বাতাসে পাক খেতে খেতে উঠে গেল।

ফূর্তির চোটে মাসাইদের যুদ্ধের নাচ শুরু হয়ে গেল। একে লড়াইতে উত্তেজনা, তার উপর অমন দুটো সিংহের মৃতদেহ—নিজেদের সামলে রাখাই তাদের দায় হয়ে উঠল। বল্লম বাগিয়ে তারা পাছা পেছন দিকে করে সামনে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে রইল, আর তারপরেই হঠাৎ সিধে হয়ে তক্ষুনি আবার তেমনি সামনে ঝুঁকে পড়ল। উত্তেজনা যতই বৃদ্ধি পেল ওদের এই অদ্ভুত অঙ্গচালনার গতিও ততই বৃদ্ধি পেল,—শেষ পর্যন্ত ওরা এমন করতে লাগল যেন ঠিক পিস্টন চলেছে। এ এক আশ্চর্য ধরনের আবেগপ্রবণতা; মাসাইদের মধ্যে এক অতি সাধারণ ঘটনা এ। যেসব শ্বেতাঙ্গরা ওদের সঙ্গে বাস করে তারা একে বলে, 'কাঁপুনি'। এ ধরনের কোন ব্যাপার আমি ইতিপূর্বে কখনো দেখিনি; তাই বুঝতে পারি না, যে মানুষ পরম শান্তভাবে কেবলমাত্র বল্লমের সাহায্যে ক্ষিপ্ত সিংহের আক্রমণ প্রতিহত করে, যেমন করে তার পক্ষে অমন মৃগীরোগগ্রস্তের মত আচরণ করা সম্ভব।

সিংহ-শিকারের আনন্দ আমার অনেকটা খর্ব হয়ে গেল যখন দেখলাম, যে এয়ারডেল কুকুরটা সিংহের সম্মুখীন হয়েছিল সে মেরুদণ্ড ভেঙে পড়ে

রয়েছে। ভীরু কুকুরের দল, যারা কেবল দূর থেকে ঘেউ-ঘেউ করা ছাড়া আর কিছু করেনি, এখন তারা এমন বীর বিক্রমে মৃত সিংহটাকে কামড়াতে লাগল, যেন কতই বীরত্বের পরিচয় দিয়েছে। অথচ এই কুকুরটা প্রচুর দুঃসাহসের পরিচয় দিয়ে এখন মুমূর্ষু অবস্থায় পড়ে রয়েছে, কোনরকম অনুযোগ জানায় নি। তাকে সমস্ত যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেওয়া ছাড়া আর কিছুই আমার করবার ছিল না। সিংহের একান্ত সম্মুখীন হওয়ার অর্থই মৃত্যুকে বরণ করা,—কোন কুকুরের পক্ষেই কখনো সিংহের কবল থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া সম্ভব নয়। কুকুরদের কাজ হল শুধু নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে চিৎকার করা,—কখনো কামড় লাগাতে যাওয়া উচিত নয়, যদি না তাদের মনিব বা কোন সঙ্গী সিংহের কবলে পড়ে। ক্যাপ্টেন হার্স্টের কুকুরদের এ কথা ভাল করেই জানা ছিল, অনেকবার জখম হয়ে তবে তারা এই শিক্ষা পেয়েছিল। বেচারা এয়ারডেল সে শিক্ষা গ্রহণের আগেই প্রাণ দিল। এখন আমার একমাত্র আশা এই যে বাকি কুকুরগুলো হয়ত তার মৃত্যু থেকে সেই শিক্ষা লাভ করবে।

মৃত সিংহটাকে টেনে এনে কুকুরদের সামনে ফেলে দিলাম যাতে তার মাংসের স্বাদ পেয়ে ভবিষ্যতে ওদের শিকারে উৎসাহ জাগে। এই নতুন মাংস প্রথমটা তাদের বিশেষ ভাল লাগেনি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা এসে খাবলা খাবলা করে সেই মাংস খেতে শুরু করল, এ নিয়ে ঝগড়ার উপক্রম পর্যন্ত হল। কুলিদের দিয়ে সিংহটার ছাল ছাড়িয়ে নিয়ে তাঁবুর দিকে ফিরলাম।

প্রায় রেডিওর মত তাড়াতাড়ি আফ্রিকায় খবর ছড়িয়ে পড়ে। তাঁবুতে ফিরতে দেখি, একদল জোয়ান বীর আমার অভ্যর্থনার জন্যে প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। গুলির শব্দ পেয়েই নিশ্চয় ওরা সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসেছে—এ ছাড়া আর কোন কারণ আমার মনে এল না। তখন প্রচুর আনন্দোচ্ছ্বাস শুরু হল,—আগেকার দুই মাসাই খবর দিল যে ওরা এমন জায়গায় আমায় নিয়ে যাবে সিংহের সংখ্যা যেখানে ঘাসের চেয়েও বেশি। ওদের ইচ্ছে এক্ষুনি আমাকে নিয়ে যায়, কিন্তু আমি আপত্তি করলাম, বললাম যে আগামী কালের আগে তাঁবু গুটোনো কোনমতেই সম্ভব নয়।

বিকেলটা কাটল বন্দুকটার লক্ষ্যটা স্থির করতে, কারণ সকালের যে দুটো গুলিতে সিংহ মেরেছিলাম সেদুটো ঠিক যেখানে গিয়ে লাগার কথা ছিল সেখানে লাগে নি। কুকুরগুলোকে সঙ্গে নিয়েছিলাম, আর ভাল করে লক্ষ্য করছিলাম গুলির শব্দ শুনে ওরা কি করে। একটামাত্র কুকুর দেখলাম গুলির

শব্দে ভয় পায়, তাই এক বুড়ো মাসাইকে সেই কুকুরটাকে দিয়ে দিলাম, সেও খুশি হল কুকুরটাকে পেয়ে।

পরদিন ভোরবেলায় আমরা বেরিয়ে পড়লাম,—মাসাইরা চলল বল্লম উচিয়ে আর মোষের চামড়ার বিরাট ঢাল ঘাড়ের উপর ফেলে। ঢালগুলোর এক-একটার ওজন হবে পঞ্চাশ পাউণ্ডের মত, অথচ জোয়ানরা সেগুলো এমন অবলীলাক্রমে বয়ে নিয়ে চলল, যেন পালকের মত হালকা। কালো, লাল আর সাদা রঙের অনেক খুঁটিনাটি তাতে আঁকা। ঢাল দেখে মাসাইরা বলে দিতে পারে তার মালিকের কোথায় বাস, কোন জোয়ান দলের যোদ্ধা সে, সে দলে কী তার স্থান, কোন্ বয়সের সৈন্যদলের সে সভ্য, কী তার নাম আর যুদ্ধে বা সিংহ শিকারের ব্যাপারে কী কী বীরত্বের কাজ সে করেছে।

এমবারাশা পর্বতমালার পাদদেশে যখন এসে পৌছলাম তখন বেলা দুপুর। পাহাড় থেকে উপত্যকা পর্যন্ত বিস্তৃত বড় বড় শৈলশিরা ছড়িয়ে রয়েছে, প্রতিটি শৈলশিরায় ছোট ছোট মনোরম ঘাস আর অসংখ্য বুনো ফুলের সমারোহ। শৈলশিরা একেবারে খাড়াই না হলেও অত্যন্ত দুরারোহ। জোয়ানরা হরিণের মত লাফাতে লাফাতে সেই শৈলশিরায় উঠে গেল, কিন্তু ভারি বলদগুলোকে নিয়ে হল মুস্কিল, অনেক ঘুরে ফিরে তবে তাদের পক্ষে উপরে ওঠা সম্ভব হল। একটা শৈলশিরার উপর উঠে মাইল দুই-এক সমতল-ভূমি, তারপরেই আবার আর-একটা উপত্যকা—অর্থাৎ আবার নেমে আসা। এভাবে খানিকটা যাবার পর আবার উপরে ওঠা।

বিকেলের দিকে আমরা খানিকটা নিরস্তপাদপ অঞ্চলে গিয়ে পড়লাম। ঝোপ পেরিয়ে এক কর্দমাক্ত নদীর তীরে এসে পৌছলাম আমরা। দেখলাম একদল বৃদ্ধ বৃদ্ধা লম্বা-শিংওয়ালা গরুদের জল খাওয়াচ্ছে। গরুগুলো কতকটা ষাঁড়ের মত দেখতে, তেমনি কুঁজ তাদের পিঠে। তাদেরও গা চিত্রবিচিত্র করা, যা থেকে মাসাইরা তাদের বংশপরিচয়ের সন্ধান পায়।

বুড়োরা সকৌতূহলে আমাদের ঘিরে দাঁড়ালো আর মোরানরা অনেক অঙ্গভঙ্গি করে, চিৎকার করে আর বল্লম দুলিয়ে ওদের দেখাতে ব্যস্ত হল কেমন করে আমি মাত্র কয়েক মিনিটের ব্যবধানে অমন দুটো সিংহ বধ করেছি। লক্ষ্য করলাম খবরটা শুনে বৃদ্ধদের মুখমণ্ডল কেমন উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, আর বাচ্চারা খুব লম্ফঝম্ফ করে উত্তেজনার আতিশয্যে জোয়ানদের অঙ্গভঙ্গির অনুকরণ করল। মনে হল আমি ঠিক জায়গাতেই এসে পড়েছি—কারণ

শুনলাম মাত্র ক-দিন আগেই ছ-টা বহুমূল্য গরু সিংহের কবলে মারা পড়েছে এবং তাদের উদ্ধার করতে গিয়ে দু-জন রাখালও প্রাণ হারিয়েছে।

প্রচুর উৎসাহের সঙ্গে ওরা আমায় তাদের গ্রামে নিয়ে চলল। ভেবেছিলাম কিকুয়ুর মত এখানেও অসংখ্য চালাঘর দেখতে পাব, কিন্তু প্রায় উপর পর্যন্ত না ওঠা অবধি বোঝবারই উপায় নেই যে আদৌ এখানে একটা গ্রাম আছে; মনে হয় যেন সেই অত্যন্ত ঘনসন্নিবদ্ধ ঝোপ ছাড়া কিছু নেই। গ্রামের চারিদিক ঘিরে কাঁটাঝোপের 'বোমা', মানুষের সমান উঁচু করে বানানো, আর কুটির-গুলোর উচ্চতা বড়জোর আমার বুক পর্যন্ত। ওয়াট্‌ল্ গাছের কাঠামোর উপর গোবর মাখিয়ে ঘরগুলো তৈরি,—রোদে পুড়ে গোবর ইঁটের মত শক্ত হয়ে উঠেছে, কোন গন্ধও আর তাতে পাওয়া যায় না। কাত হয়ে, প্রায় অর্ধেক পর্যন্ত নিচু হয়ে তবে সেখানে ঢোকা সম্ভব হল। আদিবাসিদের বাড়ি সচরাচর যেমন হয় তেমন নয়,—কুটিরগুলো ওয়াট্‌ল্ দিয়ে ছোট ছোট ঘরে ভাগ করা। জানলা বলে কিছু নেই, কেবল দেওয়ালে খানিকটা করে ফুটো ছাড়া; আর কুটিরের ভিতরটা অন্ধকার হলেও বেশ ঠাণ্ডা আর আরামপ্রদ।

আশেপাশের অধিবাসিদের আকস্মিক পাল্টা আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যেই ওরা এভাবে ওদের ঘর তৈরি করেছে, যাতে চট করে কারুর চোখে না পড়ে। অসুন্দর হলেও ওদের এ ঘর রাত্রে গরম রাখা সহজ, আর দিনের বেলায় তো এমনিতেই যথেষ্ট ঠাণ্ডা।

খানিকটা বিশ্রামের পর, আর কমলা রঙের সরু-গলা লাউয়ে করে ওদের মেয়েরা যে দুধ এনে দিয়েছিল তা খেয়ে আমি বেরিয়ে পড়লাম মৃত গরুগুলোকে পরীক্ষা করে দেখতে। দুঃখের বিষয় তাদের প্রায় সব মাংসই মাসাইরা নিয়ে গেছে। মৃত জন্তুর মাংস হল টোপ হিসেবে চমৎকার, কারণ মাংসের লোভে সিংহ প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই তার শিকারে ফিরে আসে। এ কথা মাসাইদের বুঝিয়ে দিতে তারা বললে একটা মরা বাছুর প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে পড়ে রয়েছে, সেটার মাংস কেউ ছোঁয়নি। মরা বাছুরটা পরীক্ষা করে দেখলাম, তার প্রায় পুরো পেটটাই সিংহের উদরে গেলেও এখনো প্রচুর মাংস তার দেহে রয়েছে। যে দুই রাখাল মারা পড়েছিল তাদের দেহও ঝোপের মধ্যে পড়ে রয়েছে বটে, কিন্তু তাদের সমস্ত মাংসই সিংহ আর হায়েনার পেটে গেছে। মাসাইরা মৃতদের কবর দেয় না, জঙ্গলের স্বাভাবিক মুর্দাফরাসের উপরেই সে দায়িত্ব ছেড়ে দেয়।

নরখাদক বলতে যা বোঝায়, এই সিংহগুলো ঠিক তাই নয় আসলে। রাখালরা তাদের তাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করতেই তারা তাদের মারতে উদ্যত হয়। একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করা গেছে, কোন বন্য জন্তুর উপর থেকে সিংহকে তাড়িয়ে দেওয়া যতটা সহজ, কোন গৃহপালিত জন্তুর উপর থেকে তাড়ানো মোটেই তত সহজ নয়—একরকম অসম্ভব বললেই চলে ; প্রাণপণে সে তার শিকার আঁকড়ে থাকে।

সিংহের চিহ্ন অনুসরণ করে অগ্রসর হতে হতে দেখলাম, একটা ঘন সানসেভাইরিয়া ঝোপের মধ্যে সে প্রবেশ করেছে। কখন রাত্রি হবে এজন্যে সে অপেক্ষা করছে, তখন আবার শিকারের উপর ফিরে যাবে। মাসাইরা বললে, সন্ধ্যাবেলা যখন তারা তাদের গরু মোষ নিয়ে ফেরার পথ ধরে, চিৎকার করে তারা জন্তুদের তাড়া দেয় যাতে তারা তাড়াতাড়ি করে। এই চিৎকার থেকে সিংহ বুঝতে পারে যে পথ পরিষ্কার, এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই সে তার শিকারে ফিরে আসে।

ওদের বললাম সেদিন বিকেলে একটু আগে থাকতে গরু মোষ নিয়ে ফিরে আসতে, কারণ আমি মরা বাছুরটা আগলে লুকিয়ে থাকব। এ কথায় বৃদ্ধেরা খুব খুশি হল, বললে নিশ্চয় এ মতলব কার্যকরী হবে,—কারণ নান্দীদের সঙ্গে লড়াইয়ে এ কৌশল প্রতিবারেই কার্যকরী হয়েছে। নান্দী হল আর-এক লড়ায়ে জাত, তারা মাঝে মাঝে মাসাইদের সঙ্গে লড়ত। কোন নান্দী যোদ্ধার দল কাছে-পিঠে কোথাও আছে খবর পেলে মাসাইরা প্রচুর হৈ-হল্লার সঙ্গে তাদের গরু মোষ নিয়ে ঘরে ফিরত, আর মাসাইরা শুয়ে পড়েছে আন্দাজ করে নান্দীরা যেই ওদের গ্রামে হানা দিত অমনি মাসাইদের অতর্কিত আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ত।

মরা বাছুরটার নিকটবর্তী একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থেকে আমি সন্ধ্যার প্রতীক্ষায় রইলাম। সূর্যাস্তের সময় আমার কানে এল মাসাইদের উচ্চ, কর্কশ চিৎকার,—গরু মোষদের নিয়ে ঘরের ফেরার সঙ্কেত। ওদের চিৎকারের শব্দ একটু একটু করে মিলিয়ে যাচ্ছে শুনতে পাচ্ছি। হঠাৎ দেখলাম তিনটে কেশরী সিংহ, কুকুরের মত কান খাড়া করে বসে তারা এই মিলিয়ে-যাওয়া শব্দ শুনছে। শব্দটা একেবারে মিলিয়ে যেতে সিংহগুলো একে একে এগিয়ে এল আমার দিকে। আমার শরীরের প্রতিটি স্নায়ু শক্ত হয়ে উঠল, অপেক্ষা করে রইলাম কখন ওরা বন্দুকের পাল্লার মধ্যে আসে। যেখানে ওরা একটা

গরু মেরেছিল সেখানে পৌঁছে বাতাসে ঘ্রাণ নিল, যদিও গরুটাকে সেখান থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। ঘ্রাণ নেওয়া শেষ করে প্রতিটি সিংহ মাথা তুলল। একটা অদ্ভুত অভিব্যক্তি তাদের মুখে ফুটে উঠল; ক্রুদ্ধ গর্জনের সময় যেমন ফুটে ওঠে মনে হল তেমনি কতকটা, যদিও আসলে এ হল ভাল করে ঘ্রাণ নেবার চেষ্টা।

এখনো সিংহগুলো বন্দুকের পাল্লার বাইরে। আমি অপেক্ষা করে আছি, এমন সময় একটা শকুন এসে আমার থেকে কয়েক ফুট দূরে নামল। ঝোপের মধ্যে আমায় দেখে হয়ত কোন খাদ্যবস্তু মনে করে থাকবে। একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে রইলাম, কারণ শকুনটা যদি একটুও ভয় পেয়ে যায় তাহলেই সিংহেরা সাবধান হয়ে যাবে।

সিংহেরাও দেখতে পেয়েছিল শকুনটাকে। হয়ত সে কোন খাদ্যের সন্ধান পেয়েছে, এই মনে করে সিংহেরা পায়ে-পায়ে এগিয়ে এল। মাথা তুলে কুকুরের ভঙ্গিতে শকুনটার গন্ধ নিতে নিতে অগ্রসর হল তারা। যতক্ষণ না তারা আমার ত্রিশ গজের মধ্যে এল আমি গুলি করলাম না। শকুনটা এতক্ষণ আমায় কালো কালো চোখে লক্ষ্য করছিল, হঠাৎ ভয় পেয়ে বিশাল ডানায় আলোড়ন তুলে উড়ে গেল। সিংহেরাও থেমে পড়ে ভয়-পাওয়া শকুনটার দিকে তাকালো, তারপর আবার ফিরে আরও সাবধানে আমায় লক্ষ্য করতে লাগল।

তখনো আমি তেমনি ঝুঁকে ছিলাম, কিন্তু গুলি করতে হলে একটু উঁচু হওয়া দরকার। খুব ধীরে ধীরে, অত্যন্ত সন্তর্পণে আমি যতটা দরকার ততটা উঁচু হলাম—কত যুগ যেন লাগল। তখনও আমি সিংহদের থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিই নি। বুড়ো আঙুল দিয়ে সেফ্‌টি ক্যাচটা সরিয়ে রাইফেল তুলে সামনের সিংহটাকে লক্ষ্য করলাম। গুলির সঙ্গে সঙ্গে সে মরে পড়ে গেল। বাকি সিংহদুটো এক লাফে পেছিয়ে গেল, কিন্তু পালালো না। যেসব বন্য জন্তু আগে বন্দুকের আওয়াজ শোনে নি, তারা খুব সম্ভব একে বজ্রাঘাত বলে মনে করে, কারণ এতে তারা বিশেষ ভয় পায় না। দ্বিতীয় সিংহটাকে গুলি করতে গুলিটা তার কাঁধে গিয়ে লাগল। তৎক্ষণাৎ সে ক্রুদ্ধ গর্জন করতে করতে একটা পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়ালো আর সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় সিংহটা তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। দু-জনে মারামারি শুরু হল। তৃতীয় সিংহটা ক্রোধে পাগলের মত হয়ে উঠেছে, ল্যাজ সাপটাচ্ছে, তার গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠেছে

প্রকাণ্ড হাঁয়ের এক কামড়ে সে তার সঙ্গীর মাথার খুলি গুঁড়িয়ে দিতে চায়।

আবার গুলি করতে সে গুলি গিয়ে লাগল তৃতীয় সিংহটার কাঁধে। সঙ্গে সঙ্গে সে পেছনের দু-পায়ে ভর করে ঘোড়ার মত লাফিয়ে উঠল, আর সেই অবস্থাতেই আমার দ্বিতীয় গুলি তার কাঁধে গিয়ে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে সিংহটা পড়ে গেল, একটু নড়ল না পর্যন্ত। আমার গুলির আঘাতেই হোক বা সঙ্গীর কামড়ের চোটেই হোক, দ্বিতীয় সিংহটাও ইতিমধ্যে মারা পড়েছে।

দূর থেকে মাসাইদের সোল্লাস চিৎকার শোনা গেল—আমার বন্দুকের আওয়াজ ওরা পেয়েছে। ঝোপ ঝাড় ভেঙে তারা ছুটে এল। একটা শত্রু মারা পড়তেই যারা খুশিতে আত্মহারা হয়ে ওঠে, এখন তিন তিনটে মরা সিংহ দেখে তাদের উল্লাসের আর সীমা রইল না। বিজয়ীর ভঙ্গিতে আমরা গ্রামে ফিরলাম। আমার সামনে একটা ভেড়া মারা হল, তার পাঁজরের মাংস আগুনে ঝলসিয়ে আমায় দেওয়া হল; খেতে হল রানের মাংসের চেয়েও উপাদেয়। মেয়েরা মাটির পাত্রে করে দেশি বিয়ার নিয়ে এল, তার নাম পম্বে। প্রত্যেকে পাত্রটা দু-হাতে ধরে এক ঢোক করে পান করে পাশের লোককে দিল, এভাবে ঘুরতে থাকল পানপাত্রটা। ক্রমে নেশা ধরতেই তারা ঘন হয়ে এক অদ্ভুত ধরনের নাচ শুরু করল—সে নাচ হল কেবল উপর দিকে লাফিয়ে ওঠা। বিয়ার খেতে খেতে আর মাংসে কামড় লাগাতে লাগাতে আমি ওদের এই নাচ দেখতে লাগলাম। কুকুরগুলো আমায় ঘিরে শুয়ে রইল। কাছেই কোথায় গরুর ডাক শোনা গেল, আর দূর থেকে ভেসে এল অসংখ্য সিংহের গর্জন, নৈশ শিকারের জন্যে বেরিয়ে পড়েছে তারা। সত্যি, এই দেশই হল আমার আসল দেশ, এই মানুষরাই আমার মনের মত মানুষ।

পরের ক-টা দিন আশেপাশের জেলা থেকে অসংখ্য মাসাই এসে আমাকে ছেঁকে ধরল,—মাইলের পর মাইল অতিক্রম করে তারা এসেছে অত্যাচারী সিংহ মারার জন্যে আমায় নিয়ে যেতে। নিজ-নিজ জেলার সপক্ষে যুক্তি দেখিয়ে সকলেই আমার উপর তার দাবি প্রতিষ্ঠা করতে চায়। একজন বললে তাদের অঞ্চলে যত সিংহ আছে, কোন গাছেও অত পাতা আছে কি না সন্দেহ। আর একজন বললে তাদের উপত্যকায় চলতে গেলে পদে-পদে অসংখ্য সিংহ মিলবে। ওদের কথা শুনে বুঝলাম যে যেখানেই আমি যাই নিশ্চয় আমার সিংহের কোন অভাব হবে না। কুকুরদের নিয়ে প্রথমে আমি পাশের গ্রামে

গেলাম। গত এক সপ্তাহে এখানে অনেক গরু সিংহের কবলে মারা পড়েছে, আর এক বৃদ্ধ অত্যন্ত জখম হয়েছে। একদল বল্লমধারী মোরান আমার সঙ্গে চলল, কারণ এখনো তাদের ধারণা যে কেবলমাত্র বন্দুক ছাড়া আর কোন অস্ত্র না নিয়ে সিংহ-শিকারে গেলে অনর্থক জীবন বিপন্ন করা হবে।

গ্রামে পৌঁছে, শেষ হত্যাকাণ্ডটা যেখানে অনুষ্ঠিত হয় গেলাম সেখানে। ভুক্তাবশেষ যা ছিল তা ওরা আমায় দেখালো; সিংহ, শকুন ও হায়েনার হানার পর আর যৎসামান্য মাংসই রয়ে গিয়েছিল। কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষ্য করলাম যে যেভাবে বন্য পশু শিকার করে ঠিক সেইভাবেই সিংহ গৃহপালিত পশুও বধ করে,—তার ঘাড়েব উপব লাফিয়ে পড়ে সামনের দুই থাবা দিয়ে এক মোচড়ে তাব মাথাটা পেছন দিকে ফিবিয়ে দেয়, সঙ্গে সঙ্গে সে ঘাড ভেঙে মারা পড়ে। ভাঙা জায়গাটায় বক্ত এসে জমে, আর সেইখানে কামড় বসিয়ে সিংহ রক্ত চেটে খায়।

মৃতের শরীবে যথেষ্ট মাংস না থাকায় বুঝলাম সিংহ তাতে আকৃষ্ট হয়ে আসবে না, তাই আমি মোরানদের আব কুকুরগুলোকে সঙ্গে নিয়ে সিংহের চিহ্ন ধরে অগ্রসর হলাম। সিংহের চিহ্ন চারিদিকে এত বেশি যে কোন বিশেষ চিহ্ন ধরে অগ্রসর হওয়া কঠিন; অথচ যদি কোন বিশেষ চিহ্ন ধরে না যাই তাহলে হয়ত কেবল বৃত্তাকারে ঘোবাই সার হবে। সবচেয়ে টাটকা যে চিহ্ন তাই ধরেই আমরা অগ্রসর হলাম, যদিও বলা শক্ত তা কতদিনের পুরোনো। বাতাস আসে না এমন কোন ঝোপের আড়ালের পায়ের দাগও অনেক সময় খুব টাটকা মনে হয়। এমনও প্রায়ই দেখা গেছে যে কোন পুরোনো পায়ের দাগের উপর কোন ছোট জন্তুর নতুন পায়েব দাগ পড়েছে। এ বিষয়ে নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়ার একমাত্র উপায় হল সিংহের বিষ্ঠা অনুসরণ করা। পথ চেনার কাজে যে অভ্যস্ত, বিষ্ঠার অবস্থা থেকে সে সঙ্গে সঙ্গে বলে দিতে পারে কতকাল আগে সিংহ সে পথ দিয়ে গেছে।

চিহ্ন ধরে পথ-চলার ব্যাপারে মোরানরা অত্যন্ত নিপুণ। প্রায়ই তারা কোন ছোট ঝোপের ডাল তুলে এমন সব চিহ্ন দেখিয়ে দিতে লাগল যা আমার চোখে পড়ত না। ওরা যে ঠিক পায়ের দাগ ধরে এক পা এক পা করে অগ্রসর হয় তা নয়, দশ বা পনেরো ফুট অন্তর অন্তর চিহ্ন অনুসরণ করে এগোতে থাকে। সিংহের চলাফেরা তাদের এতই ভাল করে জানা আছে যে কোথায় সে গেছে এ তারা মোটামুটি আন্দাজ করতে পারে। যদি কখনো এতে ভুল

হয় তখন তারা থেমে দাঁড়িয়ে চারিদিকে তাকাতে থাকে, কুকুরের পাল যেমন করে কোন গন্ধ অনুসরণ করে চলতে চলতে হঠাৎ খেই হারিয়ে ফেললে কাছে-পিঠের বালির উপর পায়ের চিহ্ন লক্ষ্য করতে করতে চলে যতক্ষণ না আবার হারানো গন্ধ খুঁজে পায়।

বেশ কয়েক ঘণ্টা চিহ্ন ধরে এভাবে অগ্রসর হবার পর আমরা একটা ছোটখাট ঝোপের সামনে এসে পৌছলাম। অত্যন্ত ঘন এ ঝোপ, শিকারীর দুঃস্বপ্ন-স্বরূপ। এ ভেদ করে অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়, অথচ সিংহগুলোকে মারাও দরকার, নতুবা তারা অতি অবশ্যই আরও গরু মোষ মারবে, রাখালও মারবে হয়ত। এই হল কুকুরদের সুযোগ তাদের ক্ষমতার পরিচয় দেবার। দিলাম পাঠিয়ে ওদের ঐ ঝোপের ভিতরে।

মাসাইদের নিয়ে আমরা ঝোপের বাইরে অপেক্ষা করে রইলাম। মোরানরা তাদের ঢালে ভর করে দাঁড়িয়ে রইল, তাদের বর্শার ফলা সামনের দিকে মাটিতে গাঁথা, আর আমি রাইফেল বাগিয়ে আক্রমণের প্রতীক্ষায় রইলাম।

ভীষণ ঘেউ-ঘেউ করতে করতে কুকুরগুলো ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল। বাইরে এসে অর্ধবৃত্তাকারে দাঁড়ালো, আর দুঃসাহসী এয়ারডেল আর কলিদুটো ঝোপের ভিতর থেকে সিংহদের বের করে আনার চেষ্টায় রইল।

কিছুমাত্র সঙ্কেত না করেই, সম্পূর্ণ অতর্কিতভাবে একটা সিংহ ঝোপ থেকে বেরিয়ে কুকুরগুলোর দিকে তেড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে কুকুরগুলো ফাঁক হয়ে সিংহের জন্যে পথ করে দিল, কিন্তু তবুও সিংহ একটা কুকুরকে নাগালের মধ্যে পেয়ে এক থাবায় তাকে ধরাশায়ী করল। এত দ্রুতগতিতে ব্যাপারটা ঘটে গেল যে ভাল করে দেখাই গেল না, শুধু দেখলাম যে কুকুরটা পড়ে রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে বাকি কুকুরগুলোও সিংহের দিকে তেড়ে গেল, আর পেছন থেকে খুব ঘেউ-ঘেউ শুরু করল যাতে সিংহ আহত কুকুরটাকে ছেড়ে তাদের দিকে মন দেয়। সিংহটা ঘুরে তাদের দিকে ফিরেই নিপুণ বক্সিং-লড়িয়ের মতন বিদ্যুতের বেগে ডাইনে বাঁয়ে থাবা চালাতে লাগল। আমি গুলি করলাম; গুলি করতেই সিংহটা অনেকখানি লাফিয়ে উঠল, আর যে-মুহূর্তে সে মাটিতে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে কুকুরের পাল তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তাদের ডেকে ফিরিয়ে নেবার উপক্রম করছি, এমন সময় খানিকটা দূরে আর-একটা সিংহ হঠাৎ বেরিয়ে এল আর মুহূর্তমধ্যে মাসাইরা বল্লম উঁচিয়ে, বন্য চিৎকার করতে করতে তাকে আক্রমণ করল। কুড়ি ফুটের মত এক-একটা লাফে সিংহটা প্রান্তরের

উপর দিয়ে ছুটে চলল, কুকুরগুলো আর মাসাই শিকারীরা ছুটল তার পিছু পিছু। কিছুক্ষণ পর্যন্ত সিংহটা এগিয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কুকুররা ধরে ফেলল তাকে। আমি পেছনে পড়ে হাঁপাচ্ছিলাম,—যখন গিয়ে পৌঁছলাম ততক্ষণে কুকুররা সিংহটাকে বৃত্তাকারে ঘিরে ফেলেছে। মাসাইরাও একটা বৃত্ত করে, বল্লম বাগিয়ে ক্রমেই তার নিকটবর্তী হচ্ছে।

বোকাগুলোকে চিৎকার করে বারণ করলাম, কিন্তু তারা ইতস্তত করতে লাগল, আব আমি রাইফেলটা তুলে নিলাম, লক্ষ্য কবলাম যাতে কুকুরগুলোর গায়ে না লাগিয়ে গুলি করতে পারি। সিংহটা আমায় দেখেই হঠাৎ আক্রমণ করে বসল, কুকুরগুলোর উপর দিয়ে লাফিয়েই ধেয়ে এল সে। অপেক্ষা করলাম যতক্ষণ না কুকুবগুলোব কাছ থেকে সে বেরিয়ে আসছে, তারপর গুলি করলাম। প্রথম গুলিটা খেয়ে সিংহটা মাটিতে পড়ে খুব ছটফট করতে লাগল আর ধুলো-কাদা মাখতে লাগল, কিন্তু মুহূর্তমধ্যেই উঠে দাঁডালো সে, নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইল—তখন আর গুলি করার পক্ষে কোন অসুবিধে রইল না। দ্বিতীয় গুলিটা গিয়ে বুকে লাগতেই সঙ্গে সঙ্গে মরে গেল সিংহটা।

পরের কয়েক সপ্তাহে আমি কুকুরগুলোর সাহায্যে পঞ্চাশটারও বেশি সিংহ শিকার করলাম। কয়েকটি সঙ্গীর মৃত্যু দেখবার পর ইদানীং কুকুরগুলো অনেকটা সাবধান হয়ে পড়েছিল, সিংহের থাবা সযত্নে এড়িয়ে চলত। কখনো দেখিনি সিংহ কোন কুকুরকে কামডাচ্ছে; কুকুরগুলোর উপর বিরক্ত হয়ে তাদের লক্ষ্য করে বিদ্যুৎবেগে থাবা চালায় সে, কুকুরকে যেন কামডাবার যোগ্য প্রাণী বলেই মনে করে না। কোন সঙ্গী সিংহের কবলে পডলে তাকে বাঁচাবার জন্যে যখন কোন কুকুর সিংহের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, সিংহের চামডা না ধরে কেশর আঁকড়ে ধরে সে, কারণ চামডার চেয়ে কেশর ধরে থাকা সহজ।

ঝোপের মধ্যে সিংহেরই সুবিধে অনেক বেশি, ফলে এত বেশি কুকুর মারা পডতে লাগল যে শেষ পর্যন্ত আমাকে খুব সাবধান হয়ে যেতে হল, ঠিক করলাম ওদের ব্যবহার করব কেবলমাত্র যখন কোন সিংহের বিশেষ উৎপাতের খবর আসবে তখন। অন্য সময় ওদের তাঁবুতে রেখে যথাসাধ্য একাই সিংহ শিকার করতাম।

একদিন সন্ধ্যায় একা শিকার করতে বেরিয়ে তরাইয়ের ঝোপ-জঙ্গলের মধ্যে পথ হারিয়ে ফেললাম। যে-পথে এসেছি সেই পথে ফেরবার চেষ্টা করছি, কিন্তু

তাঁবুতে পৌছবার আগেই রাত্রি এসে গেল, আর আমার পক্ষে পথ চিনে ফেরা সম্ভব হল না। বিকেলবেলা থেকেই একটা ঝড়ের সূত্রপাত হচ্ছিল, এতক্ষণে সেই ঝড় দূরের শৈলশিরার উপর নেমে এল। বিদ্যুতের আলোয় কিছুক্ষণ পথ চিনে চলা সম্ভব হল, কারণ যেখানে ঝড় বইছে সেখান থেকে পাহাড়গুলোর দূরত্বের একটা মোটামুটি ধারণা আমার ছিল। মধ্যরাত্রি নাগাদ ঝড়ের দাপট শেষ হতে, অন্ধের মত আন্দাজ করে করে সেই অন্ধকারে অগ্রসর হলাম। কিছুক্ষণ পরে গোয়াল থেকে গরুর গলার ঘণ্টার শব্দ আমার কানে এল, বড় মিষ্টি লাগল সে শব্দ। সেই শব্দ অনুসরণ করে অগ্রসর হলাম—চলি, আর চিৎকার করতে থাকি। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার চিৎকারের সাড়া এল। একটা আলো চোখে পড়ল, সেই আলোয় দেখলাম আমার সামনে একটা গোবর-লেপা মাসাই কুটির, আব তার পাশেই যথারীতি কাঁটা-ঝোপে ঘেরা একটা গোয়াল। মাসাই দম্পতি আমায় ঘরে নিয়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি একটা আগুন তৈরি করল। পুরুষটির বয়স চল্লিশের উপর, সুতরাং তাকে আর মোরান বলা চলে না; সুতরাং মাসাইদের হিসেবে এখন তার অবস্থা পড়তির দিকে,—শেষ পর্যন্ত একদিন তাকে সিংহের কবলে ফেলে দেওয়া হবে। সিংহ-শিকারী হিসেবে আমার নাম সে শুনেছে, ব্যগ্র হয়ে সে প্রশ্ন করতে লাগল আমার বন্দুক সম্বন্ধে, আমার সম্বন্ধে, আমি কত জন্তু মেরেছি সে সম্বন্ধে। ওর নাম কিরাকাঙ্গানো। অনেক বছর হল ওর বাপ গণ্ডারের হাতে মারা পড়ে, সেই থেকে সমস্ত হিংস্র জন্তুর উপর তার বিজাতীয় ঘৃণার উদ্রেক হয়, তাদের হত্যা করাই তার জীবনের মূলমন্ত্র হয়ে ওঠে। বল্লম দিয়ে সিংহ ও মহিষ শিকারের যেসব কাহিনী সে আমার শোনালো, তা বিশ্বাস করা কঠিন। অথচ আমি জানি, মাসাইরা কখনও মিথ্যা বলে না। মাসাইরা অধিকাংশই তাদের গরু বা স্ত্রীর সংখ্যা নিয়ে গর্ব করে থাকে, কিরাকাঙ্গানোর কিন্তু একমাত্র আনন্দ ঘন ঝোপে ঝাড়ে ঢাল আর বল্লম নিয়ে হিংস্র জন্তুর সঙ্গে লড়াই করা। আমার মত সেও শিকার ভালবাসে।

ইতিমধ্যে আমি ওদের ভাষা খানিকটা শিখে ফেলেছিলাম, জিজ্ঞাসা করলাম সে আমার পথপ্রদর্শক আর সঙ্গী হতে রাজি কি না। একটি কথাও না বলে সঙ্গে সঙ্গে সে উঠে পড়ল; ঢাল আর বল্লম তুলে নিয়ে জিজ্ঞাসা করল কখন যেতে হবে।

কিরাকাঙ্গানো ভবিষ্যতে আমার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ হয়ে উঠেছিল,—আমার

রাইফেলের দ্বিতীয় নল যেন। পথপ্রদর্শক হিসেবে অপূর্ব, সম্পূর্ণ নির্ভীক এই লোকটির উপর আমার পূর্ণ আস্থা ছিল, এমন মানুষ বড একটা চোখে পডে না। কতবার এমন হয়েছে, রাইফেলের দুটো গুলি ছুডেও তেডে-আসা জন্তুকে থামাতে না পেরে দ্বিতীয় রাইফেলের জন্যে হাত বাড়াতে গিযে দেখেছি, সঙ্গী কোথায় পালিয়েছে। কিন্তু কিরাকাঙ্গানো কখনো আমাকে এভাবে বিপদে ফেলেনি। শুধু যে অত্যন্ত বিশ্বস্ত তাই নয়, ঝোপ-ঝাডের ব্যাপারেও খুব ওস্তাদ সে, আর চিন্তাও সে করতে পাবত ঠিক বন্য জন্তুর মত, যার ফলে অনেক আগে থাকতেই জন্তুর চালচলন আন্দাজ করে সেজন্যে প্রস্তুত থাকা ওর পক্ষে সম্ভব হত।

কিরাকাঙ্গানোকে দলপতি করে আর সকলকে ছোট ছোট বল্লমধারীর দলে ভাগ করে দিলাম যাতে সুশৃঙ্খলভাবে শৈলশিরাব মধ্যবর্তী নালাগুলোর ভিতরে অনুসন্ধান কাজ চালানো সম্ভব হয়। এইসব নালা ঘনসন্নিবদ্ধ জঙ্গলে ভরা, দিনের বেলায় সিংহের বিশ্রামের জায়গা। এর এক প্রান্তে থাকতাম আমি, আর মোরানরা চেঁচাতে চেঁচাতে আর ঢাল-বল্লম আস্ফালন করতে করতে ঝোপ ঝাড ভেঙে সিংহদের তাডা দিতেই তারা আমি যেখানে ছিলাম তার নিচে দিয়ে ছুটে যেত, আমি থাকতাম ওদের দৃষ্টি ও ঘ্রাণশক্তির সীমানার বাইরে। এভাবে আমি একবার অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে সাতটা সিংহ শিকার করি। যেমন একটার পর একটা সিংহ মরে পডে, বাকিগুলো পাক খেতে খেতে গর্জন করতে করতে দেখতে আসে কোথা থেকে গুলি আসছে, মুখ তুলে উপর দিকে যে তাকাবে এ ওদের খেয়াল হয় না।

কিরাকাঙ্গানো আমার যত কাজের লোকই হোক, ওরই জন্যে কিন্তু একবার আমায় একটা সেরা সিংহকে হারাতে হয়েছিল। ব্যাপারটা হল এই।

এক গ্রামের অধিবাসীরা তাদের গৃহপালিত পশুর উপর সিংহের অত্যাচারের কথা জানিয়ে আমার সাহায্য চাওয়ায় আমি কিরাকাঙ্গানোকে নিয়ে বেরিয়ে পডলাম। গ্রামে পৌছবার আগেই সন্ধ্যা হয়ে গেল। রাখালদের বৃত্তান্ত শুনে আমি ঠিক করলাম একটা জেব্রা মেরে সেটাকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করব। কিরাকাঙ্গানোর সঙ্গে বেরিয়ে পডলাম জেব্রার সন্ধানে। ঠিক গোধূলির সময় আমি একটা পুরুষ জেব্রাকে গুলি করলাম, কিন্তু গুলিটা গিয়ে লাগল তার শরীরের অনেকটা পেছন দিকে। সেই অস্পষ্ট আলোয় আর তার পিছু নেওয়া সম্ভব হল না। পরদিন সকালে তার চিহ্ন

ধরে অগ্রসর হলাম, নিশ্চিত ধারণা হল যে শকুনের পালের ঘুরে ঘুরে ওড়া দেখেই মৃত জেব্রার অবস্থিতির আন্দাজ পাব।

একটা ঝোপের ধার দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ কিরাকাঙ্গানো থেমে পড়ে বল্লম দিয়ে ইঙ্গিত করল। তার ইঙ্গিত অনুসরণ করে দেখলাম, একটা সিংহ জেব্রাটাকে আস্তে আস্তে একটা আকাশিয়া গাছের ছায়ায় টেনে নিয়ে চলেছে, সেখানে বসে আয়েস করে তাকে খাবে। চমৎকার কেশর সিংহটার। জেব্রাটাকে ঘাড়ে করে খানিকটা করে নিয়ে যেতে যেতে থেমে পড়ে কুকুরের মত হাঁপাচ্ছে আর বিশ্রাম করছে, তারপর আবার তেমনি চলেছে। জেব্রাটার ওজন প্রায় নয় থেকে দশ মণের মত, তাই সিংহের সাঙ্ঘাতিক শক্তি আন্দাজ করে আমি অভিভূত হলাম। ঝোপ ভেঙে আকাশিযা গাছের দিকে অগ্রসর হচ্ছি, কিরাকাঙ্গানো এগিয়ে থেকে সবচেয়ে সহজ পথ দেখিয়ে দিচ্ছে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে রইলাম কখন সিংহ কাছে এগিয়ে আসে। অপূর্ব সিংহটা, তার শরীরের সামনের প্রায় সমস্তটাই কেশরের আড়ালে অদৃশ্য। ঘন জঙ্গলের সিংহের এমন চমৎকার কেশর প্রায় দেখা যায় না, কারণ ঝোপে ঝাড়ে লেগে প্রায়ই কেশরের খানিকটা করে ছিঁড়ে যায়। সিংহ আর-একটু এগিয়ে আসতেই লক্ষ্য করলাম, কিরাকাঙ্গানো আমার পাশে দাঁড়িয়ে উসখুস করছে।

হঠাৎ সে চিৎকার করে উঠল আর সঙ্গে সঙ্গে বল্লম বাগিয়ে সিংহকে তাড়া করল। বিশাল সিংহটা মুহূর্তকাল অবাক চোখে তার দিকে তাকিয়ে জেব্রা ফেলে পালালো। কিরাকাঙ্গানোও ছুটল তার সঙ্গে সমান্তরাল হয়ে—আর এমন ভাব দেখাতে লাগল যেন এই বল্লমটা ছোড়ে বুঝি, কিন্তু সিংহের গতি তার গতির বহুগুণ বেশি, কিরাকাঙ্গানোকে সে অনেকটা পেছনে ফেলে ঝোপ জঙ্গলের অন্তরালে আত্মগোপন করল। এভাবে সিংহকে তেড়ে যাওয়ার জন্যে তাকে ধমক দিতে সে শুধু নিরীহের মত বললে : 'আহা! কী প্রকাণ্ড সিংহটা!'

এই শিকারের সময় কুকুরদের সাহায্য যে একেবারে নিইনি তা কিন্তু নয়। কোন সিংহ আহত হয়ে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়লে তখন কুকুরদের ছেড়ে দিতাম তাকে খুঁজে বের করতে, কারণ তা না হলে সে হায়েনাদের কবলে পড়বে, সে হবে এক অতি মর্মন্তুদ ব্যাপার। এই মুর্দাফরাসদের সিংহ অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখে। খাওয়ার সময় সিংহ কোন হায়েনাকে সেখানে আসতে দেয় না, যদিও হায়েনা তার যথেষ্ট প্রিয় পাত্র, এবং মানুষ যেমন পোষা কুকুরকে

খাবার ছুড়ে ছুড়ে দেয় সেও তেমনি কিছু কিছু মাংসের টুকরো দেয় হায়েনাকে। সিংহের এই অহঙ্কার হায়েনা পছন্দ করে না এবং সিংহ যখন বার্ধক্যবশে বা আহত হয়ে অক্ষম হয়ে পড়ে, তখন আসে তাদের প্রতিশোধের সুযোগ। কোন সিংহেরই স্বাভাবিক মৃত্যু হয় না, শেষ পর্যন্ত তাকে হায়েনার হাতেই প্রাণ হারাতে হয়। হায়েনারও আমার মনে হয় অন্য যেকোন মাংসের চেয়ে সিংহের মাংসই পছন্দ বেশি।

এক দুরতিক্রম্য জলার মধ্যে কয়েকটা সিংহ ছিল, বিশেষ করে তাদের অত্যাচারের কথাই মাসাইরা আমাকে জানালো। এর মধ্যে ছিল এক সিংহী তার তিন শাবককে নিয়ে; এক রাখাল তার গরু-মোষকে এই সিংহীর কবল থেকে বাঁচাতে গিয়ে তার হাতে মারাত্মকভাবে জখম হয়। অনেক গরু মোষ এই সিংহের দলের হাতে মারা পড়েছে। শুনে আমি ঠিক করলাম এদের মারতে হবে,—সিংহীটাকেই বিশেষ করে, কারণ শোনা যাচ্ছিল ক্রমেই সে দুর্দান্ত হয়ে উঠছে। জলায় যাওয়া সম্ভব না হওয়ায় ঠিক করলাম, টোপের লোভ দেখিয়ে তাকে মারতে হবে।

এই রিজার্ভে টোপ ফেলে সিংহ মারার মধ্যেও হাঙ্গামা অনেক। মাসাইদের নিয়ম হল, তাদের সমাজের বৃদ্ধেরা যখন অকর্মণ্য হয়ে মৃত্যুর মুখে পড়ে, তখন তাদের নিয়ে জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে আসা, সেখানে তারা হায়েনার কবলে প্রাণ হারায়। *

* একবার মনে আছে পেশাদারী শিকারী মেজর ডেভিড শেলড্রিকের সঙ্গে শিকারে গেছি। (মেজর এখন সুবৃহৎ সাভো ন্যাশন্যাল পার্কের একজন রক্ষক)। একটা চমৎকার জেব্রাকে টোপ করে সারা রাত সিংহের প্রত্যাশায় বসে রয়েছি, কিন্তু এমনই মন্দ ভাগ্য যে সারা রাত সিংহের ডাক শুনলাম আর বিশেষ প্রিয় খাদ্যের সন্ধান পেলে হায়েনা যেমন শব্দ করে তাও শুনলাম; অথচ টোপ অক্ষতই রয়ে গেল। আমার ধারণা ছিল যে সিংহ বা হায়েনার কাছে এই মাংসই সবচেয়ে উপাদেয়, কিন্তু দেখা গেল যে তখনো আমার শিক্ষার বাকি ছিল। মাসাইদের কাছে শুনলাম সে-রাতে আমাদের হতাশার কারণ হল এক বৃদ্ধা, আগের রাত্রে যার মৃত্যু হয়েছিল, কারণ সিংহ আর হায়েনার দল তারই উপর পড়েছিল। এই বৃদ্ধা হয়ত যৌবনকালে সুশ্রী ও স্বাস্থ্যবতী ছিল। মাসাইদের জীবনযাত্রার এই ধারাগুলো আমার কাছে অত্যন্ত নিষ্ঠুর মনে হয়। যাই হোক, বনের পশুর কাছে দেখা গেল পুরুষ্টু জেব্রার চেয়ে বৃদ্ধা রমণীর মাংসও সুস্বাদু।

টোপের লোভ দেখিয়ে সিংহকে বের করে আনবার উদ্দেশ্যে এবার আমি একটা জন্তু মারলাম,—এখান থেকে খানিকটা দূরে,—যাতে বন্দুকের শব্দ সিংহেরা না পায়। সমস্ত জঙ্গলটার উপর দিয়ে গরুর গাড়ি করে মরা জন্তুটা নিয়ে আসা হল। অর্থাৎ সিংহেরা যেখানেই থাকুক রক্তের ধারা অনুসরণ করে ঠিক এসে হাজির হবে। আকাশিয়া গাছটার নিচে মরা জন্তুটাকে রেখে লোকজনদের দিয়ে গাছটার উপর একটি মাচান তৈরি করলাম। সিংহ মারার জন্যে মাচানের বহুল ব্যবহার হয়, যদিও আমি নিজে এ বিশেষ পছন্দ করি না, এর চেয়ে আমার পছন্দ মাটির উপর একটা বোমা তৈরি করে সেখান থেকে গুলি করা, কারণ উঁচু মাচান থেকে গুলি করলে সে গুলি শিকারের উপর দিয়েই চলে যাবার সম্ভাবনা। যাই হোক, এ অঞ্চলে যেরকম হাতি চলাফেরা করে তাতে বোমার উপর নির্ভর করতে সাহস হল না, কখন হয়ত ভুল করে মাড়িয়েই চলে যাবে। বাধ্য হয়েই তাই মাচান বানাতে হল। মনে হল এখানে আমি সম্পূর্ণ নিরাপদ—কে আর তখন আন্দাজ করতে পেরেছিল যে মাত্র দু-ঘণ্টার মধ্যেই আমাকে ভয়ঙ্কর বিপদের মধ্যে পড়তে হবে!

প্রথম রাতের প্রতীক্ষা নিষ্ফল হল। সিংহেরা এসেছিল বটে, কিন্তু রাইফেল তুলতেই উপরের ডালের একটা পাখি চেঁচাতে চেঁচাতে এমন কাণ্ড করল যে সিংহেরা ভয়ে পালালো। অগত্যা পরদিন আবার মাচানে গিয়ে উঠলাম।

অন্ধকার হয়ে আসতে শুরু হল মুষলধারার বৃষ্টি। সারা শরীর ভিজে গেল, আর কোন জলা থেকে মশার দল এসে কেবলই আমায় ঘিরে ভন-ভন করতে লাগল। পাছে সিংহেরা চমকে পালায় সেই ভয়ে মশাও মারা চলল না। একটা সুবিধে অবশ্য বৃষ্টিপাতের ফলে হল, সিংহেরা বৃষ্টির গন্ধে খানিকটা ভরসা পায়, তারা নিশ্চিন্ত হল। চারিদিকের ঝোপ ঝাড় থেকে তাদের শিকার ধরার শব্দ কানে এল এবং রাত তিনটে নাগাদ আমি টের পেলাম, তারা খুবই কাছে এসে পড়েছে। তাদের টানা টানা দীর্ঘশ্বাস আমার কানে এল, আফ্রিকার অন্য যে-কোন শব্দের সঙ্গে প্রচুর তার পার্থক্য। অস্বাভাবিক ভঙ্গিতে সারাক্ষণ শুয়ে থেকে শরীর আড়ষ্ট হয়ে এসেছিল, রাইফেলটা ঠিকমত বাগিয়ে ধরতে গিয়ে সামান্য যেটুকু নড়াচড়া করতে হল তাতেই সঙ্গে সঙ্গে সিংহেরা পালিয়ে গেল। যে সিংহ শত্রুর পিছু নেবার সময় একেবারে নিঃশব্দে অগ্রসর হয়, সে-ই আবার পালাবার সময় প্রচুর শব্দ করে, তার পায়ে থপ-থপ শব্দ

ওঠে। বুঝলাম বেশিদূর তারা যায়নি, হয়ত কাছে-পিঠেই কোন ঝোপের আড়ালে আত্মগোপন করে কান পেতে লক্ষ্য করছে। নিস্পন্দ হয়ে আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম।

শিকারের ব্যাপারে নিয়তির হাত কম নয়। আগের রাতে একটা পাখির ডাকে আমার সুযোগ নষ্ট হয়েছিল, আর আজ একটা হাইর‍্যাক্স আমার মাচানের কাছ থেকেই ডাক শুরু করল। সে ডাকে ভরসা পেল সিংহেরা, কারণ তারা জানত যে কোনরকম ভয়ের কারণ থাকলে হাইর‍্যাক্স ডাকত না। আস্তে আস্তে তারা টোপের কাছে এগিয়ে এল, অত্যন্ত সন্তর্পণে এগোয় আর থেকে থেকে তাকায় পেছন ফিরে ফিরে। রাইফেলটা কাঁধে লাগিয়ে আমি তেমনি উবুড় হয়ে নিস্পন্দ পড়ে রইলাম, যাতে একটুও নড়াচড়া না করে আমি গুলি করতে পারি।

দুটো সিংহ, দুটোই পুরুষ। বন্দুকের নলের সঙ্গে টর্চটা একসঙ্গে করে ডান-দিকের সিংহটাকে লক্ষ্য করে গুলি করলাম, কারণ আমি জানি, এই অবস্থায় থেকেই রাইফেলটা বেঁকিয়ে নিয়ে অপর সিংহটাকেও গুলি করা সম্ভব হবে। পড়ে গেল সিংহটা; তার সঙ্গী লক্ষ্য করতে লাগল তাকে।

এবার তার সঙ্গীটাকে গুলি করতেই এ সিংহটাও পড়ে গেল; তবুও নিশ্চিত হবার জন্যে তাকে আরেকটা গুলি করলাম। সিংহীটার কিন্তু এতক্ষণেও কোন খবর নেই। গুঁড়ি মেরে মাচান থেকে নেমে সিংহদুটোকে টানতে টানতে গাছের নিচে এক জায়গায় নিয়ে এলাম, বর্ষাতি দিয়ে ঢেকে দিলাম তাদের যাতে হায়েনারা এসে তাদের চামড়া নষ্ট করতে না পারে।

কয়েকটা গাছের ডাল ভেঙে আমার গায়ে ঢাকা দিলাম—শীত এড়াবার জন্যে যতটা না হোক, ওজনের জন্যে বিশেষ করে, যাতে না পড়ে যাই। এভাবে ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম ভাঙল টোপটা খাওয়ার শব্দে। এসেছে সিংহী তার তিন বাচ্চা সঙ্গে করে। খুব সন্তর্পণে, যথাসম্ভব কম শব্দ করে রাইফেলটা তুলে নিয়ে গুলি করলাম,—গুলিটা তার মাথা ভেদ করে গেল। সঙ্গে সঙ্গে টোপটার উপর পড়ে গেল সিংহী আর বাচ্চা তিনটে অন্ধকারে কোথায় পালিয়ে গেল। আমার কাজ শেষ হল। মাচান থেকে নেমে পড়ে সিংহীটার ল্যাজ ধরে টানতে টানতে নিয়ে চললাম অন্য মৃত সিংহগুলো যেখানে ছিল সেখানে।

টর্চটা নামিয়ে রাখলাম, সিংহীটাকে নিয়ে যাবার জন্যে যাতে দুটো হাতই

ব্যবহার করতে পারি। আচম্বিতে অন্ধকার একটা আকৃতি আমার দৃষ্টিগোচর হল। মুহূর্তের জন্যে মনে হল হয়ত সিংহীর একটা বাচ্চা, কিন্তু পরক্ষণেই বুঝলাম, বাচ্চাটার তো এত বড় হবার কথা নয়! থেমে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইলাম তার দিকে। আমি এক সুবৃহৎ সিংহের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে,—হয়ত সদ্য-হত সিংহীর সঙ্গী!

রাইফেলটা মাচানে রেখে এসেছি। মুহূর্তের জন্যে দু-জনে দাঁড়িয়ে রইলাম পরস্পরের দিকে তাকিয়ে। সিংহটা ষাঁড়ের মত প্রকাণ্ড। একটা শব্দও সে করল না। বড় বড় কেশর আর কালো মুখ নিয়ে মাত্র পনেরো ফুট দূরে দাঁড়িয়ে আছে সিংহটা। যদি দৌড়োই তাহলে হয়ত তাড়া করবে, কিন্তু রক্তমাংসের মানুষ আমি, এ উত্তেজনা আর সহ্য করতে পারলাম না,—সবেগে ছুটে গেলাম গাছটার দিকে। কোন ডালপালা হাতের কাছে ছিল না, কাঠবেড়ালির মতই সেই গাছের গুঁড়ি বেয়ে তর-তর করে উঠে পড়লাম। মাচানে গিয়ে যখন পৌঁছলাম, আমার সারা শরীর ঘামে ভেসে যাচ্ছে। আতঙ্কে, উত্তেজনায় রাইফেলটা ফেলেই দিচ্ছিলাম আর-একটু হলে। কিন্তু কিছুই আমার চোখে পড়ল না, কারণ টর্চটা নেই, নিচে ফেলে এসেছি।

কয়েক মিনিট পরে সিংহটার টোপের কাছে যাওয়ার আর মাংস খাওয়ার শব্দ আমার কানে এল। কিছুক্ষণ ভাল করে শোনার পর তার অবস্থিতিটা আন্দাজ করে নিলাম। এ অবস্থায় যথাসম্ভব লক্ষ্য স্থির করে গুলি ছুড়ে দিলাম। গুলির শব্দ মিলিয়ে যাবার পর আর কোন শব্দ পেলাম না। মনে হল যেন খুব অস্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছি সিংহটা টোপের কাছে পড়ে আছে। বাকি রাতটা আমি মাচানের উপরেই কাটালাম,—আফ্রিকার যাবতীয় কালো-কেশর সিংহের লোভেও আর আমি সে রাত্রে মাচান থেকে নামতাম না।

বীভৎস বীভৎস স্বপ্নের ঘোরে সে রাত্রে বার বার আমার ঘুম ভেঙে গেল: যে সমস্ত পশু আমার নিচে পড়ে রয়েছে আমায় যেন তারা ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। দিনের আলো হলে আমি নেমে পড়ে সিংহগুলো পরীক্ষা করে দেখলাম। শেষ যে সিংহটাকে মারি তার কেশর অনেকটা বাদামি রঙের, বলা যেতে পারে, এ সফরের সব-সেরা সিংহগুলির একটি।

ভোরবেলা উঠে কিরাকাঙ্গানো আর আমি সিংহীর বাচ্চাদের খোঁজে বেরিয়ে পড়লাম। দেখলাম, একগুচ্ছ শুকনো ঘাসের মধ্যে তারা লুকিয়ে রয়েছে। লোমশ টেডি ভাল্লুকের মত দেখতে সেগুলো। আমাদের দেখে

প্রতিহিংসার বশে প্রচুর ফ্যাচ্-ফ্যাচ্ করতে লাগল। তাদের নিয়ে তাঁবুতে ফিরে গেলাম। একটা পাত্রে দুধ রেখে তাতে মুখ ডুবিয়ে তাদের খাওয়াবার চেষ্টা করা হল। কিন্তু ওভাবে খাওয়া তারা জানে না, কারণ সরাসরি মায়ের বাঁট থেকেই তারা খেতে অভ্যস্ত। তবে, নাকে যে দুধ লেগেছিল সেই দুধ তারা চেটে খেতে লাগল; গরম গরম, খেতে ভালই লাগল মনে হল। বেশ কিছুকাল ধরে তারা এভাবে খাওয়ার কাজ চালালো। শেষ পর্যন্ত তারা দুধ চেটে খেতে শিখল, আর খুব পোষ মানল। আমার ক্যাম্পখাটের পায়ায় বেঁধে রাখতাম তাদের। ভারি জ্বালাতন করত বাচ্চাগুলো—প্রায় সারারাত কেবল ঝগড়াঝাটি আর মারামারি আর চেঁচামেচি। কিন্তু তাহলেও তাদের প্রাণশক্তির অভাব ছিল না। যেকোন সময়েই তারা লড়াইয়ের জন্যে বা খেলার জন্যে প্রস্তুত। একদিন তারা দিনের বেলায় ছাড়া পেয়ে আমার একমাত্র বালিশটা নিয়ে খুব লড়াই করল। তাঁবুতে ফিরে দেখি, সাদা পালকের একটা ঝড় বয়ে গেছে যেন! পরবর্তীকালে আমি বাচ্চাগুলোকে আমার এক বন্ধুকে দিয়ে দিই, তিনি এমন এক অঞ্চলে নিয়ে গিয়ে তাদের ছেড়ে দেন যেখানে স্থানীয় অধিবাসিদের গরু মোষ না মেরেও তাদের দিব্যি চলে যাবে।

প্রায়ই শুনি, বন্য জন্তুদের স্বভাবই নাকি আগুনকে ভয় করা। কথাটা বহুকাল ধরেই বহুল প্রচারিত; ফলে অনেকেই একে ধ্রুব সত্য বলে ধরে নিয়েছেন। আমার নিজেরও সেই বিশ্বাসই ছিল এবং সেই বিশ্বাসে ভর করে আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম যে নিশ্চয় সিংহ তাঁবুর আগুনের কাছে আসতে সাহস করবে না। কিন্তু এই মাসাই রিজার্ভের এক রাত্রের অভিজ্ঞতার ফলে আমার সে ধারণা একেবারে পালটে গেছে।

সেদিন বিকেলে টোপ হিসেবে একটা জেব্রা মেরে সেটাকে বলদদের দিয়ে তাঁবুতে টেনে আনিয়েছি। সাধারণত কোন টোপ আমি চব্বিশ ঘণ্টার মত না পচিয়ে ব্যবহার করি না, লোকজনদের তাই বললাম সেটাকে তাঁবুর আগুনের কাছে ফেলে রাখতে, কারণ আমার নিশ্চিত ধারণা ছিল যে কোন জন্তুই আগুনের এত কাছে আসতে সাহস করবে না।

কিরাকাঙ্গানো গিয়েছিল কুকুর আর বলদগুলোকে নিয়ে পাশের এক গ্রামে রাত কাটাতে। সম্ভব হলে কক্ষনো আমি এইসব জন্তুদের তাঁবুতে রাখতাম না, কারণ যেসব সিংহ বা চিতাবাঘ তাঁবুর আশেপাশে ওত পেতে থাকে

তাদের গন্ধে, ভয় পেয়ে এইসব জন্তু দৌড়ে পালাতে চেষ্টা করে। গ্রামে হলে আর সে আশঙ্কাটা থাকে না। এইভাবে আমাদের দু-দুটো কুকুর চিতার খপ্পরে পড়েছিল। চিতার প্রিয় খাদ্য কুকুর, তাই কুকুরের সন্ধানে সে অনেক দূর পর্যন্ত ধাওয়া করতে প্রস্তুত।

কিরাকাঙ্গানো চলে যেতে কুলিরা কম্বলমুড়ি দিয়ে আগুনের কাছে শুয়ে রইল, আর আমি চেয়ারে বসে পাইপ টানতে টানতে আগুনের দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমার কল্পনা তখন চলে গেছে অনেক, অনেক দূরে, লাচার-এর বালুময় অঞ্চলে, আমাব কৈশোবেব রঙ্গমঞ্চে।

হঠাৎ খেয়াল হল, একেবারে ন-টা সিংহের মুখ আমার সামনে; ছায়া থেকে বেরিয়ে এসে তারা আমার দিকে মুখ ফিরিযে রয়েছে। নডতে চড়তে সাহস হল না। বন্দুকটা আমাব ঘরে বেখে এসেছি, একটা ডিজ লণ্ঠনও জ্বলছে সেখানে। সুতরাং নিস্পন্দ বসে ওদের লক্ষ্য করা ছাড়া আর কিছু করবার নেই। সিংহেরাও সতর্কভাবে লক্ষ্য কবছে আমাকে। কিছুক্ষণ পরে তারা ঘুমন্ত কুলিদের কাছ থেকে চলে গেল তাঁবুর আগুনের পাশে যেখানে জেব্রাটা পড়ে আছে সেখানে, তারপর সবিক্রমে ঝাঁপিয়ে পডল মরা জেব্রাটার উপর। বড বড চাবড়া মাংস এমন অবলীলাক্রমে খাবলে নিতে লাগল, যেন সেই জেব্রার চামড়া সামান্য কাগজের চেয়ে শক্ত নয়।

সাবধানে চেয়ার থেকে উঠে অত্যন্ত সন্তর্পণে একটু একটু করে আমার ঘরের দিকে অগ্রসর হলাম,—প্রতি পদক্ষেপের সঙ্গে আমার সর্বশরীর শিউরে শিউরে উঠছে। খাওয়া বন্ধ করে সিংহগুলো জ্বলন্ত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালো। বিরাট বিরাট সিংহগুলোর সামনে আমার নিজেকে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর মনে হল। দুই লাফেই ওরা আমায় ধরে ফেলতে পারে। ওদের থেকে মাত্র কয়েক ফুট তফাতে কুলিরা অঘোরে ঘুমোচ্ছে। ইচ্ছে হল এক দৌড়ে তাঁবুতে চলে যাই, কিন্তু সাহস হল না, পাছে নড়া-চডার আভাস পেয়ে সিংহেরা আক্রমণ করে বসে। অপেক্ষা করলাম যতক্ষণ না সিংহেরা আবার খাওয়া শুরু করে, তারপর একটু একটু করে এগিয়ে আমার ঘরের সামনে গিয়ে পৌছলাম। তাডাতাডি ঢুকে পড়েই তুলে নিলাম রাইফেলটা—রাইফেলের শীতল স্পর্শ আর কখনো আমার কাছে এমন স্বাগত মনে হয় নি!

এবার আবার নতুন একটা সমস্যা। গুলি যদি করি তাহলে তো কুলির দল চমকে লাফিয়ে উঠে আমার আর সিংহের মাঝখানটায় দাঁড়িয়ে পড়বে।

জেব্রাটাকে তাঁবুতে আনবার জন্যে যে শেকল তার গায়ে বাঁধা হয়েছিল সেটা খোলা হয় নি, ফলে তাকে খেতে গিয়ে সিংহেরা সেই শেকলে প্রচণ্ড আওয়াজ তুলল। ভয় হল, পাছে এই আওয়াজে কুলিরা জেগে ওঠে,—কারণ ঘুম ভেঙে হঠাৎ সিংহদের দেখে আতঙ্কবিহ্বল কুলির দল কী যে করে বসবে বলা যায় না। একপাল সিংহের মধ্যে একদল আতঙ্কিত কুলি—এ দৃশ্যের কল্পনা মোটেই সুখকর হল না।

শেষ পর্যন্ত ঠিক করলাম, গুলিই করব,—যা থাকে কপালে। সবচেয়ে বড় সিংহটাকে বেছে নিয়ে নির্ভুলভাবে গুলি করলাম, সঙ্গে সঙ্গে পড়ে গেল সিংহটা। গুলির শব্দে অন্য সিংহগুলো একবার পেছিয়ে গেল একটু, তারপর আবার জেব্রাটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এদিকে কুলিরা যেভাবে সমানে ঘুমিয়ে চলেছে—মুহূর্তের জন্যে আমার সন্দেহ হল, ওরা মারাই গেছে কি না।

লক্ষ স্থির করে সিংহের দলে গুলি করা শুরু করলাম। রাইফেল ছোড়ার সঙ্গে সঙ্গে পেছন দিকে যে হাওয়া ছিটকে আসে, তাতে ডিজ লণ্ঠনটা গেল নিভে। চারটে সিংহ মরে পড়ল,—শেষেরটার বুকের একটু নিচের দিকে গুলিটা লেগেছিল, সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠেছিল সে; স্প্রিং-এর পুতুলের মত থপ্-থপ্ করে লাফাতে শুরু করেছিল। আর একটা গুলিতে তাকে শেষ করে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে বাকি সিংহগুলো অন্ধকারের আবছায়ার মধ্যে সরে গেল। এগিয়ে গেলাম একটু। ভাল করে লক্ষ্য স্থির করে একটা বড় সিংহীকে গুলি করলাম। গুলি লাগতেই সিংহীটা ল্যাজটা উপর দিকে তুলেই সঙ্গে-সঙ্গে মুখ ঘুরিয়ে অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেল আর বাকি সিংহগুলো তার পিছু-পিছু চলল।

আশ্চর্য, এত কাণ্ডতেও কিন্তু কুলিদের ঘুম ভাঙল না,—সিংহদের গর্জন বা আমার রাইফেলের আওয়াজ—কিছুতেই তাদের নিদ্রার ব্যাঘাত হল না। ওদের আশ্চর্য ঘুমের পরিচয় আগেও পেয়েছিলাম বটে, কিন্তু এমন অদ্ভুত ব্যাপার আমি কখনো দেখি নি।

আগুনটা জোর করে দিয়ে কুলিদের পায়ের তলায় লাথি মারতে ওদের একজনের ঘুম ভাঙল। প্রথমে সে হাত পা ছড়ালো, তারপর মাত্র কয়েক ফুটের মধ্যে সিংহদের পড়ে থাকতে দেখে আতঙ্কে অস্থির হয়ে এক লাফ। পাগলের মত চেঁচাতে চেঁচাতে সে আমার ছুটল ঘরের দিকে, আর বাকি সকলে ঘুম ভেঙে কি হয়েছে না জেনেই তার পিছু নিল। তাঁবুতে পৌঁছে আমার

খুব কাঁপতে শুরু করল। তারপর ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতে আবার কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঘরের মেঝেয় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। আর যাই হোক, তারা যে কখনো অনিদ্রায় ভুগবে না এ কথা বেশ জোর করেই বলা চলে।

পরদিন সকালে কিরাকাঙ্গানো কুকুরগুলো নিয়ে ফিরে এলে আমি তক্ষুনি তাদের নিয়ে আহত সিংহীটার চিহ্ন ধরে অগ্রসর হলাম। কুলিগুলো তাঁবুতে রইল, অমার্জিত ভাষায় গান গাইতে গাইতে সিংহদের ছাল ছাড়ানোর কাজে আর সিংহদের পেট থেকে, হৃৎপিণ্ড থেকে আর মূত্রাশয় থেকে তারা সযত্নে চর্বি বের করতে থাকল। এইটুকু সময়ের মধ্যেই সেই চর্বিতে পচন ধরেছিল। ওদের বিশ্বাস, সিংহের চর্বির পরিমাণ থেকে বোঝা যায় সন্তান পুত্র হবে, না কন্যা হবে। এক চামচ চর্বি খেলে হবে পুত্র, আর আধ চামচ খেলে হবে কন্যা। সিংহের চামড়ার উপর তাদের কোন লোভ নেই, তাদের কাছে যত কদর সে হল চর্বির।

তাঁবু থেকে একশো গজ অগ্রসর হবার পর রক্তের চিহ্ন চোখে পড়ল। সিংহটার আঘাত হয়েছিল গুরুতর; চলতে চলতে অনেকবার তাকে শুয়ে বিশ্রাম করতে হয়েছে, সঙ্গীরা তার জন্যে অপেক্ষা করেছে। সেই চিহ্ন ধরে কিছুক্ষণ হালকা ঝোপের মধ্যে দিয়ে চললাম। শিকারের পক্ষে আদর্শ এ জায়গা, কারণ প্রায় কুড়ি গজ পর্যন্ত দৃষ্টি চলে এখানে। ব্যগ্রভাবে এগিয়ে চললাম, আশা হল, হয়ত এবার আহত সিংহীর দেখা পাব। অগ্রসর হতে হতে কিন্তু শেষ পর্যন্ত এক অত্যন্ত ঘন ঝোপের মধ্যে গিয়ে পৌঁছলাম। বিশ্রী পরিস্থিতি!

ঝোপটার মধ্যে মৃত্যুর স্তব্ধতা। একটা পাখির শব্দ পর্যন্ত নেই। নিশ্চিত বুঝলাম, আমরা আহত সিংহীর খুব কাছেই এসে পড়েছি,—যেকোন মুহূর্তে সে উপর দিকের কোন আড়াল থেকে আক্রমণ করে বসতে পারে। এদিকে কুকুরগুলো ক্রমেই অস্থির হয়ে উঠছে, এয়ারডেলগুলো তো উত্তেজনায় ছটফট করছে। শেষ পর্যন্ত তাদের বললাম এগিয়ে যেতে। লাফাতে লাফাতে তারা ঝোপের মধ্যে প্রবেশ করল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সামনের ঝোপ থেকে ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধ গর্জন শোনা গেল। বাকি কুকুরগুলোও আমায় অতিক্রম করে একটার পর একটা প্রবেশ করল সেই ঘন ঝোপের মধ্যে। সেই পরিচিত লড়াইয়ের শব্দ আমার কানে আসছে,—সিংহের গভীর গর্জন ও কর্কশ আওয়াজের সঙ্গে কুকুরের ঘেউ ঘেউ চিৎকার।

কিরাকাঙ্গানো আর আমি সেই নিবিড় ঝোপ ঠেলে অগ্রসর হলাম। মাত্র বারো পা অগ্রসর হয়েছি কি না সন্দেহ, হঠাৎ দেখলাম, একটা গোল গর্তের ভিতরে লম্বা লম্বা ঘাসের মধ্যে শুকনো রক্তের চিহ্ন। সিংহী তাহলে এখানে থেমে বিশ্রাম করেছিল। সেই গর্তের ধারে আমার দুই দুঃসাহসী এয়ারডেল কুকুর মরে পড়ে রয়েছে, তখনো তাদের চোখ মুখ খোলা। সিংহীটাকে আক্রমণ করে তারাই তার সমস্ত আক্রোশ নিজেদের উপর নিয়েছে। ওদেরই জন্যে এযাত্রা কিরাকাঙ্গানো আর আমি প্রাণে বেঁচে গেলাম, কারণ সিংহীটা এমন চমৎকারভাবে লুকিয়ে ছিল যে কিছুতেই আমরা সময় থাকতে তাকে দেখতে পেতাম না।

বাকি কুকুরগুলো তখনো তার সঙ্গে লড়াইয়ে ব্যস্ত, ঝোপঝাড় ভেঙে তাদের দৌড়ের শব্দও আমাদের কানে এল—থেমে দাঁড়িয়ে মহা বিক্রমে ঘেউ-ঘেউ করছে যখনই সিংহী কোণঠাসা হয়ে রুখে দাড়াচ্ছে। সেই শব্দ অনুসরণ করে আমরা অগ্রসর হলাম। দেখলাম কুকুরগুলো সিংহীকে ঝোপ থেকে তাড়িয়ে ফাঁকা জায়গায় নিয়ে আসছে; আমরাও চললাম পিছু পিছু। মাসাইটা তার বল্লম উঁচিয়ে চলেছে, অত লম্বা বল্লমটা অদ্ভুত নিপুণতার সঙ্গে কেবল দুটো আঙুলের উপর ধরে রাখা, তাঁর দেহের প্রতিটি মাংসপেশী শক্ত কম্পমান।

একটা কলি কুকুর খোঁড়াতে খোঁড়াতে এল আমার কাছে,—সমস্ত শরীর তার রক্তাক্ত, ছিন্নভিন্ন। যখন দেখলাম কোনমতেই তাকে বাঁচানো সম্ভব নয়, এক গুলিতে তাকে এই অসহ্য যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিলাম। গুলির শব্দ পেয়েই সঙ্গে সঙ্গে আহত সিংহী একগোছা মরা ঘাসের ভিতর থেকে এক লাফে আমাদের মাত্র কয়েক ফুটের মধ্যে এসে গেল, আর ঠিক সেই মুহূর্তেই আরও একটা সিংহী আমার ডানদিকের আর-একটা ঝোপ থেকে বেরিয়ে আমাদের তাড়া করল।

তখন আর ভাববার সময় নেই, দুটো সিংহীই প্রায় আমাদের উপর এসে পড়েছে—দুটো দু-দিক থেকে। দ্বিতীয়টাকে লক্ষ্য করে আমি গুলি করলাম, কারণ তারই রোখ মনে হল বেশি। গুলিটা গিয়ে লাগল তার বাঁ চোখের আধ ইঞ্চি উপরে। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই কিরাকাঙ্গানো তার বল্লমটা প্রথম সিংহীটার শরীরে গেঁথে দিল। ভয়ঙ্করভাবে ফিরে দাঁড়ালো সিংহী, বল্লমের ডাণ্ডাটা দাঁতে চেপে ধরে টেনে বের করে নিতে চেষ্টা করল।

কিরাকাঙ্গানো তার বেল্ট থেকে তার দু-মুখো ছুরিটা বের করবার চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু ছুরিটা বের করবার আগেই আমার দ্বিতীয় গুলিটা তার কাঁধে গিয়ে গিঁথল।

কিরাকাঙ্গানো আর আমি নীরবে হাতে হাত মেলালাম। ও না থাকলে আজ কোন-না-কোন সিংহের কবলে আমায় মরতে হত, সন্দেহ নেই। আমি যত স্থানীয় শিকারী দেখেছি, কিরাকাঙ্গানো নিঃসন্দেহে তাদের মধ্যে যেমন সবচেয়ে সাহসী, তেমনি বিপদে স্থিরমস্তিষ্ক।

এদিকে মাসাই রিজার্ভে আমার মেয়াদ ফুরিয়ে আসছে। ইতিমধ্যে আমি সত্তরটা সিংহ বধ করেছি, কিন্তু তবুও গ্রামবাসিদের দুর্দশার অবসান হয়নি। ক্যাপ্টেন রিচি বলেছিলেন সিংহগুলোকে একেবারে শেষ করতে, তাই ঠিক করলাম একটা বোমার আড়ালে থেকে রাত্রে ওদের গুলি করে মারব। ব্যাপারটা বিশেষ খেলোয়াড়সুলভ নয় বটে, কিন্তু খেলোয়াড়ি মনোভাব নিয়ে তো মাসাই রিজার্ভে আসিনি, এসেছি বিশেষ এক কাজ নিয়ে। তাই সেই মতলব অনুযায়ী রাত্রে সিংহ শিকারের ব্যবস্থায় প্রবৃত্ত হলাম।

একটা জেব্রা মেরে সমতল ভূমির উপর দিয়ে অনেক মাইল পর্যন্ত টেনে এনে যেখানে রাখা হল, সেখান থেকে তার গন্ধ একটা ঝোপের মধ্যে গিয়ে পৌছবে সেখানে সিংহ থাকা সম্ভব। তা ছাড়া রাত্রে এ অঞ্চলে চলা-ফেরা করতে অন্য সিংহেরাও কুকুরের মত এই জেব্রার চিহ্ন অনুসরণ করে টোপটার কাছে আসতে পারে। এভাবেও কিছু সিংহ পাওয়া সম্ভব হতে পারে।

ঝোপ ঝাড় থেকে ডালপালা এনে কুলিরা ঘোড়ার খুরের আকৃতির একটা বোমা টোপটার কাছে তৈরি করল। ঠিক হল আমি আর কিরাকাঙ্গানো সেখানে রাত কাটাবো। জেব্রাটাকে সেখানে এমন করে বেঁধে রাখা হল যাতে সিংহের পক্ষে তাকে টেনে নিয়ে যাওয়া সম্ভব না হয়। অনেকবার দেখা গেছে যে বোমার ভিতর থেকে সামান্য নড়াচড়া করতেই সিংহ টোপ থেকে পালিয়েছে; অনেকদিন পর্যন্ত আমি বুঝতে পারি নি কী করে তারা জানতে পারে যে ভিতরে মানুষ আছে। পরে জেনেছিলাম, মাথার উপর দিয়ে তারার আলো আসায় সেই আলোয় মানুষের যে ছায়া পড়ে সেই ছায়ার নড়া-চড়া তারা দেখতে পায়। তাই বোমার উপরটা কাঁটা-ঝোপ দিয়ে এমনভাবে ঢেকে দেয়ার ব্যবস্থা হল যাতে কোনরকম আলোই ঢুকতে না পারে।

প্রস্তুতি পর্ব শেষ হতে আমরা দু-জনে গিয়ে বোমায় আশ্রয় নিলাম।

একটা টর্চ নিয়ে ওকে দেখিয়ে দিলাম কিভাবে গুলি করার মুহূর্তে টর্চের আলো শিকারের উপর ফেলতে হবে। টর্চটা পেয়ে সে মুগ্ধ হয়ে গেল। সেটা নিয়ে এমন নাড়াচাড়া করতে লাগল আর দোলাতে থাকল যে শেষ পর্যন্ত তাকে বারণ করতে হল। দুটো গুলিভরা রাইফেল পাশে রেখে দিলাম, তারপর কিছু গুলি পকেটে আর কিছু গুলি বেল্টে ভরে সেটা আমার সামনে রেখে দিলাম যাতে যেকোন অবস্থাতেই গুলির অভাব বোধ করতে না হয়।

অন্ধকার হয়ে এলে অনেকগুলো হায়েনা চোরের মত এল টোপটার কাছে, তাদের পিছু পিছু দুটো শেয়াল। ক্ষুধার্ত চোখে শেয়ালদুটো জেব্রার দিকে তাকিয়ে রইল আর হায়েনারা খুব সন্তর্পণে একবার এগিয়ে একবার পেছিয়ে লক্ষ্য করে দেখল কোথাও কোন বিপদের সম্ভাবনা আছে কি না। শেষ পর্যন্ত একটা হায়েনা দৌড়ে এসে জেব্রাটার বেরিয়ে-আসা নাড়িভুঁড়িতে এক কামড় দিয়েই চিৎকার করতে করতে খানিকটা দূরে পালালো। বাকি সকলেও দেখলাম এবার এগিয়ে আসছে। তারা এসে টোপটা ধরে টানাটানি শুরু করল। তারপর হঠাৎ সবাই তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেল, আর শেয়ালদুটো নির্ভয়ে এগিয়ে এল। এর অর্থ এই বুঝতে হবে যে ওরা সিংহের সাড়া পেয়েছে। রাইফেলটা বাগিয়ে ধরে আমি তৈরি হয়ে রইলাম। কয়েক মিনিটের মধ্যেই নিচু, গভীর নিশ্বাসের শব্দ বোমার পেছন থেকে আমার কানে এল। এ শব্দ ভুল হবার নয়,—সিংহের নিশ্বাস ফেলার শব্দ, আমাদের ঘিরে ঘুরে গিয়ে তারা জেব্রাটার উপর পড়েছে। ফিস্-ফিস্ করে কিবাকাঙ্গানোকে বললাম টর্চের আলো ফেলতে। কিন্তু অবাক হয়ে শুনলাম তেমনি ফিস্-ফিস্ করে সে বলছে, 'তাবাল্লো'—মাসাই ভাষায় যার মানে, 'দেরি করুন'। ওর দিকে তাকিয়ে দেখলাম, ভয়ে সে অসাড় হয়ে গেছে। রাতের অন্ধকারে এভাবে বোমার মধ্য থেকে শিকার করার অভ্যাস না থাকায় সে এমন ঘাবড়ে গেছে, অথচ দিনের আলোয় সে একটা বল্লম মাত্র সম্বল করে নির্ভয়ে সিংহের সম্মুখীন হতে প্রস্তুত।

টর্চটা তার হাত থেকে নিয়ে একটা মোচড় দিয়ে টোপের উপর আলোক-পাত করতে এক অপূর্ব দৃশ্য আমার চোখে পড়ল। আমাদের মাত্র কয়েক গজ সামনে গোটা-কুড়ি সিংহ আর সিংহী, কোনটা টোপটার পাশে দাঁড়িয়ে, কোনটা বা শুয়ে পড়ে জেব্রাটাকে চাটছে। দুটো বিরাট কালো-কেশর সিংহ একদৃষ্টে সেই আলোর দিকে তাকিয়ে রয়েছে,—তাদের মুখে চোখে

বেপরোয়া ভাব, তাদের কেশরে মরা জেব্রাটার পেটের ময়লা আর রক্ত ; কারণ তারা খাওয়া শুরু করেছিল। কিরাকাঙ্গানো তো এখন রীতিমত থর-থর করে কাঁপছে, যদিও আমি জানি যে গুলি শুরু হতেই তার এ আতঙ্ক কেটে যাবে। একটা কাঁটাগাছের দু-ডালের মধ্যে টর্চটা এমনভাবে রাখলাম যাতে টোপের উপর আলোটা পড়ে, তারপর ঝোপের একটা ফাঁকে রাইফেলটা গলিয়ে দিয়ে দুটো পুরুষ-সিংহের মধ্যে যেটা বড় সেটাকে লক্ষ্য করে গুলি করলাম। সঙ্গে সঙ্গে সিংহদের মধ্য থেকে সমস্বরে বীভৎস চিৎকার শুরু হল। আবার গুলি করলাম, তারপর আবার একবার। ইতিমধ্যে সিংহেরা টর্চের আলোর পরিধির বাইরে চলে যাওয়ায় আমি রাইফেলে গুলি ভরবার জন্যে থামলাম। ইতিমধ্যে কিরাকাঙ্গানোর বিহ্বল ভাব কেটে যেতে শুরু করেছে। খানিকটা তামাক তাকে দিলাম চিবুবার জন্যে। মাসাইরা তামাক ভালবাসে। তামাকের ঝাঁঝে মনে হল সে অনেকটা প্রকৃতিস্থ হয়েছে, আর তা ছাড়া তিন তিনটে মরা সিংহ দেখার পরে কোন মাসাইয়েরই আর স্থির হয়ে থাকা সম্ভব নয়। সিংহের দল ইতিমধ্যে ফিরে আসতে শুরু করেছে। কিরাকাঙ্গানো টর্চটা ধরে একটার পর একটা সিংহের উপর আলো ফেলতে শুরু করল। উত্তেজনার বশে সে এত তাড়াতাড়ি করতে লাগল যে ভাল করে লক্ষ্য স্থির করারও সময় পেলাম কি না সন্দেহ। যাই হোক, প্রতি গুলিতে একটা করে সিংহ মারা পড়ল। ব্যাপারটা অত্যন্ত নিষ্ঠুর সন্দেহ নেই, কিন্তু এর প্রয়োজন ছিল। সিংহেরা গুলির দিকে কোন লক্ষ্য করছে না, কেবল পাশের মৃত সিংহটাকে একবার শুঁকে নিয়ে আবার তাদের খাওয়া শুরু করছে।

জেব্রাটাকে ঘিরে ইতিমধ্যে দশটা সিংহ মরে পড়ে রয়েছে। তারপর একটা অপূর্ব কালো-কেশর সিংহ কী মতলবে জানি না একপাশ থেকে আমাদের বোমার কাছে চোরের মত এগিয়ে এল। সেখানে দাঁড়িয়ে সে কয়েকটা রক্ত-জমাট-করা গর্জন ছাড়ল, সেই গর্জনে মাটি পর্যন্ত যেন কেঁপে কেঁপে উঠল। এই আচমকা গর্জনে বাকি সিংহগুলো ভয় পেয়ে গেল, আস্তে আস্তে চলে গেল সবাই ; কালো-কেশর সিংহটা চলল তাদের পিছু পিছু।

আমি চাই না সিংহের চমৎকার চামড়াগুলো বনের মুর্দাফরাস হায়েনা নষ্ট করুক। যখন আমি নিশ্চয় হলাম যে সিংহেরা সবাই চলে গেছে, কিরাকাঙ্গানোকে বললাম টর্চটা জ্বেলে রাখতে, আর আমি মরা সিংহগুলোকে বোমার কাছাকাছি টেনে টেনে আনলাম। মাসাইটার সমস্ত

আতঙ্কের ভাব এতক্ষণে কেটে গেছে, প্রচুর উৎসাহ জেগেছে। তখন আমি বোমা ছেড়ে মরা সিংহগুলোর কাছে যাচ্ছি—প্রায় পৌঁছে গেছি,—এমন সময় হঠাৎ আলোটা নিভে গেল।

চিৎকার করে কিরাকাঙ্গানোকে টর্চটা জ্বালতে বলে আমি আরও কয়েক পা অগ্রসর হলাম। হঠাৎ আমি হুমড়ি খেয়ে পড়লাম একটা সিংহের উপর। তার শরীর তখনও গরম রয়েছে। একটা চাপা নিশ্বাসের শব্দ আমার কানে এল, সেইসঙ্গে নিম্নস্বরে একটা বিরক্তিকর আওয়াজ। বেঁচে আছে সিংহ! এক লাফে ছিটকে বেরিয়ে এসে আমি প্রাণপণে বোমা লক্ষ্য করে ছুটলাম,—প্রতি মুহূর্তেই আশঙ্কা হচ্ছে এই বুঝি সিংহটা আমার উপর লাফিয়ে পড়ে! যাই হোক, বোমায় ঢুকেই আমি দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিলাম। দেখি, টর্চটার বিভিন্ন টুকরোগুলো নিয়ে কিরাকাঙ্গানো বসে আছে। অদ্ভুত জিনিসটা দেখে তার কৌতূহল জেগেছিল, তাই খুলে দেখতে গিয়েছিল কিভাবে জ্বলে সেটা, আর এদিকে আমি অন্ধকারে আহত সিংহের উপর হোঁচট খাচ্ছি।

বেশ খানিকটা ধমক দিলাম ওকে, ও ক্ষমা প্রার্থনা করল। টর্চটা আবার ঠিক করে আমি এক গুলিতে আহত সিংহটাকে শেষ করলাম। ভেবে দেখলাম, এখন কেবল অপেক্ষা করে থাকা ছাড়া আর কিছু করবার নেই। আরও দু-দল সিংহ সে রাত্রে টোপের লোভে এসেছিল। ভোর হতে যে দৃশ্য আমার চোখে পড়ল, তেমন দৃশ্য কেউ কখনো দেখেছে বা কখনো দেখবে কি না সন্দেহ। আঠারোটা সিংহ আমাদের সামনে মরে পড়ে রয়েছে। রাতের হৈ-চৈয়ের পর পরিবেশটা অদ্ভুত শান্ত মনে হল। কোথাও কোন নড়াচড়ার চিহ্ন নেই, কয়েকটা পোকা শুধু মরা সিংহগুলোর উপর ভন-ভন করে উড়ছে। ভাল করে লক্ষ্য করে যখন দেখা গেল আর কোন আহত সিংহ আশেপাশে নেই, আমরা বোমা থেকে বেরিয়ে মরা সিংহগুলোর মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালাম। বলতে বাধ্য হচ্ছি, এই দৃশ্য দেখে আমার অত্যন্ত দুঃখ হল; যদিও অবশ্য আমি জানি এদের মরতেই হবে, নতুবা মাসাইদের দুর্দশার অবধি হবে না। অস্বাভাবিক কারণে যে অঞ্চলের সিংহের এত সংখ্যাবৃদ্ধি হয়েছে, এখন অস্বাভাবিক উপায়েই তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। মাসাইরা যতই দুঃসাহসী বা যতই কুশলী হোক, এ সমস্যার সমাধান করা তাদের নিজেদের থেকে সম্ভব নয়।

আজ সরকার থেকে বল্লমধারী মাসাইদের সিংহ-শিকার নিষিদ্ধ, অর্থাৎ প্রাম

প্রথম যখন আমি মাসাই রিজার্ভে আসি, তখন কোন বাধা-নিষেধ ছিল না; অসংখ্য তরুণ মাসাই তাদের ঢাল বল্লম নিয়ে নখদন্তের কবলে প্রাণ দিয়েছে। ঐ লড়াই প্রত্যক্ষ করেছে এমন মাসাইও আজ অত্যন্ত অল্প। পরবর্তী অধ্যায়ে তাই বলব, কেমন করে মাসাইরা সিংহের সঙ্গে লড়াই করত।

মাসাই বল্লমধারী—বীরের সেরা বীর

মাসাইদের সিংহ-শিকার আমি প্রথম দেখি যখন আমি লেক মাসাদির নিকটবর্তী মাসাইদের এক গ্রামে ছিলাম। আগের রাতে একটা সিংহ গ্রামেব চারিদিকে ঘেরা বারো ফুট উঁচু বোমা ডিঙিয়ে গ্রামে ঢুকে একটা গরু মুখে করে সেই গরুশুদ্ধ আবার ঐ বাধা ডিঙিয়ে চলে যায়। জানি এ কথা বিশ্বাস করা কঠিন, কারণ সিংহের ওজন যেখানে পাঁচ মণের বেশি নয়, গরুর ওজন সেখানে প্রায় তার দ্বিগুণ। অথচ এই প্রায়-অবিশ্বাস্য ব্যাপারই সিংহেব কাছে অবলীলা মাত্র,—শেয়াল যেমন স্বচ্ছন্দে মুরগির ছানা নিয়ে পালায় তেমনি।

অদ্ভুত কৌশলে সিংহ নিজের শরীরের খানিকটা তার শিকারের দেহের নিচে ঠেলে দিয়ে সেই অবস্থায় শিকারের গলা কামড়ে ধরে তার শরীরের সমস্ত ওজনটা নিজের পিঠে তুলে নেয়। বোমার উপর দিয়ে লাফাবার সময় তার ল্যাজটা একেবারে শক্ত হয়ে ওঠে, মনে হয় তা তার ভারসাম্য বজায় রাখার কাজ করে। মাসাইরা বলে, যে সিংহের ল্যাজ নেই তার পক্ষে এ অসম্ভব।

পরদিনই আমি সিংহের চিহ্ন ধরে অগ্রসর হতে প্রস্তুত, কিন্তু ওদের মোরানরা খানিকটা অবজ্ঞার সঙ্গেই বললে যে আমার সাহায্যে তাদের প্রয়োজন নেই, নিজেরাই তারা যা ব্যবস্থা করার করবে। একদল মানুষের পক্ষে যে কেবলমাত্র বল্লম দিয়ে কোন জোয়ান সিংহ বধ করা সম্ভব, এ বিশ্বাস করা তখন আমার পক্ষে ছিল কঠিন। বন্দুক নিয়ে ওদের সঙ্গে যাবার অনুমতি প্রার্থনা করতে ওরা ভদ্রভাবেই সে প্রার্থনা মঞ্জুর করল। আমার ৪১৬নং রিগবি ম্যাগাজিন রাইফেলটা গুলি ভরে নিলাম, কারণ কোন সিংহ বেরিয়ে এলে আমাকেই যে তাকে মারতে হবে, এতে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না।

ভোর হতেই বেরিয়ে পড়া গেল—আমি চললাম বল্লমধারীদের পিছু পিছু।

সংখ্যায় ওরা দশ জন —পূর্ণবয়স্ক, অপূর্ব স্বাস্থ্যের অধিকারী ; ছিপছিপে শরীর, একজনও লম্বায় ছ-ফুটের কম নয়। হাত পা চালানোব সুবিধের জন্যে তারা তাদের গলার কাপড খুলে বাঁ বাহুতে জডালো। ঝলমলে রঙে রাঙানো ঢালগুলো এমনভাবে কাঁধেব উপর ফেলা যাতে পডে না যায়। তাদের ডান-হাতে বল্লম, তাদের মাথার পাগডিতে উটপাখিব পালক, যেন যুদ্ধে চলেছে তারা ; পায়ের গোডালিতে লোমশুদ্ধ পশুর চামডা। এ ছাড়া আর কোন আবরণ তাদের অঙ্গে নেই।

সিংহের চিহ্ন দেখা যেতেই মোবানরা তা অনুকবণ করে অগ্রসর হল। সাবা বাত ধরে গরুটাকে খেয়ে সিংহ এখন কোন গভীর ঝোপেব আডালে শুয়ে আছে। ঝোপ ঝাডেব মধ্যে এলোপাথাডি ঢিল মাবতে মারতে এক সময় সিংহের ক্রুদ্ধ গর্জন শোনা গেল, বোঝা গেল ঢিল তার গায়ে লেগেছে। সিংহেব ডাক শুনে যখন তার অবস্থিতি সম্বন্ধে একটা আন্দাজ পাওয়া গেল, প্রচুব উৎসাহের সঙ্গে সবাই সেখানে ঢিল ছুডতে শুরু করল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঝোপের মধ্যে নডাচডার লক্ষণ দেখা দিল। হঠাৎ সিংহটা আমাদের থেকে একশো গজটাক দূরে ছিটকে বেরিয়ে এল আব প্রান্তরের উপর দিয়ে লাফাতে লাফাতে পালাতে শুরু করল, দৌডের তালে তালে তার ভরা পেট তুলছে।

সঙ্গে সঙ্গে খুব হৈ-হল্লা করতে করতে সবাই লম্বা লম্বা হলদে ঘাসের উপর দিয়ে সবেগে তার পিছু ধেয়ে চলল। ভুবিভোজনের ফলে সিংহেব গতি ব্যাহত হল ; সে আর বেশি দূর যেতে পারল না, কোণঠাসা হয়ে দাঁড়ালো। বল্লমধারীরা তখন চারিদিকে ছডিয়ে পডে ঘিরে দাঁডালো তাকে। এই বৃত্তের মাঝখানে দাঁডিয়ে সিংহ একবার এদিকে একবার ওদিকে তাকাতে লাগল আর বল্লমধারিদের তার দিকে ধীরে ধীরে এগোতে দেখে এমনভাবে ক্রোধ প্রকাশ করতে লাগল যে শুনলে গায়ের রক্ত জমাট হয়ে যায়।

সিংহ তারচল্লিশ গজ পর্যন্ত তাদের অগ্রসর হতে দিল। আমি জানি এবার সে আক্রমণের উদ্যোগ করছে। মাথাটা নিচু করে সামনে প্রসারিত দুই থাবার উপর নিয়ে এল, আর পেছন দিকটা সামান্য নিচু করে পেছনের পা দুটো বেশ খানিকটা সামনে নিয়ে গেল যাতে খুব জোরে লাফাতে পারে আর পেছনের পায়ের থাবা দিয়ে দৌডবীরের মত মাটি আঁচডাতে লাগল যাতে দৌড শুরু করতে গেলেই পা পিছলে না যায়।

সিংহটার বাঁকানো ল্যাজটার দিকে আমি আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখলাম, কারণ আমি জানি, আক্রমণের ঠিক আগে সিংহ তার ল্যাজের অগ্রভাগটা সজোরে মাটিতে সাপটাতে থাকে আর তৃতীয়বার সাপটানোর সঙ্গে সঙ্গেই অবিশ্বাস্য বেগে আক্রমণ করে বসে।

সিংহ যে আক্রমণের উদ্যোগ করছে মোরানদেরও তা অজানা নয়। সকলের উদ্যত হাত একসঙ্গে পেছনে চলে গেল,—উত্তেজনার আতিশয্যে তাদের কাঁধের মাংসপেশী থর-থর করে কাঁপতে লাগল, বল্লমের উপর সূর্যের আলোর ঢেউ খেলে গেল। একটা পেরেক পর্যন্ত ওদের শরীরে বিঁধিয়ে দিলেও বোধহয় ওরা এখন তা অনুভব করতে পারবে না।

হঠাৎ সিংহ ল্যাজ সাপটাতে শুরু করল। এক—দুই—তিন! সঙ্গে সঙ্গে সে বৃত্তাকারে ঘুরেই মোরানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। মুহূর্তমধ্যে গোটাছয়েক বল্লম সবেগে তার উপর ধাবিত হল। একটা বল্লম তার কাঁধে বিদ্ধ হয়েছিল, মুহূর্তপরেই দেখা গেল, কাঁধের চামড়া ভেদ করে অপর দিকের চামড়ায় আটকে বল্লমের মুখটা ভেঙে গেছে। সিংহের আক্রমণের বেগ কিন্তু এতেও একটুও ব্যাহত হল না,—তার গতিপথে ছিল এক তরুণ শিকারী,—এই তার জীবনের প্রথম শিকার অভিযান। একটুও ঘাবড়ালো না সে, আক্রমণ প্রতিহত করার জন্যে ঢালটা সামনে ধরল আর শরীরটা একটু পেছন দিকে বেঁকিয়ে নিল যাতে বল্লম নিক্ষেপের সময় তার সমস্ত শরীরের ওজন বল্লমটার উপর পড়ে। ছেলেটিকে লক্ষ্য করে লাফিয়ে উঠল সিংহ। থাবার এক আঘাতে এমন অবলীলাক্রমে তার ঢালটা ছিটকে ফেলে দিল, যেন সেটা পিসবোর্ডের তৈরি। তারপর পেছনের পায়ে ভর করে সামনের থাবা বাড়িয়ে চেষ্টা করল ছেলেটিকে কাছে টেনে নিতে।

ছেলেটির বল্লম তার বুকে প্রায় দু-ফুট বসে গেল। মারাত্মকভাবে আহত হয়ে সিংহ ছেলেটির উপর লাফিয়ে পড়ল,—তার পেছনের পায়ের থাবা তার পেটের উপর শক্ত করে চেপে রাখল আর সেইসঙ্গে দাঁত দিয়ে তার কাঁধ কামড়ে ধরল।

অত বড় সিংহটার ভার সামলাতে না পেরে তরুণ যোদ্ধা পড়ে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে মোরানরা সকলে একযোগে মুমূর্ষু সিংহটার উপর পড়ল। এত কাছ থেকে আর বল্লম ব্যবহার করা সম্ভব নয়, তাই তারা তখন তাদের দু-মুখো সিমি বার করল—সিমি হল প্রায় দু-ফুট লম্বা বেশ ভারি ছোরা। নিজেদের

মধ্যে ধাক্কাধাক্কি করতে-করতে ওরা উন্মত্তের মত সিংহের মাথায় আঘাতের পর আঘাত করে চলল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সিংহের মাথাটা টুকরো-টুকরো হয়ে গেল, আর একজনের এক প্রচণ্ড আঘাতে সিংহের মাথার খুলিটা একেবারে খুলে গেল,—যদিও অবশ্য আমার যথেষ্ট সন্দেহ, আদৌ সিংহটা তখনো পর্যন্ত জীবিত ছিল কি না।

এই লড়াইয়ের সময় একটিবারও আমি বন্দুক ব্যবহারের সুযোগ পাইনি,—এমন অবস্থায় বন্দুক ব্যবহার করা অত্যন্ত বিপজ্জনক, কারণ মোরানরা যেভাবে সিংহকে ঘিরে ফেলেছিল তাতে গুলি চালাতে গেলে কারুর না কারুর গায়ে তা লেগে যাওয়ার প্রচুর সম্ভাবনা।

আহত ছেলেটিকে পরীক্ষা করে দেখলাম। অত গুরুতর আঘাত সে পেয়েছে, অথচ সেদিকে তার কিছুমাত্র গ্রাহ্য নেই। ছুঁচ আর সুতো দিয়ে আমি তাকে সেলাই করে দিলাম, কিন্তু তাতেও সে একটুও ব্যথা অনুভব করল না—যেন আমি আদর করে তার পিঠ চাবড়ে দিচ্ছি।

বল্লমের খোঁচায় সিংহের চামড়া এমন ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে যে স্মারক হিসেবে সেটার আর কোন মূল্যই নেই। হলদে লোম নোংরায় আর রক্তে মাখামাখি; সিংহের রাজমহিমার আর কিছুমাত্র অবশিষ্ট নেই।

মানিয়াওয়ায় (গ্রামে) ফিরে আহত ছেলেটিকে প্রথমে প্রচুর পরিমাণে গোমাংস, আর তারপরে জোলাপ হিসেবে গরুর রক্ত খাওয়ানো হল যাতে আবার তার পেটে খাওয়ার জায়গা হয়। আরও কয়েকজন মোরান আহত হয়েছিল, কিন্তু ঘা যাতে বিষিয়ে যেতে না পারে তার জন্যে কোন ব্যবস্থাই তারা করল না—ক্ষতগুলো কেবল জল দিয়ে ধুয়েই ক্ষান্ত হল। পরবর্তীকালে কোন-কোন মাসাই সমাজে দেখেছিলাম 'অলকিলোরাইট' নামে একটা গাছের ছাল ভিজিয়ে ক্ষতে লাগাতে—তার রঙটা পটাশ পার্মাঙ্গানেটের মত। এতে বোধহয় ঘা বিষিয়ে ওঠে না, তাড়াতাড়ি সেরে যায়।

আশা করি সেরে উঠেছিল ছেলেটি। সেদিনের শিকারের সেরা সম্মান যে তারই প্রাপ্য হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

মাসাইদের মতে মানুষের সবচেয়ে বড় বীরত্বের কাজ হল সিংহের ল্যাজ ধরে টেনে রাখা, যাতে অন্যান্য মোরানরা বল্লম আর সিমি নিয়ে তাকে ঘিরে ফেলতে পারে। এই দুঃসাহসিক কাজে যে চারবার কৃতকার্য হয় তার উপাধি হয় মেলোম্বুকি, তার উপরে সে সর্দারের আসনও পায়। আরও একটা অলিখিত

আইন হল, এই সম্মান যে পেয়েছে সর্বদাই তাকে যেকোন জীবিত প্রাণীর সঙ্গে লড়াইয়ের জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে। হাজারে দু-জনও এ সম্মানের অধিকারী হতে পারে কি না সন্দেহ।

মাসাইদের দেশে সিংহ-শিকারের সময় অনেকবারই এমন ল্যাজ টানা আমি দেখেছি। এ থেকে যে কোন মানুষ কখনো জীবন্ত ফিরে আসতে পারে, এটাই আমার কাছে এক পরম বিস্ময় বলে মনে হয়। একটা শিকারের কথা আমার বিশেষ করে মনে পড়ে যাতে প্রায় পঞ্চাশ জন বল্লমধারী যোগ দিয়েছিল। দুটো সিংহ আর একটা সিংহীর তারা পিছু নিয়েছিল। একটা ঘন ঝোপের আড়ালে তারা আশ্রয় নিতে যাচ্ছিল, কিন্তু মাসাইরা তাদের পথ বন্ধ করে দেয়। তখন তারা পিছু হঠে একটা শুকনো ঝরনার গর্ভে একটা ছোট ঝোপের মধ্যে প্রবেশ করল। তাড়া-খাওয়া সিংহ সর্বদাই এমনি ডালপালার আড়াল-দেওয়া শুকনো ঝরনার গর্ভে আত্মগোপনের চেষ্টা করে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই মোরানরা সেই ঝোপটা ঘিরে ফেলে সিংহদের দিকে অগ্রসর হল।

যুধ্যমান বীরেরা যতই সিংহটাকে ঘিরে তার নিকটবর্তী হতে লাগল, ততই সিংহেরা ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে গর্জন করতে লাগল। তারপরেই একেবারে হঠাৎ, কিছুমাত্র আভাস না দিয়েই সবচেয়ে বড় সিংহটা মুক্তিলাভের আশায় ওখান থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল। ঝরনার গর্ভ থেকে ল্যাজ নিচু করে লাফাতে লাফাতে এভাবে বেরিয়ে আসা—সে এক অপূর্ব দৃশ্য। এসেই সে সরাসরি দু-জন মোরানকে আক্রমণ করে বসল, আর তারা তার আক্রমণ প্রতিহত করার জন্যে বল্লম উঁচিয়ে ধরল। সিংহটার কিন্তু লড়াইয়ের ইচ্ছে নয়, সে চায় পালাতে। প্রচণ্ড এক লাফে সে এদের দু-জনের মাথার উপর দিয়ে চলে গেল,—তার শরীরের ধাক্কায় একজন পাক খেয়ে পড়ল।

অন্য সব মোরানরা জিভে শব্দ করে বিরক্তি প্রকাশ করল,—বল্লমধারী দু-জন এভাবে সিংহকে পালাতে দেবার জন্যে, আর সিংহ লড়াই করতে রাজি না হওয়ায়। অনেকবার লক্ষ্য করেছি, অপূর্ব কেশরের অধিকারী সিংহের পর্যন্ত লড়াইয়ের ব্যাপারে সিংহী বা সিংহশাবকের চেয়ে কম উৎসাহ দেখা যায়। হাতি সম্বন্ধেও বলা যায়, চমৎকার দাঁতের অধিকারী হাতির মধ্যেও লড়াইয়ের বাসনা প্রায়ই দেখা গেছে হস্তিনী বা হস্তিশাবকের চেয়ে কম। আমার ধারণা, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বিবেচনাবোধটা জাগ্রত হয়। এমনও আমার মনে হয়েছে যে অনেক সময়েই সিংহ মোরানদের দেখে বুঝতে পারে কে বেশি অভিজ্ঞ আর

কে কম অভিজ্ঞ ; বেছে বেছে তারা অনভিজ্ঞ অল্পবয়স্কদের আক্রমণ করে বসে। অবশ্য আমার এ ধারণা কাল্পনিকও হতে পারে ; আবার এমনও হতে পারে সে অনভিজ্ঞ শিকারীর ইতস্তত ভাব দেখে তারা তাকে অপটু আন্দাজ করে বসে।

ক্রমেই মোরানরা ঝোপটাকে ঘিরে এগিয়ে চলেছে ; তাদের মধ্যে ঠেলাঠেলি পড়ে গেছে,—কে প্রথম আঘাতটা হানবে। বাকি সিংহদুটোকে দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট,—কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আর ক্রুদ্ধ গর্জন করে চলেছে। সিংহদের দশ গজের মধ্যে এসে মোরানরা ওদের লক্ষ্য করে বল্লম ছোড়া শুরু করল। একটা বল্লম গিয়ে সিংহীটার উরুতে লাগতেই সে ক্রোধে যন্ত্রণায় বিকট চিৎকার করে বেরিয়ে এল। মুহূর্তের জন্যে সে পেছনের দু-পায়ে ভর করে দাঁড়ালো, পরমুহূর্তেই চার পায়ে পড়ে তার গায়ে বেঁধা বল্লমটা কামড়াতে চেষ্টা করল। সঙ্গে সঙ্গে আর একজন মোরান তার বল্লমটা সিংহীটার গায়ে ছুড়ে দিয়েই এগিয়ে গিয়ে তার ল্যাজের গোড়াটা ধরে টান দিল। ল্যাজের লোমশ আগাটা ওরা কখনো ধরে না, কারণ ওরা জানে যে সিংহ ইচ্ছে করলে তার ল্যাজ বন্দুকের নলের মতই শক্ত করতে পারে, সুতরাং আগায় ধরলে এক ঝাপটাতেই সে ছিটকে পড়বে।

সঙ্গে সঙ্গে সেই মোরানের সঙ্গীরাও তেড়ে এসে সিমির আঘাতে আঘাতে তাকে ক্ষতবিক্ষত করতে লাগল। এহেন অবস্থায় মোরানরা যেন উন্মত্তের মত হয়ে ওঠে, অন্ধের মত কেবল আঘাতের পর আঘাত হানতে থাকে, কোন অভিব্যক্তির চিহ্ন পর্যন্ত তাদের মুখে দেখা যায় না। কোন শৃঙ্খলা নেই, সবাই চায় সে নিজের হাতে সিংহীটাকে হত্যা করবে। সিংহী তার পেছনের দু-পায়ে সজোরে মাটি আঁচড়াচ্ছে আক্রমণ করবার উদ্দেশ্যে, আর যে মোরান তার ল্যাজ ধরেছে সে তাকে টেনে রেখেছে। হঠাৎ সিংহী পেছনের পায়ে ভর করে উঁচু হয়ে উঠল আর ডাইনে বাঁয়ে এলোমেলোভাবে থাবা চালাতে লাগল। কতবার মোরানরা তার থাবায় আহত হল, কিন্তু তবুও তারা কিছুমাত্র নিরুৎসাহ হল না। পরে তাদের মুখে শুনেছিলাম, উত্তেজনার অতিশয্যে তখনকার মত তাদের যন্ত্রণাবোধ একেবারেই থাকে না। সিংহের অবস্থাও মনে হয় একই রকম। ফলে দু-পক্ষের এই লড়াই চলতে থাকে যতক্ষণ না এক পক্ষ রক্তহীন হয়ে ভূমি আশ্রয় করে।

ধীরে ধীরে সিংহী ভূতলশায়ী হল। পরক্ষণেই কেবল সিমির ঝলসানো ছাড়া আর কিছু দেখা গেল না,—ক্ষিপ্ত মোরানের দল অন্ধের মত সিংহীর ধাঁধার

আঘাতের পর আঘাত করে চলল। যখন তারা ক্লান্ত হল, সিংহীর মাথা তখন চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে—প্রায় গোটা-বারো বল্লম তার শরীরে গেঁথে রয়েছে—একটা রক্তাক্ত পিন-কুশন বলে মনে হচ্ছে তাকে।

ঝোপটার অপর প্রান্ত থেকে হৈ-চৈএর শব্দ শুনে বুঝতে পারলাম, আর-এক দল বল্লমধারী সেখানে অপর সিংহটাকে আক্রমণ করে বসেছে। একজন মোরান তার ঢালটা টিটকিরির ভঙ্গিতে তুলে ধরতেই সিংহটা ঢালটার উপর লাফিয়ে পড়ে তাকে ভূতলশায়ী করল। সেই অবস্থাতেই সে চেষ্টা করল বল্লমটা সিংহের গায়ে গেঁথে দিতে, কিন্তু বৃথাই সে চেষ্টা। ইতিমধ্যে সিংহ তার অনাবৃত কাঁধে দাঁত বসিয়েছে। চিৎকার করে মোরানদের বললাম সরে গিয়ে আমায় গুলি করবার সুযোগ দিতে, কিন্তু যুধ্যমান বীরদের বিকট চিৎকার আর ভূপতিত মোরানের উপর ঝাঁপিয়ে-পড়া সিংহের গর্জনে সে কথা কোথায় হারিয়ে গেল। দুটো বল্লম সিংহের গায়ে এসে গেঁথেছে দেখলাম। সঙ্গে সঙ্গে মোরানরা তাদের সিমি নিয়ে ক্রুদ্ধ সিংহটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

মরার আগে সিংহ আততায়ী মোরানদের একজনকে মারাত্মকভাবে জখম করেছে, আর অপর যে যোদ্ধা তার ঢালের নিচে পড়ে গিয়েছিল তার কাঁধ ক্ষত-বিক্ষত করে দিয়েছে। আহতদের যা শুশ্রূষা করবার তা করলাম। দু-জনেরই দেহে থাবার আর কামড়ের গভীর ক্ষত, সেসব জায়গা দিয়ে প্রচুর রক্তক্ষরণ হচ্ছে। একজনের ঘা যখন সেলাই করে দিচ্ছি, পরম নির্বিকারভাবে সে ঐ ভয়ঙ্কর সিংহগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল আর জিভ দিয়ে ঘৃণাসূচক শব্দ করল—প্রথম সিংহটা পালিয়ে যেতে ওরা যেমন কাজ করেছিল তেমনি। ওর ভাবটা যেন, 'ধেত্তেরি, বিশ্রী ব্যাপার একটা!' অথচ অনুরূপ অবস্থায় যেকোন শ্বেতাঙ্গ যন্ত্রণায় পাগলের মত হয়ে উঠত।

একটা আশ্চর্য ব্যাপার এই যে সিংহের দাঁতে কখনো কারুর হাড় ভেঙেছে এমন কথা শুনি নি—যত আঘাত সব মাংসের উপর দিয়েই গেছে। এর কারণ বোধহয় এই যে সিংহের লম্বা ধারালো দাঁতের সারির মধ্যে দূরত্ব এত বেশি যে ঠিক হাড়ের উপরটাতেই চেপে বসতে পারে না। অথচ সিংহ যখন কোন মানুষের ঘাড় কামড়ে ধরে, প্রায়ই দেখা গেছে তার উপরের দাঁত আর নিচের দাঁত মিশে গেছে,—একটা ক্ষত দিয়ে ওষুধ ঢেলে দেখা গেছে তা অপরটা দিয়ে বেরিয়ে এসেছে।

বল্লমধারীরা বলে সিংহের সবচেয়ে মারাত্মক অস্ত্র তার দাঁত বা তার থাবা নয়, সে হল তার সামনের দু-পায়ের মাঝখানে দু-ইঞ্চি পরিমাণ একটা করে বাড়তি থাবা, মানুষের হাতের বুড়ো আঙুলের সঙ্গে বরং তার কিছুটা সাদৃশ্য। এই থাবাদুটো বাঁকানো, আর অত্যন্ত ধারালো। এগুলো সাধারণত তার থাবার মধ্যে ভাঁজ করা অবস্থায় থাকে বলে সহজে চোখে পড়ে না; কিন্তু সিংহ ইচ্ছে করলে এই থাবাকে প্রসারিত করে প্রায় একেবারে সিধে করে তুলতে পারে। সাঙ্ঘাতিক শক্তি সিংহেব এই লুকোনো থাবায়; এই ভয়ঙ্কর থাবার এক আঘাতে সিংহ মানুষের পেট চিবে ফেলতে পারে।

ঝরনায় ভেসে আসা লোহার টুকরো দিয়ে স্থানীয় কামাররা মাসাইদের বল্লম তৈরি করে। খাদ মেশানোব কাজ ঐ কামাবদের ভাল করে জানা না থাকায় নবম থেকে যায় বল্লমগুলো, হাঁটুতে চাপ দিয়ে সহজেই বাঁকানো যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও ওদের নিপুণ হাতে ছোড়া এই বল্লমই কখনো কখনো শিকারের দেহ ভেদ করে চলে যেতে দেখা গেছে। শিকাবেব হাডে লাগলে বল্লমের আগাটা একেবারে বেঁকে যায়,—শিকারী তা সোজা করে না গ্রামে না ফেরা পর্যন্ত,—কারণ এই বেঁকে যাওয়াই হল তার শিকাবের প্রকৃষ্ট প্রমাণ, তাই এর মূল্য তখন অনেক।

রিজার্ভে থাকার সময়ে মাসাইদের এভাবে চিতাবাঘ শিকাবও আমি প্রত্যক্ষ করেছি। আমার মতে সিংহ-শিকাবেব থেকেও চিতাবাঘ শিকারে কৃতিত্ব বেশি। চিতাবাঘের ওজন আডাই মণের বেশি বড একটা হয় না সত্যি, কিন্তু সিংহের চেয়ে অনেক বেশি চটপটে, অনেক বেশি হিংস্র সে। চিতাবাঘ অত্যন্ত চতুর প্রাণী—চুপচাপ ঘাপটি মেরে পড়ে থাকে যতক্ষণ না কেউ একেবারে ওদের সামনে এসে পড়ছে; আর সঙ্গে সঙ্গে তারা প্রচণ্ড বেগে আক্রমণ করে বসে। তাছাড়া সিংহ যেমন ফাঁকায় থাকতে ভালবাসে চিতাবাঘের বেলায় তা নয়,—সে ভালবাসে গুহার মধ্যে কিংবা অন্য কোন অন্ধকাব অঞ্চলে থাকতে। ঝোপ ঝাডের মধ্যে গুঁড়ি মেরে চিতাবাঘ শিকারের মধ্যে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা।

একবার আমি তিনজন বল্লমধারীর সঙ্গে গিয়েছিলাম,—তারা একটা চিতাবাঘের পিছু নিয়েছিল,—চিতাবাঘটা তাদের ছাগলটা নষ্ট করছিল। সিংহের মত মহৎ স্বভাব চিতাবাঘের নয়,—হত্যার উল্লাসেই হত্যা করা তার স্বভাব। কত ছাগলই যে মেরে ফেলে রেখে গেছে,—তাদের খাবার

কোন চেষ্টাই সে করে নি। অনেকক্ষণ পিছু নেবার পর শেষ পর্যন্ত মোরানরা তার সন্ধান পেল,—উঁচু উঁচু ঘাসের মধ্যে একটা সঙ্কীর্ণ জায়গায় সে রয়েছে। সিংহ হলে দু-একটা ঢিল খেয়েই বেরিয়ে পড়ত, এবং কিছু না হোক গর-গর আওয়াজ করে তার আড্ডার সন্ধান দিয়ে দিত, কিন্তু চিতাবাঘ বড় চালাক; একবস্তা পাথর ছুড়েও তার কাছ থেকে কোন সাড়াই মিলল না। দুঃখের বিষয় আমার কুকুরগুলো সঙ্গে ছিল না; তাই চিতাবাঘটাকে বের করে আনা ছাড়া আর কোন উপায় রইল না।

বল্লমধারী মাত্র তিনজন হওয়ায় আমার বন্দুক ব্যবহারে বিশেষ বাধা হল না। ওদের বললাম আমার দু-দিকে খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে, কারণ আমি জানি, আক্রমণ যখন করবে প্রচণ্ডবেগেই সে তা করবে, তখন আর ওদের বল্লম চালানোর সময় থাকবে না। ঝাঁপিয়ে-পড়া চিতাবাঘটাকে লক্ষ্য করে কোনরকমে হয়ত একটা গুলি ছোড়া আমার পক্ষে সম্ভব হলেও হতে পারে। এখন আমি জানি যে এ কথা মনে করে আমার ওদের প্রতি অবিচার করা হয়েছিল; কারণ তখনও আমার ওদের বল্লমের ক্ষমতার কথা জানা ছিল না।

কোমর পর্যন্ত উঁচু ঘাসের মধ্য দিয়ে আমরা ধীরে ধীরে চলেছি। মোরানরা আমার থেকে খানিকটা পেছনে পেছনে চলেছে—তাদের ঢাল উঁচু করে ধরা, হাতে বল্লম উদ্যত। আমরা এক ফুট এক ফুট করে অগ্রসর হচ্ছি, আর কেবলই থেমে চারিদিকে তাকিয়ে চিতাবাঘটার সন্ধান করছি। ঘাসজমিটা খুব বেশি না হলেও এভাবে সন্তর্পণে অগ্রসর হওয়া অত্যন্ত ক্লান্তিকর।

হঠাৎ আমার ডানদিকে মাত্র গজখানেক দূরে চিতাবাঘটা ঝোপ থেকে বেরিয়ে পড়ল। আমায় লক্ষ্য করে এক প্রচণ্ড লাফ লাফালো সে। আমি রাইফেল তুলে নেবার আগেই আমার ডানদিকের মোরান তাকে বল্লমে গেঁথে ফেলল। মাটি থেকে লাফিয়ে উঠেছে কি না উঠেছে, সঙ্গে সঙ্গে বল্লমের ফলাটা চিতাবাঘের শরীর ভেদ করে চলে গেল। কাঁধ আর ঘাড়ের মাঝখানে গেঁথে তাকে মাটির সঙ্গে লটকে দিল। সেইভাবেই সে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ স্বরে গজরাতে লাগল, কিন্তু কিছুতেই সে মুক্তি পেল না। সঙ্গে সঙ্গে মোরানটা তার সিমি বাগিয়ে ধরে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। অনেক কষ্টে আমি তাকে বাধা দিয়ে এক গুলিতে চিতাটাকে মেরে ফেললাম, সুন্দর চামড়াটা আর ক্ষতবিক্ষত হল না।

বল্লম ছোড়ার সম[illegible] দাঁড়ায় বন্দুক ছোড়ার সময় যেভাবে দাঁড়াতে হয় ঠিক সেইভাবে—[illegible] রাখবার জন্যে বাঁ পা-টা একটু সামনের দিকে দিয়ে, ফলে শরীরের সম[illegible]জনটা বল্লমের উপর গিয়ে পড়ে। ছিটকে যাবার সময় বল্লমটা যেন কেঁপে ওঠে একটু। বেশিরভাগ বল্লমেরই দু-দিকে একটু করে খাঁজ থাকে, তাই যখনই হয়ত বল্লমটা ঘুরতে থাকে একটু, রাইফেলের গুলির মত কতকটা। কুড়ি গজ দূরত্ব পর্যন্ত মোরানের লক্ষ্য হয় অব্যর্থ,—কোন চলমান জন্তুকে ছুড়ে মারলেও ব্যর্থ হয় না।

তিন মাস পরে আমি নাইরোবির পথ ধরলাম—দুটো গরুর গাড়ি সিংহের চামড়ায় ভরে। নব্বই দিনে অষ্টাশিটা সিংহ আর দশটা চিতাবাঘ আমি মেরেছি,—এ একটা রেকর্ড, আমার মনে হয় না যার কেউ সমান ধরতে পেরেছে, এবং আমি সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে আশা করি, কখনও সমান ধরতে পারবে। এক হুন্দরী একটা ড্রাম স্থানীয় অধিবাসীরা সিংহের চর্বিতে ভরে ফেলেছে। আমিও একটা বস্তা সিংহের এক বিশেষ ধরনের হাড়ে ভরে নিয়েছি। এই বাঁকানো হাড়গুলো হয় চার ইঞ্চি পর্যন্ত এবং বিভিন্ন আকৃতির; —এগুলো থাকে কাঁধের সর্বশেষ মাংসপেশীর নিচে, সিংহদেহের অন্য কোথাও এমন হাড় থাকে না। মনে হয় এর কাজ হল লম্বা লম্বা লাফ দেয়ার সময় আঘাত নিবারণ করা। কোন কোন দেশে এ হাড়ের প্রচুর চাহিদা, সোনায় মুড়ে এ দিয়ে অলঙ্কার প্রস্তুত হয়।

অতগুলো সিংহের মধ্যে মাত্র কুড়িটার কেশর ছিল সত্যি চমৎকার। বাকিগুলো হয় সিংহী, না-হয় সিংহই বটে, তবে, ঘন ঝোপের মধ্য দিয়ে চলে চলে তাদের কেশরের চরম দুর্দশা হয়েছে। কেবল যদি স্মারক সংগ্রহের দিকে লক্ষ্য রাখতাম তাহলে আরও অনেক ভাল ভাল চামড়া সংগ্রহ করতে পারতাম; কিন্তু আমার প্রধান কাজ ছিল গো-খাদক পশু বধ করা, এবং প্রায়ই দেখতাম, এদের কেশর অতি অকিঞ্চিৎকর,—কারণ, হয় তারা বৃদ্ধ, কিংবা পঙ্গু, —এবং হয়ত এই কারণেই তারা তাদের স্বাভাবিক শিকার ছেড়ে গরু মোষ মারতে বাধ্য হয়।

আমি চলে যাচ্ছি শুনে মাসাইরা অত্যন্ত বিষণ্ণ বোধ করল। মাতব্বররা একত্র হয়ে অনেক শলা-পরামর্শের পর একটা প্রস্তাব নিয়ে আমার কাছে এল। ওরা জানে আমায় দিয়ে কাজ হবে, তাই ওরা আমায় শিকার বিভাগ থেকে কিনে নিতে চাইল। অনেক আলোচনার পর ওরা আমার দাম ধরেছে

পাঁচশো গজ। তিনটি গজতেই একটা ভা[illegible]া যায়, সুতরাং এ প্রস্তাবে আমি প্রচুর গর্ব বোধ করলাম।

॥ ৮ ॥ [illegible] শিকারীর জীবন ও মৃত্যু

এর পরের কয়েকটা বছর আমার শি[illegible]বনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নাইরোবি হচ্ছে হিংস্র জন্তু শিকারের কেন্দ্রস্থানীয়,—তাই যে শিকারীই আফ্রিকায় আসে নাইরোবিতেই এসে ওঠে। এর ফলে আমার কখনও কাজের অভাব হয় নি। মাসাই বিজার্ভটাকে আমি আমার নিজস্ব শিকারের এলাকা বলে মনে করতাম। মাসাইদের সঙ্গে আমার সদ্ভাব ছিল, আমি জানতাম যে-কোন মাসাইয়ের ঘরে আমি সুস্বাগত, এবং যে শিকারীকে আমি ও অঞ্চলে নিয়ে যাব, আফ্রিকার যা সেরা শিকার তা তার মিলবেই। এতে আমার লাভও হত প্রচুর। আজ তো মাসাই রিজার্ভের অসংখ্য শিকার আর অপূর্ব সব সিংহ শিকারীর প্রধান আকর্ষণ, সমস্ত অঞ্চলটার উপর অনেক পথ, আর তাঁবু ফেলার উপযুক্ত সেরা জায়গাগুলো সব চিহ্নিত হয়েছে। কিন্তু আমি যখনকার কথা বলছি, তখন খুব কম শ্বেতাঙ্গ শিকারীরই ও অঞ্চলের সঙ্গে পরিচয় ছিল।

হিলডা আর আমি নাইরোবির বাইরে একটা বড় পুরোনো বাড়ি কিনেছিলাম। বাড়িটার নাম 'ক্লেয়ারমণ্ট'। অপূর্ব জায়গাটা। পুরোনো পুরোনো বড় বড় গাছ এখানে ওখানে ছড়ানো, বাগানের তলা দিয়ে একটা নদী বয়ে চলেছে, তাতে বাঁধ দিয়ে আমরা একটা খাসা পুকুর তৈরি করে নিলাম। মৎস্য-রক্ষকের কাছ থেকে তালাপিয়া মাছ নিয়ে সেই পুকুরে ছেড়ে দিলাম, এতে করে আমার বাড়ির খিড়কির ঠিক পেছনেই মাছ ধরার ব্যবস্থা হল। সন্ধ্যার দিকে প্রায়ই দেখা যেত বন্য জন্তুরা আমাদের বাগানের উপর দিয়ে যাওয়া আসা করছে। আমার সমস্ত স্মারকগুলোও এখানে একত্র করে সাজিয়ে রাখা সম্ভব হল। আমার একজোড়া হাতির দাঁত ছিল যাদের প্রত্যেকটির ওজন ১৫৩ পাউণ্ড,—সে-দুটোকে বসবার ঘরের দরজার দু-দিকে রাখলাম। মাসাইদের ব্যবহারের ঢাল আর বল্লম রাখলাম অগ্নিস্থানের কাছে, আর বিশেষ উল্লেখযোগ্য কয়েকটি জন্তুর মাথা আর শিং দেয়ালে শোভা পেল। কাঁচ-বাঁধানো বন্দুকের বাক্সে বন্দুক রাখার ব্যবস্থা হল। আর সবচেয়ে যা সুবিধে

সে হল, আফ্রিকা সম্বন্ধে আর শিকার সম্বন্ধে আমার যত বই সে সমস্ত রাখবারও জায়গা হল। আফ্রিকা সম্বন্ধে এমন বইয়ের সংগ্রহ আমার মনে হয় না কেনিয়ায় আর কারো আছে। পৃথিবীর সমস্ত অঞ্চল থেকে আমার কাছে পুস্তক-তালিকা আসত। সন্ধ্যার দিকে কতদিন আমরা আগুনের সামনে বসে কাটিয়েছি,—হিলডা তার সেলাই নিয়ে আর আমি কোন একটা বই হাতে করে। পুরোনো দিনের বড়-বড় শিকারিদের আর অভিযাত্রিদের কথা পড়তাম —সেলাস, স্পীক, স্যার স্যামুয়েল বেকার, স্ট্যানলি, লিভিংস্টোন প্রমুখ ব্যক্তিদের দুঃসাহসিক কার্যকলাপের বিবরণ। এ কথা মনে করে ভাল লাগত যে আমিও আমার সাধ্যমত এইসব মহৎ ব্যক্তিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেছি।

ছ-টি ছেলেমেয়ে আমাদের—চার ছেলে আর দুই মেয়ে। ওদের সংখ্যা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল যে আমার সঙ্গে সাফারিতে যাওয়া ক্রমেই হিলডার পক্ষে শক্ত হয়ে উঠছে। অবশ্য কোন শিকারী সঙ্গে থাকলে তো এমনিতেও তখন হিলডার আমার সঙ্গে যাওয়া সম্ভব হত না। তবে, প্রায়ই আমি ছেলেদের আর কিরাকাঙ্গানোর সঙ্গে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকতাম, নিছক জঙ্গলে ঘোরার আনন্দেই। শিকারের প্রকৃত আনন্দ হল এইখানেই। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শিকার জোগাড় করা বা লাইসেন্সে যত জন্তু মারার অধিকার দেওয়া হয়েছে অনর্থক মেরে মেরে তা পূর্ণ করা—এসব ভাবনা নেই, ঘুরে ঘুরে নতুন নতুন জায়গা আবিষ্কার করা যেখানে শিকার অপর্যাপ্ত, কখনো বা এমন কোন পাহাড় বা উপত্যকার সন্ধান পাওয়া,—আগে সেখানে হয়ত কোন শ্বেতাঙ্গের পা পড়েনি। আশ্চর্য, হিলডার কিন্তু শিকারের ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহ ছিল না। ছোটখাট মানুষটি সে, ভারি রাইফেলের ধাক্কা সামলানো তার পক্ষে কঠিন; তবে, হালকা বন্দুক নিয়ে উড়ন্ত পাখি শিকারের ব্যাপারে যে তার হাত আছে এমন প্রমাণ পেয়েছি। যাই হোক, শিকারের ব্যাপারে তার কখনই বিশেষ উৎসাহ ছিল না, এবং তা যে ছিল না এজন্যে আমার কোন দুঃখ নেই। তবে, শিকারের সময় অনেকবার হিলডার অভাব অনুভব করেছি। ছেলেপুলেরা আসতে শুরু করার আগে আমরা প্রায়ই একসঙ্গে কাটাতাম,—ভবিষ্যতের ব্যবস্থা করা, পরবর্তী সাফারির চিন্তা করা, কিংবা ছেলেপুলেরা যেমন উৎসাহের সঙ্গে পিকনিকের ব্যবস্থা করে তেমনি উৎসাহে নিবিড় বনের মধ্যে বেড়াতে যাবার মতলব করতাম। এখন কিন্তু হিলডার

আর এসব চিন্তার সময় নেই, ছেলেপুলেদের নিয়েই সে ব্যস্ত,—ছেলেপুলে মানুষ করা যে এমন একটা সমস্যা, এ আমার আগে জানা ছিল না। আমার তো মনে হয় না আমাকে মানুষ করতে আমার বাবা মাকে বিশেষ বেগ পেতে হয়েছিল। হিলডার আর আমার জীবনের ধারা দুটো বিভিন্ন পথ ধরে চলেছে,—সে থাকে ছেলেপুলেদের নিয়ে গৃহস্থালার কাজে,আর আমি ঘুরি বনে জঙ্গলে শিকারিদের সঙ্গে। আমাদের মধ্যে দেখা সাক্ষাতও আজকাল হয় না বড-একটা। আমি বুঝি হিলডার প্রাথমিক কর্তব্য হল ছেলে মানুষ করা, কিন্তু তাহলেও শিকারিদের সঙ্গে ঘুবে ঘুরে ক্লান্তি আসে বৈকি মাণ্ডষের।

যাই হোক, এরও অবশ্য আমি একটা মীমাংসা করে নিয়েছিলাম। শিকারিদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে যখন ক্লান্ত হযে পড়ি, একাই বেরিয়ে পড়ি তখন,—বিশেষ করে হাতির দাঁত সংগ্রহেব নেশায়। ও অঞ্চলে হাতি মারার ব্যাপাবে বিশেষ বাধা-নিষেধ তখন ছিল না, সেই সুযোগ আমি পূর্ণভাবে গ্রহণ করলাম। হাতি শিকার ছিল প্রচুর লাভেব ব্যাপার। এক পাউণ্ড হাতির দাতেব দাম তখন ছিল চব্বিশ শিলিং—অর্থাৎ একজোড়া ভাল দাঁতের দাম হত ১৫০ পাউণ্ডের মত। অভিজ্ঞ শিকারীর পক্ষে এক গুলিতে একটা করে হাতি মারতে পারা উচিত,—এবং ৪৫০-এব ২ নং গুলির দাম মাত্র দেড শিলিং।

একবার হাতি শিকারের এক লম্বা সাফারি থেকে নাইরোবিতে ফিরছি। প্রচুর শিকার মিলেছে,—অসংখ্য দাঁত নিয়ে ফিরছি। কুলিরা যেমন তেমন করে দাঁতগুলো গাড়িতে তুলে দিয়ে বিদায় নিয়েছে। নাইরোবি স্টেশনে নেমে ভাবনা হল, কিভাবে এগুলো বাড়িতে নিয়ে যাব। তখনকার দিনে ট্যাক্সি ছিল না, ছিল কেবল হাতে-টানা রিক্সা। স্টেশনে যত রিক্সা ছিল সব-কটা ভাড়া করলাম, হাতির দাঁতে সেগুলো ভর্তি করে নিজে চললাম সেই শোভাযাত্রার পুরোভাগে। রিক্সাটার দু-দিকে সবচেয়ে বড় দাঁতদুটো বেঁধে নিয়ে এগিয়ে চলেছি প্রধান সড়ক দিয়ে। তখনকার দিনে গাড়ি ঘোড়ার চল ছিল না,মোটরগাড়ি তো কেউ চোখেই দেখেনি বলতে গেলে। শোভাযাত্রা দেখতে মানুষ জন ঘর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল ; কেউ রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে দাঁত গুনছে, কেউ বা আন্দাজ করছে কত তাদের ওজন হতে পারে। এমন ব্যাপার ওরা কেউ ইতিপূর্বে দেখেছে কি না সন্দেহ। বলতে কি, প্রচুর গর্ব বোধ করলাম।

হঠাৎ দেখি, আমাদের পাঁচ বছরের মেয়ে ডোরীনকে নিয়ে হিলডা একটা

রিক্সা করে আমাদের দিকে আসছে। ইতিমধ্যে আমার খুব লম্বা দাড়ি গজিয়েছে,—প্রায় কোমর পর্যন্ত লম্বা সে দাড়ি। ফলে হিলডা আমায় দেখে চিনতে পারল না। ওদের দিকে তাকিয়ে আমি হেসে উঠলাম। হঠাৎ ছোট্ট ডোরীন চেঁচিয়ে উঠল, 'মা, মা, ঐ যে বাবা!'

আমার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে হিলডা তাকে থামাবার চেষ্টা করল। বললে, 'না রে বাছা, স্মারক-চিহ্ন নিয়ে এলেই যে বাবা হতে হবে এমন কোন কথা নেই। তার চেহারা ভুলে গেছিস তুই; দেখছিস না, এ লোকটার যে দাড়ি আছে!'

'থাকগে দাড়ি!' চেঁচিয়ে উঠল ডোরীন, 'বাবা, নিশ্চয় বাবা!' আমি আর থাকতে পারলাম না, হাসিতে ফেটে পড়লাম। এক মুহূর্ত আমার দিকে তাকিয়ে থেকে হিলডা রিক্সা থেকে নেমে চেঁচিয়ে উঠল 'ও জন, জন!'

শ্বেতাঙ্গ শিকারী হিসেবে আমার দিনকাল ভালই চলছিল। হাতির দাঁত বিক্রির টাকা, আর ক্বচিৎ কখনো কোন ধনী শিকারীর দেওয়া কোন বস্তু—এই যেমন একটা দামি রাইফেল বা কোন বহুমূল্য তাঁবুর সরঞ্জাম ইত্যাদি, এইসব নিয়ে আমার আয় তখন ওখানকার গভর্নরের চেয়ে কম নয়। কোন বিশিষ্ট রাজপুরুষ শিকারে এলে প্রায়ই আমার ডাক পড়ত তাঁকে শিকারে নিয়ে যাবার জন্যে। একবার এক আমেরিকান দম্পতিকে নিয়ে শিকারে গিয়েছি, হঠাৎ এক থানার মারফৎ জরুরি খবর এল, 'প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ শিকারের জন্যে আসছেন, সেরা শ্বেতাঙ্গ শিকারী হিসেবে তোমাকে নির্বাচন করা হয়েছে। পত্র-পাঠ নাইরোবিতে ফিরে এস।'

চিঠিটা শিকারিদের দেখাতে তরুণ আমেরিকান তো একেবারে ফেটে পড়ল। চিৎকার করে বললে, 'কে প্রিন্স অব ওয়েল্স্? আমার টাকা কি টাকা নয় নাকি? আপনি আমাদের শিকারে নিয়ে যেতে রাজি হয়েছেন, এখন কি সে কথার খেলাপ করতে চান?'

দেখলাম, সে অন্যায় কিছু বলে নি। নাইরোবিতে খবর পাঠিয়ে দিলাম যে যে কাজে আমি রয়েছি তা ছেড়ে যাওয়া এখন আমার পক্ষে অসম্ভব। প্রিন্সকে শিকারে নিয়ে যাবার মহা সম্মান তাই অন্য এক শিকারীর উপর পড়ল। সেও এক অত্যন্ত নিপুণ শিকারী, যথেষ্ট নিপুণতার সঙ্গেই সে তার কর্তব্য করেছিল। আমার কিন্তু খুব মজা লেগেছিল গণতন্ত্রে বিশ্বাসী আমেরিকানটির কথায়, 'কে প্রিন্স অব্ ওয়েল্স্?'

যাই হোক, প্রিন্সকে শিকারে নিয়ে যেতে না পারলেও এ কথা জেনে তৃপ্তি পেলাম যে আমাকেই এ কাজের সবচেয়ে উপযোগী বলে মনে করা হয়েছিল। এর অর্থ এই যে বিশেষজ্ঞদের মতে শ্বেতাঙ্গ শিকারিদের মধ্যে আমি শীর্ষস্থান অধিকার করেছি। যখন আমাদের বিয়ে হয়, হিলডা আর আমি ভাবতাম যে শ্বেতাঙ্গ শিকারী হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করলেই আর আমাদের কোন আর্থিক অস্বাচ্ছন্দ্য থাকবে না, কারণ কেনিয়ায় তখন শ্বেতাঙ্গ শিকারীর বেতন ছিল অবিশ্বাস্য রকমের বেশি। আজ আমাদের সেই উচ্চকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়েছে, কিন্তু এমন আবার সব সমস্যা এখন দেখা দিচ্ছে যা আগে থেকে আন্দাজ করতে পারি নি।

ছেলেমেয়েরা বড হয়ে উঠছে। একদিন রাতে দেখি, সদরের দরজা সন্তর্পণে ভেজানো রয়েছে, আর আমার বড ছেলে গর্ডন তার বিছানায় নেই। বুঝলাম সে কোথায় গেছে। নিজের ছেলেবেলার কথা মনে পডল, নিঃসন্দেহে বুঝলাম ছেলেটা হয় জাল, না-হয় ফাঁদ নিয়ে ঝোপে জঙ্গলে ঘুরছে। একটু আহত হলাম এই ভেবে যে আমার কাছে এসে উপদেশ নিয়ে গেল না, —যাই হোক, হয়ত নিজে থেকেই শিখতে চায় সে।

সেদিন যখন তার ফিরে আসার সাডা পেলাম তখন অনেক রাত্রি। সিঁড়িতেই তার সঙ্গে দেখা। আশা করে আছি ওর শিকার দেখতে পাব, কিন্তু যখন দেখলাম ওর পরনে সান্ধ্য পোশাক, আমার মনোভাব তখন সহজেই অনুমান করা যায়। সে গিয়েছিল নাইরোবিতে কোন নাচের আসরে। এভাবে বাজে সময় নষ্ট করার জন্যে খুব খানিকটা ধমক দিলাম। পরদিন সকালে চায়ের আসরে বসে তখনও আমি সেই রাগে ফুলছি। কিন্তু কী আশ্চর্য, হিলডা বরং ছেলেটার প্রতি সহানুভূতিই প্রকাশ করল। বললে, 'যাই বল, সকলেই যে শিকারী হতে পারবে, এমন কি কোন কথা আছে?'

'তার মানে? কী বলতে চাও তুমি তাহলে? তোমার ছেলে বড় হয়ে ব্যবসায়ী হোক বা চাষের কাজ শিখুক?'

'আমি চাই ওর যেদিকে ঝোঁক ও তাই করুক। সাধারণ আর পাঁচটা ছেলে যা করে থাকে তার জন্যে যদি তুমি ওকে ধমকাও, তাহলে ওর উপর ততটাই অন্যায় করা হবে যতটা অন্যায় তোমার বাবা মা তোমার উপর করেছিলেন।'

হিলডার বিচার-বুদ্ধির উপর আমার যতই শ্রদ্ধা থাক, আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে ওর এই অভিমত একেবারেই হাস্যকর। ঐ বয়সের ছেলের পক্ষে

স্বাস্থ্যকর ও স্বাভাবিক ব্যাপার হবে একটা ভাল কুকুর নিয়ে বন্দুক কাঁধে বনে বনে ঘোরা,—তার বদলে সেজে গুজে নাচের আসরে গিয়ে কোন মেয়ের সঙ্গে নাচা—এর মত বোকামি আর হয় না!

তবে, ছেলেটার ব্যাপারে যে আমায় হতাশ হতে হয়েছে তা নয়। প্রায়ই দেখা গেছে, বনে গিয়ে হাতে-নাতে না শিখলে শিকারের কৌশল ঠিক আয়ত্ত হতে চায় না। শিকারী হিসেবে প্রচুর সম্ভাবনার ইঙ্গিত গর্ডনের মধ্যে ছিল। বড় বড় জন্তুদের ছবি এঁকে কত করে ওকে শিখিয়েছি ঠিক কোন্ কোন্ জায়গায় গুলি করা উচিত। যখন মনে হল ওর শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়েছে, গেলাম একদিন ওকে নিয়ে হাতি শিকারে। একপাল হাতির কাছে গিয়ে পৌঁছলাম। দেখা গেল, একটা পুরুষ হাতি এমনভাবে স্থির দাঁড়িয়ে আছে, যেন কানে গুলি খাওয়ার জন্যে প্রস্তুত। কিন্তু কোথায় তাকে গুলি করবে, তা নয়, গর্ডন আমায় ফিস-ফিস করে জিজ্ঞাসা করল, 'কোন্ জায়গায় গুলি করব, বাবা?' ঘণ্টার পর ঘণ্টা এত যে শিক্ষা ওকে দিলাম, বৃথাই হল সব। উত্তরে আমি শুধু আমার কান দেখিয়ে দিলাম। গুলি করল গর্ডন, আর সঙ্গে সঙ্গে হাতিটা পড়ে গেল,—পড়ার আগেই সে মরে গেছে। এ থেকে বুঝলাম যে শিকারে নেমে সামান্য একটা নির্দেশে যা শেখা যায়, ঘরে বসে হাজার উপদেশেও অনেক সময়ে তা শেখা যায় না।

যেসব শিকারিদের সাফারিতে নিয়ে যেতে হয় তাদের সম্বন্ধে আমার ধারণা যাই হোক, যেসব শ্বেতাঙ্গ শিকারী তাদের অবজ্ঞার চোখে দেখে, আমি তাদের দলে নই, কারণ ঐ শিকারিদের উপরেই আমাদের ভরণ পোষণ নির্ভর করে। ওদের মধ্যে কেউ আদর্শস্থানীয়, কেউ বা মন্দ; কিন্তু তা হলেও আমার সব সময় চেষ্টা যাতে ওদের সকলকেই খুশি করতে পারি এবং কাজটা যে সব সময়ে খুব সহজ তা নয়; আমেরিকান, ইউরোপীয়ান, ব্রিটিশ, প্রাচ্য দেশীয়, সব রকমের শিকারীকে শিকারে নিয়ে যাবার অভিজ্ঞতাই আমার হয়েছে,—সবারই বিভিন্ন আচার ব্যবহার, বিভিন্ন বাসনা কামনা। শ্বেতাঙ্গ শিকারীর সঙ্গে ওর সম্পর্কটা একটু অদ্ভুত। ওর বেতনভুক সে, এবং সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে অধীনস্থ কর্মচারী; তাই যে তার হুকুম তামিল করতে বাধ্য। কিন্তু তবুও সাফারির সম্পূর্ণ দায়িত্ব তার; তার নিরাপত্তার জন্যে সম্পূর্ণ দায়ী সে। এমন কিছু যদি শিকারী চায় যা তার মতে বুদ্ধিমানের কাজ নয়, তার কর্তব্য তাতে বাধা দেওয়া। কিন্তু শিকারী যদি সে বাধা না মানে তখনই

হয় মুস্কিল। এমনকি এমন কয়েকটা ঘটনার কথাও আমার জানা আছে যখন অবিবেচক শিকারীর কাছে বার বার বাধা পেয়ে শেষ পর্যন্ত শ্বেতাঙ্গ শিকারী সাফারি বাতিল করে তাঁবু তুলে নাইরোবিতে ফিরে গেছে। এহেন ঘটনা অত্যন্ত অপ্রীতিকর সন্দেহ নেই, এবং ভরসার কথা এই যে এমনটি সচরাচর বড একটা ঘটে না এবং এহেন দুর্ঘটনা আমার জীবনে কখনো ঘটেনি।

অবশ্য শিকারী আর শ্বেতাঙ্গ শিকারীর মধ্যে বিসম্বাদ হলে যে সর্বদাই তা শিকারীর দোষ, এমন বলা কথা যায় না। শ্বেতাঙ্গ শিকারীও রক্তমাংসের মানুষ ছাড়া কিছু নয়, তা ছাড়া সব সময়েই তার উপর দিযে একটা ধকল চলে। তার উপরে যেন একটা জাহাজের ক্যাপ্টেনের আর একটা ছোটখাট শহরের মেয়রের পূর্ণ দায়িত্ব। দু-তিন ডজন কুলি মজুরের ভারও তার হাতে— তাদের মধ্যে আছে বাসন-মাজা চাকর থেকে বন্দুকবরদার পর্যন্ত, যার হাতে অনেক সময় জীবন মরণের দায়িত্ব। এদের মধ্যে সে শৃঙ্খলা বজায় রাখবে, অথচ এদের চটানো চলবে না। কোথাও কোন গণ্ডগোল হলে সে দায়িত্ব একমাত্র তার,—এ বলে তার রেহাই নেই যে অমুক কুলি বা অমুক বন্দুকবরদারের জন্যে এ অবস্থার উদ্ভব হয়েছে, কারণ সাফারিতে বেরোবার সময়েই ধরে নেওয়া হয়েছে যে যেসব লোক বহাল করা হয়েছে বা যা যা ব্যবস্থা হয়েছে সে সমস্তই তার পছন্দমত হয়েছে।

তাঁবু খাটানো বা গুটোনোর ব্যাপারেও দায়িত্ব শ্বেতাঙ্গ শিকারীর ; তাকে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে প্রতিটি খুঁটিনাটি জিনিস ঠিকভাবে নেওয়া হয়। যদি কোন লরি পথে বিকল হয়, তাও সারাবার ক্ষমতা তার থাকা চাই। কারুর অসুখ করলেও তাকে সারিয়ে তোলার ভার তার। অথচ এসব কাজের মধ্যে এ কথা তাকে একবারও ভুললে চলবে না যে সাফারিটা ঠিকভাবে নিয়ে যাওয়াটাই তার প্রধান কর্তব্য নয়,—শিকারী হিসেবেই তাকে ভাড়া করা হয়েছে , সুতরাং শিকার তাকে খুঁজে পেতেই হবে এবং এতে সফল হতে হলে তার দরকার দেশের বিভিন্ন অঞ্চল সম্বন্ধে নিখুঁত পরিচয়। অনেক শিকারী চায় বিভিন্ন বন্য জন্তুর একটা মোটামুটি সংগ্রহ,—হাতি, গণ্ডার, মোষ, সিংহ, আর কিছু বড সাইজের অ্যাণ্টেলোপ। অথচ এই সমস্ত জন্তুই যে বনের একই অঞ্চলে মেলে তা নয়। সিংহ-শিকারের পর তখন শ্বেতাঙ্গ শিকারী হয়ত তার শিকারীকে নিযে যাবে দু-তিনশো মাইল দূরের সম্পূর্ণ ভিন্ন এক অঞ্চলে যেখানে গণ্ডার আর মোষ মিলতে পারে। তারপর হাতি শিকারের জন্যে আবার আর

এক অঞ্চলে। এই সমস্ত অঞ্চলেব অন্ধিসন্ধি শিকাবীর নখদর্পণে থাকা দরকার। তাকে জানতে হবে বর্ষায় কোন্ কোন্ পথে যাওয়া যেতে পারে, কোথায় তাঁবু খাটানোর সুবিধে, বছরের কোন্ সময়ে কোন্ অঞ্চলে কাছাকাছি জল মিলবে। এসব ছাড়াও তাকে ভাল করে জানতে হবে কোন্ অঞ্চলে কোন্ সময়ে ঘাস খুব বড-বড নয়, কারণ শিকাবের ব্যাপাবে ঘাস একটা মস্ত বড় সমস্যা। ঘাস বেশি উঁচু হলে জন্তুবা সহজেই তাব আড়ালে লুকিয়ে পড়বে; তা ছাড়া ঘাসের অবস্থা অনুসরণ করে তৃণভুক প্রাণীবা এক অঞ্চল থেকে আব এক অঞ্চলে আসা যাওয়া করে, আব মাংসাশী প্রাণীরা তাদেব পিছু নিয়ে থাকে।

আর, চিরন্তন সমস্যা হল খাবার। সাফাবির সকলের জন্যে যথেষ্ট পরিমাণ খাবার সঙ্গে নিয়ে যাওয়া কখনই সম্ভব নয়। শ্বেতাঙ্গ শিকারীকে তাই পথে শিকার কবে খাদ্য সংগ্রহ কবতে হবে। এবং সব সময়েই যে তেমন শিকার জোটানো সহজ তা নয়। ধবা যাক যাওয়া হচ্ছে হাতি বা গণ্ডার শিকারে। এসব জন্তু বাস করে ঝোপঝাড় অঞ্চলে, সেখানে অ্যান্টেলোপ একবকম দুর্লভ বললেই চলে। অথচ কয়েকটা দিন মাংস না পেলেই লোকজনরা বিরক্ত হয়ে পড়ে, ঝগড়াঝাটি শুরু করে দেয়। আবার মাংসের জন্যে কোন ফাঁকা অঞ্চলে গিয়ে এক-আধদিন নষ্ট করাও আবাব হয়ত শিকাবীর অভিপ্রেত নয়, কারণ সাফারির জন্যে তার দৈনন্দিন খরচ হচ্ছে চল্লিশ পাউণ্ডেরও উপরে; সুতরাং তার যুক্তিও মানতে হবে বৈকি। কিন্তু লোকজনেরও তো আব রোজ-রোজই ভুট্টা খেতে ভাল লাগে না!

যে অঞ্চলে ভাল ভাল মাংস মেলে সেখানেও শ্বেতাঙ্গ শিকারীর উচিত যথাসম্ভব মুখ বদলানোর ব্যবস্থা করা। একঘেয়ে খাবার খেয়ে খেয়ে যাতে বিরক্তি ধরে না যায় সেজন্যে উচিত মাঝে মাঝে মাংস পালটানো। কখনো বা কয়েকটা মাছ ধরল সে। এইসব খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলোর দিকে দৃষ্টি দিলে শিকারীর মনে হবে না যে তার পয়সা বৃথাই নষ্ট হচ্ছে, সময়টাও ভালই কাটবে।

এই ধরনের আরও কয়েকটা ছোটখাট ব্যাপারের উপর সাফারির সাফল্য নির্ভর করে, যেগুলোর দিকে সব সময় লক্ষ্য রাখা হয় না। শিকার সংগ্রহের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল তার ছাল ছাড়ানো। চামড়ার সঙ্গে যদি মাত্র এক ইঞ্চি পরিমাণ মাংসও লেগে থাকে, তাহলে সেটা পচে গিয়ে সেখানে একটা ছিদ্রের সৃষ্টি হয়, ওস্তাদ ট্যাক্সিডার্মিস্টের পক্ষেও আর তখন তা মেরামতের

উপায় নেই। আবার খুব চেঁচে ছুলে ছাল ছাড়ালেও একটা বিশ্রী দাগ থেকে যায়। যে নুন ব্যবহার করা হচ্ছে সেটা ঠিক জিনিস কি না, বা ঠিকভাবে মাখানো হচ্ছে কি না, সে দায়িত্বও তাঁর, কারণ এতে গলদ থাকলেও চামড়াটা নষ্ট হবে এবং যে শিকারী এত খরচ করে সাফারিতে বেরিয়েছে, তার পক্ষে খেপে যাওয়া স্বাভাবিক। এর জন্যেও দায়ী হতে হবে শ্বেতাঙ্গ শিকারিকেই।

বেশ কয়েকটা উপজাতির ভাষাও তার মোটামুটি জানা দরকার, এবড়ো খেবড়ো জমির উপর দিয়ে লরি চালানোর ক্ষমতাও তার থাকা চাই। ফোটোগ্রাফি সম্বন্ধেও জ্ঞান থাকা ভাল, অনেক রকম তাস খেলাও তার জেনে রাখা উচিত,—আর উচিত, যেকোন অবস্থাতেই মেজাজ ঠিক রাখা। এইটিই হল যেমন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি কঠিন। এমন অনেক শিকারী আছে যারা প্রধানত শিকার করতেই যে আফ্রিকায় আসে তা নয়, আসে কোন বিভীষিকার আতঙ্ক থেকে রক্ষা পেতে। এহেন মানুষের সঙ্গে নির্জনে সপ্তাহের পর সপ্তাহ বসবাস করা সহজ কাজ নয়।

এইসব কাজে শ্বেতাঙ্গ শিকারীর নার্ভের উপর অত্যন্ত চাপ পড়ে, তাই ভারি ভাল লাগে যখন শিকার বিভাগ থেকে কোন শিকার নিয়ন্ত্রণের ভার আসে। হয়ত কোথাও একপাল হাতি ফসল নষ্ট করছে। এ অভ্যাস একবার ধরলে হাতি বারবার খেতে হানা দিতে থাকে, যতক্ষণ না সমস্ত ফসল একেবারে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। গ্রামবাসীর কাছে নালিশ শুনে তখন গভর্মেণ্ট থেকে কোন শ্বেতাঙ্গ শিকারীকে নিযুক্ত করা হয় হাতিকে সায়েস্তা করবার জন্যে। এহেন ব্যাপারে শিকার বিভাগের সঙ্গে আমার এই ব্যবস্থা থাকে যে কাজ সারার পর হাতির দাঁতগুলো আমার পাওনা হবে।

এই ধরনের একটা শিকারের কথাই আমার বিশেষ করে মনে পড়ে,—যতদূর মনে পড়ে হিলডাও তখন আমার সঙ্গে ছিল। কেনিয়ার দক্ষিণ-পুব প্রান্তদেশে জম্বু পাহাড়। তার কাছাকাছি অঞ্চলে কতগুলো হাতি বড় অত্যাচার করছিল। আমার সঙ্গে ছিল আমার পুরোনো পথপ্রদর্শক ও বন্দুক-বরদার সাসীতা। হাতির পিছু নেবার ব্যাপারে সাসীতার সমকক্ষ কেনিয়ায় আর একজনও মিলবে কি না সন্দেহ। শুধু যে পথ চেনায় খুব দক্ষ তাই নয়, অত্যন্ত স্থিরমস্তিষ্কও বটে, আর রাইফেল বদলানো ও গুলি ভরার কাজেও অত্যন্ত ক্ষিপ্রহস্ত,—দোনলা বন্দুকে হাতি শিকারের ব্যাপারে এর গুরুত্ব

অসীম। আমার পুরোনো বন্ধু কিয়াকাঙ্গানো কিন্তু কিছুতেই এই কাজে দক্ষতা লাভ করতে পারে নি।

কোয়েল পর্যন্ত ট্রেনে করে গিয়ে সাসীতা আর আমি পায়ে হেঁটে চললাম জম্বু পর্যন্ত। জম্বুর সন্নিকটেই হল আমার প্রিয় মারেঞ্জ বন। বিশাল বিশাল ঘাসে ছাওয়া এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের তুলনা কেনিয়ায় আর কোথাও মিলবে না। এখানকার নিরস্তপাদপ ঝোপ অঞ্চলের তুলনায় মারেঞ্জ প্রাণপ্রাচুর্যে পূর্ণ। মাথার উপরে বানর আর কাঠবিড়ালি আর লম্বা-ঠোঁট হর্নবিলের দল লাফালাফি করে আর সবেগে উড়ে চলে যতক্ষণ না, যাকে বলে বনের ছাদ তার আশ্রয়ে গিয়ে পৌঁছচ্ছে। ছোটখাট অদ্ভুত প্রাণী, যাকে বলা হয় এলিফ্যাণ্ট শ্রু, তাদের ছোট সিধে শুঁড় দিয়ে ঝরা পাতার উপর দিয়ে খক্-খক্ করে চলে যায়। তাদের একটাকে ধরে পুষেছিলাম। খুব সহজেই পোষ মেনেছিল সে; ফড়িঙের লোভে প্রায়ই আসত আমার কাছে।

ভয়ঙ্কব ভয়ঙ্কর প্রাণীরও এখানে অভাব ছিল না। একটা শ্যাওলা-ধরা কাঠের গুঁড়িতে পা দিতে যাচ্ছি, হঠাৎ সাসীতা আমার সোয়েটার ধরে এক টান দিল। একটা ধোঁয়াটে সবুজ রঙের সাপ দেখিয়ে দিল,—আমার ঠিক মাথাব উপরে একটা ডাল থেকে ঝুলছিল সাপটা। মাথা তুলে স্থিরভাবে সাপটা আমায় লক্ষ্য করছিল, অপেক্ষায় ছিল কখন আমি আর-একটা পা ফেলি। রাইফেলের এক গুলিতে সেটাকে শেষ করলাম।

বন্য জন্তুর চলা-পথের উপর সজারুর কাঁটা ছড়ানো রয়েছে দেখা গেল। দুটো সজারুর দেখা মিলল,—তারা একটা মরা হাতির দাঁত খেতে ব্যস্ত। হাতির দাঁতের মধ্যে এমন কিছু নিশ্চয় আছে যা তাদের বিশেষ পছন্দ। যে দাঁত ছিল প্রায় নব্বই পাউণ্ড ওজনের, সেটাকে তারা খেয়ে খেয়ে প্রায় পাঁচ পাউণ্ডে নামিয়ে এনেছে। যেসব কারণে বনের মধ্যে হাতির দাঁত অতি সামান্যই পাওয়া যায় তাদের একটা হল এই। পুরোনো দিনের শিকারীরা বনে হাতির দাঁতের অভাব লক্ষ্য করে এই আজগুবি গল্প ফেঁদেছিল যে বনের মধ্যে এক রহস্যময় কবরখানা আছে, যেখানে গিয়ে হাতিরা অন্তিমকালে মারা যায়। আসলে কিন্তু এ কথাটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, কারণ বনের মধ্যে মরা হাতির কঙ্কাল অনেকবার আমার চোখে পড়েছে। অবশ্য এই কঙ্কালও যে খুব বেশিদিন পড়ে থাকে তা নয়, কারণ পোকার কবলে আর দাবানলের আগুনে অবিলম্বেই এ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

বেলা দুপুর পর্যন্ত আমি মাথায় হ্যাট না পরে বড বড গাছের ছায়ায় ঘুরে বেড়াতাম ; এ আমার ভারি ভাল লাগত। ঝোপ জঙ্গলের জ্বালা-ধরানো তাপের পর এ অঞ্চল আমার কাছে অপূর্ব বোধ হত।

যে গ্রামে হাতির অত্যাচারের খবর পেয়েছিলাম সেখানে পৌঁছতেই গ্রামবাসীরা দল বেঁধে এসে আমায় ঘিরে ফেলল—এমন ভাব দেখাতে লাগল যেন তাদের রক্ষাকর্তা এসেছে। তাদের ছোট ছোট চাষের জমির ধ্বংসাবশেষ তারা আমায় দেখালো—আদিম অস্ত্রের সাহায্যে বন কেটে কেটে তারা এইসব ছোট ছোট খেত করেছে। একজন তো তার ভুট্টাখেতের দুর্দশার কথা বলতে গিয়ে কেঁদেই ফেলল। তার আর তার পরিবারের সকলের ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্রাণপাত পরিশ্রমের ফল এখন হাতির পায়ের তলায় একেবারে থেঁতলে পিষে গেছে। মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে হাতি যে কী পরিমাণ অনিষ্ট করতে পারে, তা দেখে অবাক হতে হয়। তবে, যদি মনে রাখা যায় যে হাতির পায়ের তলার লম্বালম্বি মাপ দু-ফুট আর সেই পা ক্রমাগত চলছে আর চলছে, তাহলে হয়ত ক্ষতির পরিমাণটা ততটা বিস্ময়কর বলে মনে হবে না। এর উপর আবার তারা সর্বদাই কাঁচা ডাঁটাগুলো শুঁড়ে করে টেনে তুলতে তুলতে চলে।

হাতির পালকে প্রতিহত করবার যে ব্যবস্থা তারা করেছে তা দেখলেও করুণার উদ্রেক হয়। সে হল খেতের কোন কোণে মন্ত্রঃপূত লাঠি আর জাদু-করা মাটির হাঁড়ি। আগুন জ্বেলে আর ঢাক ঢোল পিটিয়েও ওরা দেখেছে ; কিন্তু হাতির পাল তাতে ভ্রূক্ষেপ মাত্র করে নি।

একবার একটা তাল গাছের নিচে আমাদের তাঁবু খাটানো হল। যখন দেখল আমরা ওখানে থাকবার ব্যবস্থা করছি, গ্রামবাসিদের সমস্ত ভয় কেটে গেল। ওদের সহজ বিশ্বাসে বলে যে শ্বেতাঙ্গরা ম্যাজিক জানে, তারা কখনো ব্যর্থ হয় না। ওদের এই বিশ্বাসের কথা শুনে হয়ত অনেকে আত্মশ্লাঘা বোধ করতে পারেন, আমি কিন্তু এতে অস্বস্তি বোধ করি, কারণ সঙ্গে সঙ্গে শিকারী-জীবনের অনেক ব্যর্থতার কথা আমার মনে ভেসে ওঠে, আর আশঙ্কা হয়, যদি এদের এত আশা সত্ত্বেও আমি এদের হতাশ করি!

পরদিন সাসীতা আর আমি খুব ভোরে উঠে হাতির পালের চিহ্ন ধরে বেরিয়ে পড়লাম। পথে একটা নারকেল খেত চোখে পড়ল। এককালে এখানে প্রচুর নারকেল ফলত, কিন্তু হাতির সঙ্গে পাল্লা দিতে না পেরে মালিক সব ছেড়ে

পালাতে বাধ্য হয়েছে। মাত্র তিনটে বড় বড় গাছ দাঁড়িয়ে রয়েছে, বাকিগুলো সব হয় বেঁকে দুমড়ে না হয় হাতির পায়ের তলায় পিষে নষ্ট হয়ে গেছে, বড় বড় পাখার মত পাতাগুলো হলদে হয়ে আসছে। একটা মিষ্টি আলুর খেতের উপর দিয়ে আমরা চলে গেলাম, তার এখন অন্তিম অবস্থা উপস্থিত।

মাথার উপর দিয়ে বানররা ডাল থেকে ডালে পালাতে শুরু করেছে। ওদের মধ্যে অনেকগুলো হল কলিবি—তাদের লম্বা, কালো চামড়ায় ঝলমলে সাদা ডোরা। সুন্দর চামড়ার জন্যে এক সময়ে এই বানরগুলোর খুব চাহিদা হয়েছিল,—অনেক মিসিবাবাই কলিবি চামড়ার কোট পরে বুলেভার্দে ঘুরে বেড়াতে ভালবাসত। ভাগ্য ভাল বানরদের, এ ফ্যাশন এখন প্রায় চলে গেছে। উপরের ডালে কাঠবেড়ালির মত ভঙ্গিতে বসে আছে সাদা বানরের দল। গাছগুলো এত উঁচু যে ছোট ছোট বানরগুলোকে দেখাচ্ছে এক একটা বিন্দুর মত। কতবার ইচ্ছে হয়েছে চুপচাপ বসে শুধু জন্তুদের চালচলন লক্ষ্য করি, কিন্তু সে সুযোগ শিকারীর কোথায়! সময় তার বাঁধা, সর্বদাই তাকে এখানে ওখানে ঘুরতে হচ্ছে।

খানিকটা হাতির নাদি আমাদের চোখে পড়ল,—দুটো কাঠবেড়ালি তা থেকে হজম-না-হওয়া শস্য ঠোকরাচ্ছে। সাসীতা ছুঁয়ে দেখল, তখনো তা গরম রয়েছে। অর্থাৎ বুঝতে হবে যে হাতিরা বেশি দূরে যায় নি, আর-একটু এগোলেই দেখা মিলবে। পরক্ষণেই ওদের দেখা মিলল। কতরকম শব্দই ওরা করছে,—হস্তিনীরা আবার থেকে-থেকে একটা তীক্ষ্ণ আওয়াজ তুলছে। আর একটু কাছে যেতেই দেখা গেল ঝোপ-ঝাড়ের উপরদিকটা হাতি চলে যাবার ফলে যেমন দোলে তেমনি দুলে দুলে উঠছে। আমার পাশে থেকে সাসীতা বার বার সেই ফুলের রেণু উড়িয়ে বাতাস পরখ করছে।

একপাল মেটে বাদামি রঙের হাতি দেখা গেল ঝোপ-ঝাড়ের উপর দিয়ে। আমরা ওদের ত্রিশ গজের মধ্যে গিয়ে পৌঁছলাম। মূল দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া একটা ছোট ভাগ এটা,—এদের মধ্যে আছে কয়েকটি হস্তিনী আর দুটো অল্পবয়স্ক পুরুষ-হাতি। গুলি করার মত কোন দুর্বল জায়গার সন্ধান পেলাম না। হঠাৎ একটা হস্তিনী মাথা তুলল এবং সঙ্গে সঙ্গে আমি এক গুলিতে তাকে ধরাশায়ী করলাম। বাকিগুলো ভয় পেয়ে পালাতে শুরু করল, কিন্তু পালাবার আগে আরো দুটো হাতি আমার হাতে প্রাণ দিল।

ভয়-পাওয়া হাতির পালের ডাল-পালা ভেঙে পালানোর শব্দ আমাদের

কানে আসছে। সাসীতা আর আমি পুরুষ-হাতিটার চিহ্ন ধরে অগ্রসর হলাম।

স্থানীয় বাসিন্দারা যারা আমাদের সঙ্গে এসেছিল জঙ্গল কেটে পথ করবার জন্যে, দেখা গেল যে কোন কাজে আসা দূরে থাক, বরং তারা অসুবিধেরই সৃষ্টি করছে। তারা জঙ্গলের মধ্যে ছড়িয়ে থাকায় হাতিগুলো কেবলই চমকে চমকে উঠছিল। হাতির ঘ্রাণেন্দ্রিয় এতই প্রবল যে মানুষের চলা-পথে না এলেও তারা মানুষের গন্ধ পায়,—বেশ কয়েক ফুট দূর থেকেই পায়। মাত্র কয়েক গজ আমরা অগ্রসব হয়েছি, কিন্তু ইতিমধ্যেই হঠাৎ ঝোপ ঝাড় ভাঙার শব্দ আমাদের কানে এল। দুটো হাতি একসঙ্গে আমাদের দিকে ধেয়ে আসছে। তারা যে আমাদের তাড়া করে আসছে তা নয়,—আমাদের সঠিক অবস্থানের হদিশ হারিয়ে ফেলার ফলেই তাদের এই এলোমেলো ছুটোছুটি।

একটার পেছনে আর একটা,—এইভাবে তারা আমাদের সামনে দিযে চলে গেল। দোনলা বন্দুকের দুটো গুলিই ওদের লক্ষ্য করে ছুড়ে দিলাম, কিন্তু কোনটাই পডল না। ঘনসন্নিবদ্ধ ঝোপ ভেদ করে তারা ছুটে চলল, তাদের চলার বেগে গাছপালা সব কখনো ভেঙে গেল, কখনো বা নুয়ে পডল। আমরাও চললাম তাদের পিছু পিছু। ঘন ঝোপের ফাঁক দিয়ে দৃষ্টি চালানোই দুষ্কর। যাই হোক, দেখা গেল শেষ পর্যন্ত। তামাটে রঙের একটা বস্তু, ঠিক যেন প্রকাণ্ড উইঢিবি একটা। চেষ্টা করলাম যদি ঝোপটার ভিতর ঢুকে একটা ভাল জায়গায় যেতে পারি যেখান থেকে ভাল করে গুলি করা সম্ভব হতে পারে, কিন্তু সে ঝোপ এত নিবিড যে তা ভেদ করে অগ্রসর হওয়া মানুষের পক্ষে অসম্ভব।

ফিরে গেলাম সাসীতার কাছে। তামাটে রঙের বস্তুটা চলে যায়নি তখনো। কোন্‌টা মাথা আর কোন্‌টা পেছনের দিক তাও বোঝা যাচ্ছে না, তবে, মনে হচ্ছে যেন দূরের অংশটা একটু নিচু; তাই আন্দাজ করলাম যে কাছের দিকটাই তাহলে নিশ্চয় মাথা হবে। পায়ের আঙুলে ভর করে উঁচু হয়ে উঠে তবে গুলি করা সম্ভব হল। এ গুলির কিন্তু কোনরকম প্রতিক্রিয়াই হল না, একটু শব্দ পর্যন্ত করল না হাতিটা। অথচ আমি নিশ্চয় করে জানি যে আমার গুলি ওর গায়ে লেগেছে।

দোনলা বন্দুক দিয়ে হিংস্র জন্তু শিকার করবার সময় আমি গুলি ছোড়ার সঙ্গে সঙ্গেই খালি নলটা আবার ভরে নিই, যাতে আহত জন্তু আক্রমণ করে বসলে দুটো গুলিরই সুযোগ পেতে পারি। অবশ্য, বলা বাহুল্য, যদি সময়

পাই। তাই আবার গুলি ভরার জন্যে বন্দুকটা ভেঙেছি আর সেজন্যে চোখটা নিচু করেছি, এমন সময় হঠাৎ সাসীতা চিৎকার করে উঠল। মুখ তুলে দেখি, হাতিটা একেবারে আমার উপরে এসে পড়েছে।

অথচ তার এই ধেয়ে আসার কোন শব্দই আমার কাছে আসেনি। অর্থাৎ কিছুমাত্র শব্দ না তুলেই সেই ঘন ঝোপের ভিতর দিয়ে হাতিটা আমার দিকে ছুটে এসেছে। তখন আর লক্ষ্য স্থির করার সময় নেই, সঙ্গে সঙ্গে ভাঙাটা ঠিক করে নিয়েই প্রায় আমার উপর এসে পড়া পাহাড়প্রমাণ হাতিটাকে অন্ধের মত গুলি করলাম। গুলিটা গিয়ে লাগল ঠিক তার দু-চোখের মাঝখানে। সঙ্গে সঙ্গে হাতিটা হাঁটু মুড়ে পড়ে গেল, তার দাঁত লেগে মাটি ছিটকে উঠল। আমার থেকে ঠিক আট ফুট দূরে পড়ে গেল হাতিটা। অভিভূতের মত আমি নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইলাম। বন্দুকবাহকের দিকে তাকিয়ে দেখি, আমার ফেলে-দেওয়া বন্দুকের গুলির কৌটাটা সে তুলে নিচ্ছে,—এটা তার নস্যির কৌটো হবে। তার হাব-ভাব দেখে মনে হচ্ছে না এ ব্যাপারে সে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হয়েছে। সাসীতার সহজ বুদ্ধি এই বলে যে আমার গুলি কখনো ব্যর্থ হতে পারে না,—শক্তিশালী অস্ত্রধারী যে শ্বেতাঙ্গ, তার কোন কিছুতেই অনিষ্ট হওয়া সম্ভব নয়। হায়, আমার নিজের যদি আমার সম্বন্ধে এমন দৃঢ় বিশ্বাস থাকত!

অপর হাতিটা দেখা গেল, যেখানে প্রথম হাতিটা দাঁড়িয়ে ছিল তার কাছে মরে পড়ে রয়েছে।

সাসীতার কাছে শুনলাম, যে মুহূর্তে আমি বন্দুকটা ভেঙেছিলাম সেই মুহূর্তেই হাতিটা তাড়া করেছিল। বন্দুক ভাঙার ঐ যৎসামান্য শব্দেই সে সজাগ হয়ে উঠেছিল, যদিও সে আমার গুলি করার শব্দ, এমনকি সেই গুলি গায়ে লাগার আঘাত পর্যন্ত উপেক্ষা করেছিল। ঝোপঝাড়ের মধ্যে তার পায়ের দাগ লক্ষ্য করে বুঝলাম, সেই দুর্ভেদ্য ঝোপ থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসে মাত্র দুটো পদক্ষেপে সে একেবারে আমার উপর এসে পড়েছিল।

মরা হাতিটার উপর বসে-থাকা কয়েকটা উকুন-জাতীয় অদ্ভুত পোকা লক্ষ্য করছি, এমন সময় সেই ঘন ঝোপের উপর দিয়ে তরঙ্গোচ্ছ্বাসের মত একটা শব্দ আমার কানে এল। মুহূর্তের জন্যে বুঝতে পারলাম না এ কিসের শব্দ। তারপর খেয়াল হল, এ হচ্ছে হাতির পালের আমাদের দিকে এগিয়ে আসার শব্দ।

তাহলেও কিন্তু আক্রমণ এ নয়। বুঝলাম ব্যাপারটা। কয়েকজন স্থানীয়

বাসিন্দা কোন রকমে হ্রদের সামনের দিকে গিয়েছে, আর মানুষের গন্ধে ভয় পেয়ে হাতির পাল তাদের দিকে পেছন ফিরে দৌড় লাগিয়েছে। মাত্র কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ওরা আমাদের উপর এসে পড়বে।

আর পালাবার সময় নেই। তা ছাড়া, কোন হাতির দিকে পেছন ফিরতে আমার যথেষ্ট আপত্তি, কারণ অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে, কিছুমাত্র শব্দ না তুলেই তারা অতর্কিতে পেছন থেকে এসে শুঁড় দিয়ে গলা জড়িয়ে ধরে। আমার হাতে ছিল গিব্‌স্‌-এর ৫২৫নং বন্দুক—এর ৫১৫ গ্রেনের নিরেট গুলির উপর আমার প্রচুর ভরসা, আক্রমণ প্রতিহত করার অদ্ভুত এর ক্ষমতা। তাই আমরা নীরবে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

পাঁচটা হাতি দল বেঁধে ঝোপ জঙ্গল ভেঙে বেরিয়ে এসে মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়ালো যেখানে প্রথম হাতিটা মরে পড়েছিল সেই জায়গাটায়। হাতিটাকে মৃত দেখে তারা পর-পর কয়েকটা তীক্ষ্ণ চিৎকারে আকাশ চিরে ফেলল। তারপর বাকি হাতিগুলোও ঝোপ ভেঙে সবেগে ধেয়ে এল। গুলি যা চলল তা যেমন দ্রুত তেমনি ভয়ঙ্কর। সামনের দুটো হস্তিনী বন্দুকের দুটো নলের গুলিতে পড়ে গেল। স্পষ্ট দেখলাম, সেই ভারি গুলির ধাক্কায় তাদের মাথা কেঁপে উঠল।

আমাদের সামনে আর দুই পাশে হাতির দেহের স্তূপ পড়ে রইল। হাতিদের ফিনকি-দেওয়া রক্তে সাথীতার আর আমার দেহ রক্তাক্ত হয়ে গেছে, কিন্তু তবুও তাদের একেবারে মেরে ফেলবার মত সময়টুকুরও তখন আমাদের একান্ত অভাব। রাইফেলের নল এত গরম হয়ে উঠেছে যে আমার বাঁ হাতে ভীষণ ফোস্কা পড়ে গেছে, যদিও সে-মুহূর্তে আমি কোন ব্যথাই অনুভব করতে পারিনি।

শেষ পর্যন্ত যখন হাতির পাল পালিয়ে গেল, দেখা গেল বারোটা হাতির মৃতদেহ ইতস্তত পড়ে রয়েছে। কিছুক্ষণ পরে স্থানীয় বাসিন্দাদের সাড়া পাওয়া গেল। ঝোপের অন্তরালে যেখানে তারা লুকিয়ে ছিল সেখান থেকে আমাদের ডাকছে,—কিছুতেই তারা বেরিয়ে আসবে না যতক্ষণ না আমাদের কাছ থেকে কোন ভরসা পাচ্ছে।

মরা হাতিগুলোর কাছে উপস্থিত থেকে লক্ষ্য করতে হল যাতে দাঁতগুলো ঠিকভাবে ছাড়ানো হয়। অপর্যাপ্ত টাটকা মাংসের সংবাদটা এদিকে জঙ্গলের টেলিগ্রাফে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই দেখা গেল,

ছ-শোর বেশি মানুষ এসে হাতিগুলোকে ঘিরে ফেলেছে। কুড়ি মাইল দূর থেকে এসেছে এমন মানুষও আছে তাদের মধ্যে। নিতান্ত নাবালক থেকে আরম্ভ করে থুথ্থুড়ি বুড়ি পর্যন্ত সব বয়সের মানুষের আমদানি হয়েছে। ঘন ঝোপ ভেঙে কী করে যে এই বৃদ্ধ বৃদ্ধার দল এখানে এল তা আমার ধারণার বাইরে।

প্রখর রোদে ইতিমধ্যেই মরা হাতিগুলো থেকে দুর্গন্ধ আসতে শুরু করছে। কিন্তু তাতে কারো কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। হাতিগুলোর উপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ল তারা। চারিদিকের নোংরা, রক্তাক্ত দৃশ্যের দিকে কারো লক্ষ্য নেই, পাগলের মত সবাই হাতিদের দেহ থেকে বড-বড মাংসেব টুকরো কেটে নিয়ে থলি ভরতে ব্যস্ত।

আমার যা কিছু উৎসাহ সে কেবল হাতির দাঁতেব ব্যাপারে। এদিকে ওদেব মধ্যে ঝগড়া এবং ঝগড়া থেকে ক্রমশ মারামারির উপক্রম হল। প্রচুর চেঁচামেচি আর হৈ-হল্লা শোনা যেতে লাগল।

মাংসের পরিমাণ দেখে আমার মনে হয়েছিল এতে হয়ত সারা কেনিয়ার সকলের সপ্তাহের পর সপ্তাহ চলবে, কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্য হলাম যখন দেখলাম যে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই হাতিগুলোর শুধু হাড় ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। যেসব মাংস আশেপাশের গ্রামেব স্ত্রীলোকেরা বয়ে নিয়ে গিয়েছিল, তাদের রক্তে সমস্ত পথ লাল হয়ে গেল।

হাতির দাঁতগুলো সংগ্রহ করে দু-একদিন তাঁবুতে কাটিয়ে আমি সঙ্গীদের নিয়ে ফেরার পথ ধরলাম। রেলপথ লক্ষ্য করে অগ্রসর হলাম উত্তর দিকে। একটা ছোটখাট সাফারির দলের দেখা মিলল। বিমর্ষভাবে চলেছে তারা। সে দলে ছিল ভাঙ্গা থেকে আসা এক লিউয়া সর্দার, দু-জন কম্পাউণ্ডার আর একজন ভারতীয়, তিনি হলেন পোস্ট-মাস্টার। দুঃখের সঙ্গে বললে সর্দার, 'জন. এ. হাণ্টার নামক জনৈক শ্বেতাঙ্গ শিকারী একদল পলায়মান হাতির পায়ের চাপে মারা পড়েছেন, তাঁর দেহাবশেষ সংগ্রহ করে নাইরোবিতে পাঠাবো বলে আমরা চলেছি।'

ওর কথা শুনে আমি বললাম, 'আহা, দেহাবশেষটুকুর জন্যে একটু পানীয়ও তো নিতে পারতেন!'

একথা শুনে যে বিস্ময়-বিহ্বল ভাব ওর মুখে ফুটে উঠেছিল, তা দেখে ভারি মজা পেলাম। মনে হল, পোস্ট-মাস্টারের বিস্ময়ের সঙ্গে যেন খানিকটা হতাশাও মেশানো। এক হস্তিশিকারীর দেহাবশেষ সংগ্রহ করতে এত দূর থেকে তাঁরা

এসেছেন, অথচ এভাবে আমি তাঁদের ঠকিয়ে দিলাম! তাই আমি ভদ্রলোকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলাম, আর তিনিও তা ভালভাবেই গ্রহণ করলেন। আর কিছু না হোক, ওঁরা যে সদিচ্ছাপ্রণোদিত হয়েই এসেছিলেন তার অন্তত প্রশংসা করতে হবে। আর এটুকু জেনে আমি খুশি হলাম যে যদিবা আমার একটা ভালমন্দ কিছু হয় তো আমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ভালভাবেই সম্পন্ন হবে।

আশ্চর্য ক্ষিপ্রতার সঙ্গে আফ্রিকার জঙ্গলের মধ্যে খবর ছড়িয়ে পড়ে। হাতির পালের দৌড়ের সময় যেসব বাসিন্দা মহা আতঙ্কে নিকটস্থ গ্রামে পালিয়ে গিয়েছিল, আমার মারা যাবার গুজব ছড়িয়েছিল তারাই। খবরটা সেখান থেকে একটা ছোট স্টেশনে, আর সেই স্টেশন থেকে নাইরোবিতে গিয়ে পৌঁছয়। নাইরোবির নিকটস্থ যে কনভেন্ট-এ আমার মেয়ে পড়ে, এ খবরটা সেখানে সত্য বলে ঘোষিত হয় এবং আমার পরিবারের প্রতি সহানুভূতিতে প্রার্থনা জানানো হয়।

হাতির দাঁত নিয়ে কুলিরা এগিয়ে আসছে, তাদের পেছনে ফেলে আমি তাড়াতাড়ি মোম্বাসায় গিয়ে উপস্থিত হলাম। আমিও পৌঁছলাম, আর হিল্ডাও ট্রেন থেকে নামল। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, হিল্ডার পরনে শোকের পোশাক নেই। তাকে বলেছিলাম শিকারে যদি আমার মৃত্যু হয় তাহলে যেন শোকের পোশাক না পরে, কথাটা মনে রেখেছিল সে। মুহূর্তকাল আমরা তাকিয়ে রইলাম পরস্পরের দিকে, পরক্ষণেই হিল্ডা আমার কাছে ছুটে এল। সাঙ্গ-পাঙ্গদের নিয়ে বনে বনে ঘুরতে যত ভালই লাগুক, এ কথা ভাবতেও বেশ ভালই লাগে যে এমন একজন অন্তত আছে, আমার ফিরে আসার ব্যাপারে যার উদ্বেগের অভাব নেই।

॥ ৯ ॥ ফুমুন্ডে দ্বীপ

আমি জম্বু থেকে ফিরে আসার পর হিল্ডা আর আমি ঠিক করলাম, দ্বিতীয়বার আমরা মধুচন্দ্রিকা যাপন করব। একটা ভাল বোর্ডিং স্কুল ছিল, ছেলে-মেয়েদের সেখানে রেখে গেলাম। ছোটটির বয়স তখন মাত্র ছ-বছর। ভাগ্য-গুণে আমরা বাড়িতে কাজ করার জন্যে খুব ভাল লোকজন পেয়ে গিয়েছিলাম। আফ্রিকায় একটা বিশেষ সুবিধে এই যে এখানে কখনো ভৃত্যের অভাব হয় না।

আমাদের বাড়িতে যারা কাজ করে সবাই ছিল বনের বাসিন্দা, হিল্ডার হাতে শিক্ষা পেয়ে তারা কাজের লোক হয়ে উঠেছিল। শহুরে বাসিন্দাদের উপর আমরা নির্ভর করতে পারতাম না। অনবরত ধনী টুরিস্টদের সান্নিধ্যে থাকার ফলে নাইরোবির মত বর্ধিষ্ণু শহরের কর্মচাঞ্চল্যের মধ্যে ভৃত্য একটা রীতিমত সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু আমাদের শিক্ষিত ভৃত্যদের উপর আমরা নির্ভর করতে পারতাম, জানতাম যে আমাদের অনুপস্থিতিতে তারা কাজ চালিয়ে যেতে পারবে।

ছুটি কাটানোর উপযুক্ত অপূর্ব একটা জায়গার সন্ধান আমার জানা ছিল। উগাণ্ডার শিকার পরিদর্শক ক্যাপ্টেন চার্ল্‌স্ পিটম্যান বলেছিলেন লেক ভিক্টোরিয়ার ছোট্ট দ্বীপ ফুম্‌ভেতে গিয়ে কিছু পাখি আর কিছু ছোট ছোট স্তন্যপ প্রাণী সংগ্রহ করে আনতে। ফুম্‌ভে দ্বীপে বিশেষ কেউ যায় না, ওখানকার একমাত্র বাসিন্দা হল এগারো ঘর স্থানীয় মানুষ। জায়গাটা পছন্দ হয়ে যাওয়ায় ওরা কয়েক বছর হল ওখানে গিয়ে বসবাস করছে। একজাতের দুষ্প্রাপ্য অ্যান্টেলোপ এখানে পাওয়া যায়, যার নাম সিতুতুঙ্গা, একটা মিউজিয়ম এদের কয়েকটা নমুনা সংগ্রহ করতে ইচ্ছুক।

হিল্‌ডা ঠিক বুঝতে পেরেছিল যে বিনা শিকারে আমি ওখানে বড় জোর দিন সাতেক থাকতে পারব, তার বেশিদিন থাকতে হলে অস্থির হয়ে উঠব। বন্দুক সঙ্গে নেবার মত অছিলাও মিলছে না দেখে আমি অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করছিলাম। তাই যখন কিছু সংগ্রহের তাগিদ এল, নিশ্চিন্ত হলাম আমি। আরো একটা সুবিধে এই হল যে এই সুযোগে আমার স্কটল্যাণ্ড থেকে আনা পুরোনো পার্ডি বন্দুকটা ব্যবহার করা যাবে। বহুদিন ওটা অনাদৃত হয়ে পড়ে রয়েছে। পার্ডিটা খাপ থেকে খুলতেই আমার মনে হল যেন ছুটি মিলেছে।

নাইরোবি থেকে উত্তর-পশ্চিমে যাত্রা করে এনটেবি থেকে একটা স্টীমার ধরা হল। বেশ কয়েক সপ্তাহের মত যাওয়া হচ্ছে, তাই যা কিছু দরকার হতে পারে সবই সঙ্গে নিচ্ছি—ছুঁচ থেকে বন্দুক পর্যন্ত কিছুই বাদ নেই। কোন স্টীমারই নিয়মিতভাবে ফুম্‌ভে যায় না, সুতরাং এই ক-দিন আমরা বহির্জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকব।

আমাদের স্টীমারের নাম হল এস্. এস্. পার্সি অ্যাণ্ডারসন। মাসে দু-বার করে সে প্রধান দ্বীপ সিসিতে যাওয়া আসা করে, তার কাজ হল চিনেবাদাম আর কলা বোঝাই হয়ে ফিরে আসা। উগাণ্ডা নৌবিভাগের সঙ্গে বিশেষ

বন্দোবস্ত করে ঠিক করা হল, নিয়মিত কাজ সেরে স্টীমারটা আমাদের ফুম্‌ভেতে নামিয়ে দেবে, আর দু-মাস পরে এসে আমাদের নিয়ে যাবে।

একটা থেকে আর একটা, এভাবে অনেকগুলো ছোট ছোট দ্বীপে আমাদের স্টীমার থামল। প্রতি জায়গায় থামল কয়েক ঘণ্টা করে, মাল তোলবার জন্যে। মাল যা উঠল তার বেশিরভাগই মনে হল এক ধরনের ধূসর রঙের তোতাপাখি, তার লেজ লাল। শুনলাম এই পাখিগুলোই নাকি পৃথিবীর অন্য সমস্ত পাখির মধ্যে ভাল কথা কইতে পারে, মোম্বাসার বাজারেই নাকি এগুলো এক একটা বিক্রি হয় পাঁচ পাউণ্ড করে। ওবা এখানে বাসা বাঁধতে এলে স্থানীয় বাসিন্দারা অগুনতি পাখি ধরে ফেলে। আমার মনে হল ভাল জাতের একটা আফ্রিকান গ্রে-র দাম যুক্তরাষ্ট্রে ছ-শো ডলার পর্যন্ত উঠবে। একটা বহুপ্রচলিত কাহিনী শোনা যায় যে বিক্রি করবার আগে নাকি স্থানীয় বাসিন্দারা ওদের কাঁচের গুঁড়ো খাইয়ে দেয়, যাতে ওরা বেশি দিন না বাঁচে—এভাবে ওরা পাখির চাহিদা বজায় রাখে। এ কাহিনীর কতটা সত্য তা আমি বলতে পারব না।

গ্রীষ্মের দিনে হ্রদের তীর ঘেঁষে স্টীমারে ঘুরতে খুব আরাম। সম্পূর্ণ নতুন, এবং অতি অপূর্ব এখানকার পরিবেশ। বড-বড় মরকত মণির মত সবুজ প্যাপিরাসের ঘন ঝোপে তীরভূমি ছাওয়া,—এক-একটা গাছ প্রায় কুড়ি ফুট উঁচু। সেই জঙ্গলের পাশ দিয়ে আমাদের স্টীমার চলল। ছোট ছোট সঙ্কীর্ণ খাল সেই জঙ্গলের ভিতর দিয়ে চলে গেছে,—এত সঙ্কীর্ণ সে খাল যে ক্যানো ছাড়া অন্য কোন জলযানের সেখান দিয়ে প্রবেশ করা অসম্ভব। রাশি রাশি জলপদ্মে খালের জল ভরে রয়েছে, অপূর্ব অপূর্ব রক্তাভ পদ্ম এখানে ওখানে ফুটে রয়েছে। চারিদিকে কেবল পাখি আর পাখি। সামুদ্রিক পাখি কর্মোর‍্যাণ্ট আর দীর্ঘগ্রীব সর্পপক্ষী শ-য়ে শ-য়ে ছোট-ছোট গাছের ডালে ডানা মেলে বসে রৌদ্র উপভোগ করছে। ভয়-পাওয়া আইবিসের ঝাঁক পালাতে শুরু করল, পেলিক্যানরা ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে নিস্তরঙ্গ জলের উপর দিয়ে আস্তে আস্তে চলে গেল। আরো কত পাখি চারিদিকে! কখনো বা দেখা গেল কোন মাছ-মারা ঈগল; তাদের মাথা আর বুক সাদা,—উঁচু গাছের ডালে বসে শান্ত হয়ে বিশ্রাম করছে,—খিদে পেলে তবে তারা মাছ ধরবে।

সূর্যাস্তের গরিমায় আকাশে অপূর্ব বর্ণচ্ছটা, আসন্ন গোধূলির আভা যেন জলের কলধ্বনির সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে উঠেছে। এমন পরিবেশে মানুষ প্রিয়জনের সান্নিধ্যের জন্যে উন্মুখ হয়ে ওঠে।

একদিন সন্ধ্যার দিকে স্টীমার ফুম্‌ভেতে নোঙর ফেলল। একসার চোরা পাহাড়ে বন্দরটা ঘেরা; তাই যখন শুনলাম কোন্ পথে দ্বীপে যাওয়া যায় এ নিয়ে এক স্থানীয় নাবিকের সঙ্গে ক্যাপ্টেনের তর্ক চলছে, একটু চিন্তিত হয়ে পড়লাম, কারণ এই আধ মাইল পথ সাঁতরে যাবার ইচ্ছে আমার নেই, বিশেষত এইজন্যে যে জল এখানে অসংখ্য কুমিরে ভর্তি। জাহাজে আলো বলতে কেবল দুটো প্রাচীন ডিজ লণ্ঠন, তাই আমি তাড়াতাড়ি আমার দুটো সাফারির আলো এনে দিলাম। তখন সেই সমস্ত বাতির মিলিত আলোয় কোনরকমে গিয়ে বন্দরে পৌঁছনো গেল।

স্টীমারের আলো দেখতে পেয়ে দ্বীপবাসীরা তীরে এসে আমাদের পথ দেখাবার জন্যে আগুন তৈরি করল। একটা ক্যানো তীর থেকে এগিয়ে এল, কয়েকজন দ্বীপবাসী এল তাতে করে,—তাদের এই বিচ্ছিন্ন বন্দরে স্টীমার যে কী কাজে আসতে পারে এ তারা ভেবেই পেল না। এর উপর আবার যখন তারা শুনল যে আমরা এখানে পুরো-দু'মাস থাকব বলে আসছি, খুব আশ্চর্য হল তারা। শ্বেতাঙ্গরা যে স্মারক সংগ্রহের বা ব্যবসায়ের কাজ ছাড়া কোথাও যেতে পারে, এ ছিল তাদের ধারণার বাইরে। তারা বিশ্বাসই করতে চায় না যে নিছক বিশ্রামের জন্যেই আমরা এখানে এসেছি।

কয়েকটা বড়-বড় গাছের ছায়ায় আমাদের তাঁবু খাটানো হল, আমরা সংসার পাততে ব্যস্ত হয়ে উঠলাম। একটা পুরো সপ্তাহ স্রেফ বিনা কাজেই কাটল; এই নতুন পরিবেশ উপভোগ করেই কাটালাম। ভোরে ঘুম ভাঙত হাজার হাজার রক্তপুচ্ছ তোতাপাখির তীক্ষ্ণ চিৎকারে। আমাদের সাড়া পেয়ে ভৃত্যেরা সকালবেলা নিঃশব্দে এসে তাঁবুতে গরম চা দিয়ে যেত। স্নানের পর হত প্রাতরাশ। সারাটা সকাল কাটত দ্বীপের বিভিন্ন রকমের পাখি আর ছোট ছোট জন্তুদের দেখে। সিতুতুঙ্গা অ্যান্টেলোপ ছাড়া বড় জন্তু বলতে বিশেষ কিছুই ওখানে ছিল না, যদিও অবশ্য সমুদ্রতীরের নলখাগড়ার ঝোপের মধ্যে দেখা যাচ্ছিল জলহস্তীর দল খেলে বেড়াচ্ছে, কখনো বা ওদের বালির উপর রোদ পোহাতেও দেখা গেল। মেঘলা দিন ছাড়া, বা রাত্রের খাবার সময় ছাড়া তারা পারতপক্ষে জল থেকে বেশি দূরে যেত না।

সাধারণ মানুষের যা ধারণা, আসলে কিন্তু জলহস্তীর দেহের শক্তি তার থেকে অনেক বেশি। পূর্ণদেহ জলহস্তীর শারীরিক শক্তি গণ্ডারের চেয়ে কম নয়। একবার হ্রদের ধারে এক জলহস্তী আর এক গণ্ডারের লড়াই হয়েছিল—দুটোই

পুরুষ, পূর্ণবয়স্ক। লড়াইয়ে দুটোরই মৃত্যু হয়। জলহস্তী তীরে এসেছিল বড় বড় ঘাস খেতে, সেখানে সে গণ্ডারের সম্মুখীন হয়,—গণ্ডার এসেছিল জল খেতে। কেউ রাজি নয় কাউকে পথ ছাড়তে। নিশ্চয়ই এক তুমুল লড়াই হয়ে থাকবে। জলহস্তীর প্রচণ্ড কামড়ে গণ্ডারের পিঠ অত্যন্ত যখম হয়েছিল, আর গণ্ডারের খড়্গের আঘাতেও তেমনি জলহস্তীর সর্বশরীর ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছিল। মাত্র কয়েক ফুটের ব্যবধানে দুটো মৃতদেহ পড়ে ছিল, সম্পূর্ণ অনাবশ্যক এক লড়াইয়ের ফলে। তবে হ্যাঁ, আত্মসম্মানের একটা প্রশ্ন ছিল বৈকি!

নলখাগড়ার মধ্যে ছিল খুদে-খুদে একজাতের হাঁস। শান্ত পরিবেশের প্রাণী তারা, আমাদের দেখে কোন ভয় পেল না। এই পাখিগুলো আমার অত্যন্ত প্রিয়। কতরকমের পাখি যে এখানে আছে তা গুণে শেষ করা যায় না। এক-এক ঝাঁকে এমনকি এক হাজারটা পর্যন্ত পাখি দেখা গেল।

ফুম্‌ভের চতুর্দিকের জলে অসংখ্য কুমির। জলের উপর ভেসে-থাকা তাদের মাথা দেখে মনে হয়, জলে-ভাসা কাঠের টুকরো কতগুলো। আঠারো ফুট লম্বা অতিকায় প্রাণী থেকে শুরু করে বড়-সড় গিরগিটির মত কুমিরেরও দেখা মিলল। তাদের রঙেও প্রচুর বৈচিত্র্য,—কালচে বাদামি থেকে শুরু করে হলদেটে সবুজ—কত রঙের কুমির! কুমিরই বোধহয় একমাত্র প্রাণী যে মানুষ আর তার স্বাভাবিক শিকারের মধ্যে কোন তারতম্য মানে না।

কুমির শিকার করে অনেকবারই তার পেটের ভিতরে আদিবাসিদের অলঙ্কার পেয়েছি; আর বুনো শুয়োরের খুর, অ্যান্টেলোপের শিং আর হরেক রকমের পাথর তো হামেশাই পাওয়া যেত। কেন এরা পাথর খায় বুঝতে পারি না, হজমের কাজে সাহায্য করে বলে হয়ত,—যে কারণে উটপাখি পাথরের নুড়ি গিলে থাকে।

দ্বীপে থাকতে আমি হিল্‌ডার সান্নিধ্য থেকে দূরে ছিলাম শুধু সেই সময়টুকুই যখন আমি দুটো সিতুতুঙ্গা অ্যান্টেলোপের নমুনা সংগ্রহ করতে গিয়েছিলাম। হ্রদের তীর অঞ্চলে একসময়ে এদের প্রচুর পাওয়া যেত, কিন্তু এখন এরা অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছে, স্থানীয় বাসিন্দারা এদের প্রায় শেষ করে এনেছে। নল-খাগড়ার ঝোপে জাল ফেলেছে, আর ওদের তাড়া করে সেই জালে এনে ফেলেছে,—এভাবে ওদের ধরেছে। কয়েকটা অ্যান্টেলোপ হ্রদ সাঁতরে ফুম্‌ভে দ্বীপে এসে পৌছয়। এখানে ওদের প্রচুর বংশবৃদ্ধি হয়, কারণ যে-অঞ্চলে ওরা

চরে বেড়ায়, স্থানীয় বাসিন্দাদের নিক্ষিপ্ত বল্লমের আওতার বাইরে সে জায়গা।

একটা হালকা রাইফেল নিয়ে আমি একদিন সকালে বেরিয়ে পড়লাম। জঙ্গল এত ঘনসন্নিবদ্ধ, যে পাছে পথ হারিয়ে ফেলি সেই ভয়ে গাছে গাছে চিহ্ন রেখে অগ্রসর হতে হল। জঙ্গলের মাঝে মাঝে বেশ খানিকটা করে ফাঁকা জায়গা আমার চোখে পড়ল যেখানে চরে খাবার চিহ্ন বর্তমান। কিন্তু তখন মাত্র বেলা দুপুর, তখনো ওদের খেতে আসার সময় হয়নি। পাঁচটা পর্যন্ত বিশ্রাম করবার পর আবার আমরা ওদের খোঁজে চললাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল, একটা সিতুতুঙ্গা ঐরকম একটা ফাঁকা জায়গায় চরে বেড়াচ্ছে,—আমার থেকে প্রায় পঞ্চাশ গজ তফাতে। শিকারের পিছু নেবার ব্যাপারে আমার নিজের উপর একটু বেশিমাত্রায় আস্থা ছিল, তাই চেষ্টা করলাম ওর আরো কাছে যেতে। গুঁড়ি মেরে অগ্রসর হলাম ওর দিকে। হঠাৎ অ্যান্টেলোপটা লাফাতে লাফাতে আমার পেছনে চলে গিয়েই সোজা বনের মধ্যে ঢুকে পড়ল। আমি গুলি করলাম, কিন্তু সে গুলি লাগল না, উপর দিয়ে চলে গেল; বোকার মত লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে হল। আবার সন্ধান শুরু করলাম। এবার আমাদের ভাগ্য ফিরল। একটা অল্পবয়স্ক পুরুষ-সিতুতুঙ্গা ঘাস খাচ্ছিল—এত বড়-বড় সে ঘাস, যে দেখা গেল শুধু তার পিঠটা আর শিং-এর সাদা ছুঁচলো অগ্রভাগটা। বসে পড়ে শিস দিতেই অমনি সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালো সে,—এখন আর গুলি করার কোন অসুবিধে হল না। সে-ই হল আমার প্রথম স্মারক।

অ্যান্টেলোপটার উচ্চতা কাঁধ পর্যন্ত প্রায় চুয়াল্লিশ ইঞ্চির কাছাকাছি। তার গায়ের লোম লম্বা লম্বা, মসৃণ, ঘন বাদামি রঙের। আমার নজর ছিল বিশেষ করে তার খুরগুলোর উপরেই। কয়েক পুরুষ আগে, যখন ওরা প্রধানত জলা অঞ্চলে থাকত, ওদের পায়ের খুর ছিল অনেকটা লম্বা, ছ-ইঞ্চির বেশি তো বটেই। খুর বড় হওয়ায় সে জলার উপর দিয়ে ছুটতে পারত, পা বসে যেত না। অর্থাৎ তুষারের জুতো মানুষের যে কাজে লাগে আর-কি। কিন্তু কয়েক পুরুষ এই দ্বীপে বসবাসের ফলে এখন আর ওদের খুর অত বড় নয়, সাধারণ অ্যান্টেলোপের খুর যত বড় হয় প্রায় সেই মাপেরই। আর কয়েক পুরুষের মধ্যেই দেখা যাবে যে ওর খুর আর একটুও বড় নেই।—এই উদাহরণ থেকেই দেখা যাচ্ছে কিভাবে প্রাণীরা অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে থাকে।

মাত্র দুটো সিতুতুঙ্গা অ্যান্টেলোপ আমি সংগ্রহ করলাম। এই দ্বীপে এসে ওরা আশ্রয় পেয়েছে, অনর্থক আর ওদের মারতে ইচ্ছে হল না।

আর পাখি সংগ্রহ করলাম দু-হাজারেরও বেশি। পাখির ব্যাপারে ক্যাপ্টেন পিটম্যানেব উৎসাহের অন্ত ছিল না। সুপারলেটিভ সান্‌-বার্ডও ছিল ওদের মধ্যে—এরা হল এই জমকালো পাখিদের সবচেয়ে সেরা। অনেক রকমের রেল-বার্ডও সংগ্রহ করলাম, কারণ আমি জানতাম যে ক্যাপ্টেন পিটম্যান এগুলো পেযে খুব খুশি হবেন।

এক রাত্রে এক প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টির মাতন আমাদের শান্তিপূর্ণ দিনগুলোর মধ্যে দিয়ে বয়ে গেল,—এছাড়া আর কোন অশান্তি ক-দিনের মধ্যে দেখা দেয় নি। তাঁবুর চতুর্দিকের বড় বড় গাছগুলোর সে কী দোল খাওয়া! কত ডাল ভেঙে পড়ে গেল,—একটা বড় ডাল আর-একটু হলেই আমাদের তাঁবুর উপর পড়ত, তাঁবুর কাছেই মাটির উপর পড়ে সেটা বর্শার মত গেঁথে গেল। হ্রদের বিক্ষুব্ধ জল বিদ্যুতের চমকে ঝলমল করে উঠল। গাছের ডালগুলো এত দুলছিল যে তোতাপাখিরা পর্যন্ত তার উপর বসতে না পেরে মহা চিৎকার শুরু করল। সে এক ভয়ঙ্কর দুর্যোগের রাত, যদিও ভাগ্যক্রমে আমাদের কোন ক্ষতি হয়নি।

ফেরার সময় যখন হল, এস্. এস্. পার্সি অ্যাণ্ডারসন এল আমাদের নিয়ে যেতে। আমাদের চলে যেতে দেখে দ্বীপবাসিরা যেমন দুঃখিত হল, আমরাও তেমনি দুঃখিত হলাম তাদের ছেড়ে আসতে। ছুটি উপভোগ করার উপযুক্ত এত চমৎকার জায়গা আর কোথাও দেখিনি। এখানে পোকার উৎপাত নেই বললেই চলে—যে ব্যাপার আফ্রিকায় অত্যন্ত দুর্লভ। সাঙ্ঘাতিক ৎসেৎসে (Tsetse) মাছিরও কোন চিহ্ন এখানে দেখা গেল না। হিল্‌ডা আর আমি বেরিয়ে পডলাম, স্থির করলাম আবার ফিরে আসব এখানে। কিন্তু হায়, আব তা হয়ে ওঠেনি। কিন্তু এখন মনে হয় যে আর সেখানে না গিয়ে একরকম ভালই করেছি, কারণ দ্বিতীয়বার আর হয়ত ও জায়গা অমন অপূর্ব বোধ হত না এবং ফলে হয়ত হতাশ হতে হত, কারণ সেই থেকে ওর স্মৃতি আমাদের মনের মণিকোঠায় আদর্শস্থানীয় হয়ে রয়েছে।

যুম্‌ভে থেকে ফিরেই কেনিয়াব শিকাব-বিভাগ থেকে ক্যাপ্টেন রিচির লেখা একটা চিঠি পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে দেখা কবতে গেলাম তাঁর সঙ্গে। শিকার-বিভাগ তখন আর-একটা নিযন্ত্রণেব ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিল। নাইরোবি থেকে শ খানেক মাইল তফাতে টমসন্‌স্ ফল্‌স্ অঞ্চলে একপাল মোষ প্রচুর অনিষ্ট কবে চলছিল। খেত খামাব ধ্বংস কবছিল, মানুষ জন মাবছিল। ক্যাপ্টেন বিচি তাই স্থির কবেছেন এ দলটাকে শায়েস্তা করতে হবে।

এই মোষগুলোকে মাববাব সিদ্ধান্ত নিলেও এখানকাব যাবতীয় মোষের সুবিধে অসুবিধের দিকে ক্যাপ্টেন বিচির দৃষ্টি ছিল। এই মোষের দল অত্যন্ত অনিষ্টকর হয়ে উঠেছে বলেই ক্যাপ্টেন রিচি চাষীদেব সুবিধেব জন্যে চাইছেন যাতে ওদেব সংখ্যা নিযন্ত্রণ করা যায়।

অনেক শিকারীর মতে মোষই হল আফ্রিকাব সবচেয়ে ভযঙ্কর জন্তু। মোষের আক্রমণে প্রচুর হিংস্রতা থাকে, গুলি কবে তাকে প্রতিহত করা একবকম অসম্ভব। এক্ষেত্রে সে গণ্ডার, এমনকি হাতির চেয়েও সাজ্যাতিক। মোষের আক্রমণ ব্যাহত হয় না যতক্ষণ না সে শিকারীকে মেরে ফেলে বা তার হাতে মারা পড়ে। শয়তানি বুদ্ধিতেও কম যায না সে। প্রায়ই দেখা যায় আহত মোষ এগোতে এগোতে হঠাৎ কখন পেছিয়ে পড়ে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়ে, তাবপর সুযোগ বুঝে অতর্কিতে শিকারীকে আক্রমণ করে বসে। তাছাড়া অনেক সময় সে বিনা কারণেই আক্রমণ করে থাকে। আর অনেকটা এইজন্যেই তাকে এতটা সমীহ করে চলতে হয।

আমি এই সফরে একটা ভারি রাইফেল ব্যবহার করব ঠিক করলাম; ৫০০নং ডবল জেফ্রিটাই বেশ উপযোগী হবে। আমার মনে হয়, সবচেয়ে ভারি যে বন্দুক মানুষের পক্ষে বহন করা সম্ভব তাকেও বোধহয় মোষ শিকারের পক্ষে বাহুল্য বলা চলে না। কোন আহত মোষ হয়ত ঝোপঝাপের আড়ালে লুকিয়ে পড়তে পারে, তাই ঠিক করলাম, কুকুর সঙ্গে নেব। একে যদি কেউ অন্যায় বা অখেলোয়াড়োচিত মনে করেন তো তার উত্তরে এই বলব যে এ কাজের ভার আমার উপর ন্যস্ত হয়েছে, সুতরাং নিজস্ব গৌরবের অগৌরবের প্রশ্ন এক্ষেত্রে অবান্তর।

নাইরোবিতে যে কুকুরের সন্ধান পেলাম, কোন কাজেরই নয় সেগুলো।,

কিন্তু এর চেয়ে ভাল যখন মিলবে না তখন আমায় বাধ্য হয়েই কিনতে হল সেগুলো। পরে ঔপনিবেশিকদের কাছ থেকে এদের চেয়ে বড় আর ভাল কয়েকটা কুকুর কিনে দল ভারি করেছিলাম। কিন্তু একটা সর্দার-কুকুরের অভাব তখনও আমার ঘোচেনি—এমন একটা কুকুর, যার সাহসে আর দৃঢ়তায় সঙ্গীরা উদ্বুদ্ধ হবে। কুকুরের স্বভাবই হল কোন সর্দারকে অনুসরণ করা এবং মাত্র একটা ভাল সর্দার-কুকুরেব পক্ষেও একটা পুরো পালকে শিক্ষিত করে তোলা সম্ভব। তেমন কোন সর্দার-কুকুব না পেয়ে বাধ্য হয়েই আমার এই পাঁচমিশেলি কুকুরের পালকে নিয়ে বেরোবার জন্যে প্রস্তুত হতে হল।

যেদিন বেরোবো তার দিনকয়েক আগে এক ভদ্রলোক তাঁর প্রিয় কুকুরটিকে নিতে অনুরোধ করলেন। তিনি বললেন এটাকে নিযে অবধি তিনি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারেন নি। কুকুবটা নাকি এত ভয়ঙ্কর যে বলবার কথা নয়। অনেক মানুষকে সে কামড়েছে, গৃহপালিত পশুও অনেক মেরেছে। মালিকের বর্ণনায় যা শুনলাম তাতে তো মনে হল না ওকে দিয়ে কোন কাজ হবে। কিন্তু তখন আমার যা অবস্থা তাতে কোন কুকুরকেই বাতিল করা সম্ভব নয়। গেলাম তাকে আনতে।

প্রথম দর্শনেই কিন্তু আমার কুকুরটাকে ভাল লাগল। কুকুরটার হাড় মোটা মোটা, গায়ের রঙ বাদামি; আকৃতিতে সে অ্যালসেশিয়ানের সমান। তার চোয়াল খুব জোরালো, আর দেখলেই বোঝা যায় যে সে চোয়ালের ব্যবহার ওর ভাল করেই জানা আছে। কুকুরটাকে দো-আঁশলা বলে মনে হল, তবে, ওর মধ্যে বুল টেরিয়ারের রক্তই মনে হল বেশি। ওর নাম দিলাম বাফ,—নামটা উচ্চারণ করা বেশ সহজ এবং ঐ নামে ও সাড়াও দিল। আমার মনে হল ওকে নিযে আমার দিব্বি চলে যাবে। কুকুরটার মধ্যে প্রচুর তেজ আছে, উত্তেজনারও অভাব নেই; বাড়িতে পোষ-মানা আদুরে কুকুরের কাজ তাকে দিযে একেবারেই অসম্ভব। শহরে আটক থাকবার কুকুর সে নয়,—আমি নিজেও যে সে মনোভাব ভালভাবেই বুঝি না তা নয়; সুতরাং এর ফলে যদি বাফের মেজাজ খারাপ হয়ে থাকে এবং এজন্যে সে কয়েকটা শয়তানকে কামড়েই থাকে তো আমি অন্তত সেজন্যে তাকে দোষ দিতে পারব না।

কিছুদিনের মধ্যেই বাফ কুকুরের পালের সর্দারের ভূমিকা গ্রহণ করল। ইতিমধ্যে অনেকের সঙ্গেই তার লড়াই হয়েছিল, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই সবাই বুঝল যে বাফকে না ঘাঁটানোই বুদ্ধিমানের কাজ। কিন্তু যতই সে হিংস্র আর

দুর্দান্ত হোক না কেন, বাফ হল সত্যিকার খাঁটি কুকুর বলতে যা বোঝায় তাই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে আমার পায়ের কাছে পড়ে থাকত, আর গভীর, সতৃষ্ণ চোখ তুলে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে আমার মনোভাব বুঝতে চেষ্টা করত। যে ক-দিন নাইরোবিতে ছিলাম তার মধ্যেই বাফ আমার অত্যন্ত প্রিয় হয়ে উঠল, অন্য যেকোন কুকুরের চেয়ে বেশি। এখন শুধু দেখতে হবে মোষ শিকারের ব্যাপারে ও কতটা গুণের পরিচয় দিতে পারে,—মোষের ভয়ঙ্কর শিং আর খুর থেকে নিজেকে বাঁচাবার উপযুক্ত হয়েছে কি না।

টমসন্‌স্ ফল্‌স্-এর কাছে এসে আমি প্রথম বুঝলাম, কেন তার পুরোনো মালিক তাকে এড়াবার জন্যে এত ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। একদিন আমি কুকুরের পাল নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছি, পথে একপাল ভেড়ার সঙ্গে দেখা। একজন রাখাল তাদের নিয়ে চলেছে। ভেড়া দেখে আর বাফ স্থির থাকতে পারল না, পালের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে একটা ভেড়াকে ধরে ফেলল। দু-এক সেকেণ্ডের মধ্যেই বাফ ভেড়াটার ঘাড়ে উঠে গভীরভাবে তার গলায় দাঁত বসিয়ে দিল। তাকে জোর করে ছাড়িয়ে এনে আমার বেল্ট খুলে এমন প্রহার লাগালাম যে জীবনে সে তা ভুলতে পারেনি। একটুকুও আপত্তি না তুলে বাফ সে শাস্তি গ্রহণ করল, আর এজন্যে আমার তাকে আরও ভাল লাগল। ভেড়াটার দাম মিটিয়ে আমরা ফিরলাম; খুশিমনেই বাফ সমস্ত পথটা আমার পিছু পিছু চলল।

আমার নিয়ন্ত্রণ-শিবিরের সঙ্গে যুক্ত ছিল কয়েকজন নেরোবো স্কাউট যাদের কাজ হল জঙ্গল পরিষ্কার করা। তারা হল এক ভাগ মাসাই আর তিন ভাগ বুশম্যান। শিকারী হিসেবে কিছু গুণ তাদের আছে যা অস্বীকার করা যায় না, যদিও কিছু পশুবধ যে তারা না করে তা নয়। মাত্র কয়েক ঘণ্টা হল আমরা গ্রামে এসেছি, এমন সময় হঠাৎ তাঁবুর বাইরে এক ভীষণ সোরগোল শুরু হল। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে দেখি, বাফ একটি মেয়েকে শুইয়ে ফেলেছে, এখন সে তার কাপড় খুলে নেবার জন্যে ব্যস্ত। কাপড় বলতে তার যা ছিল তা অতি নগণ্য; কিন্তু সেই কাপড়ও বাফ ছিঁড়ে ফেলে তার শরীরে দাঁত বসিয়েছে। তাড়াতাড়ি বাফের ল্যাজ ধরে প্রাণপণে টেনে তাকে মুক্ত করে নিলাম। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি কাছের একটা কুটির লক্ষ্য করে ছুটল—তার পাছায় লাল আর সাদা চিহ্ন ফুটে উঠেছে। ভেবেছিলাম এই ব্যাপার নিয়ে ওরা প্রচুর আপত্তি জানাবে, কিন্তু দেখলাম মেয়েটির স্বামী হাসতে হাসতে

গড়িয়ে পড়ছে আর বাকি সকলেও এ ব্যাপারে খুব মজা পেয়েছে। অনেকে এসে অমন চমৎকার কুকুরের মালিক হিসেবে আমায় অভিনন্দন জানাল পর্যন্ত। তাদের ধারণা, কুকুরটার এই তেজ হল মোষ-শিকারের পক্ষে শুভ সূচনা।

ন্দেরোবোদের সঙ্গে কথা কয়ে মোষদের প্রতিশোধ-স্পৃহার অনেক কাহিনীই শুনলাম। দুটো উদাহরণ দিচ্ছি, যা থেকে পাঠক ওদের সম্বন্ধে খানিকটা ধারণা করতে পারবেন, বুঝবেন কতটা প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ওরা তাদের আহতদের আক্রমণ করে।

একজন ন্দেরোবো খোঁড়াতে খোঁড়াতে আমার কাছে আসায় আমি তাকে তার কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। লোকটা আমায় তার গোড়ালি দেখালো। গোড়ালিটা একেবারেই উড়ে গেছে,—পরিষ্কার কামড়ে ছিঁড়ে নেওয়া। ও বললে, একটা মোষের কীর্তি এটা। কথাটা তো আমার বিশ্বাসই হতে চায় না। তবে, ওর কাহিনী শোনার পর আর আমার সন্দেহ রইল না যে ও যা বলছে তা সম্পূর্ণ সত্য।

ঝোপের মধ্যে দিয়ে লোকটা তার শাম্বার দিকে চলেছে। হঠাৎ একটা শব্দ ওর কানে যেতেই ও থমকে থামল, তারপরেই দৌড় শুরু করল। পেছন থেকে খুরের শব্দ পেয়ে ও বুঝল যে একটা মোষ ওকে তাড়া করে আসছে। লোকটা বেশ খানিকটা এগিয়ে ছিল, কিন্তু ক্রমেই মোষটা ওর নিকটবর্তী হচ্ছে, খুরের শব্দ ক্রমেই জোর হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত সে মরীয়া হয়ে লাফিয়ে উঠে একটা গাছের ডাল ধরে ফেলল, আর ঠিক সেই সময়ে মোষটা সবেগে তার তলা দিয়ে ধেয়ে গেল। আবার ফিরে এল মোষটা। যেখানে লোকটা ঝুলছিল তার নিচে এসে দাঁড়িয়ে আক্রোশে ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করতে লাগল, মাটি আঁচড়াতে লাগল। লোকটা তখনও সেই অবস্থায় ঝুলছে, পাদুটো যথাসম্ভব মাটি থেকে উঁচু রেখে। কিন্তু এভাবে পা গুটিয়ে রাখা বেশিক্ষণ সম্ভব হল না। তার ডান পায়ে ঝিঁঝি ধরল, যেজন্যে তাকে মুহূর্তের জন্যে পা-টা নামিয়ে সমান করতে হল। সঙ্গে সঙ্গে মোষটা সবেগে এসে এক কামড়ে এমনভাবে তার গোড়ালিটা কেটে নিল, যেন সামান্য আগাছা একটা। তারপরে, রক্তের স্বাদ পেয়েই হয়ত, সে তৃপ্ত হয়ে চলে গেল। অর্ধচেতন মানুষটা তখনও তেমনি ডালটা ধরে ঝুলে রইল।

কাহিনীটা মনে মনে আউড়ে নিয়ে এর মধ্যে অবিশ্বাস্য কিছু দেখলাম না, কারণ দাঁত ব্যবহার না করার কোন কারণই মোষের নেই। ঘোড়া ভয়ঙ্কর

কামড় বসাতে পারে। বলতে কি, রেগে গেলে ঘোড়া পায়ের খুর দিয়ে যতটা, দাঁত দিয়েও ঠিক ততটাই ভয়ঙ্কর আঘাত করতে পারে এবং মোষ যে তার শত্রুকে কামড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলতে পারে, এমন অভিজ্ঞতাও আমার পরবর্তীকালে হয়েছে।

ক্রুদ্ধ মোষের আঘাত অনেক সময় অত্যন্ত ভয়াবহ হয়ে উঠে পর্যন্ত। একজন স্থানীয় বাসিন্দা একদিন আমার তাঁবুতে এসে আমার স্কাউটের কাজ করবে এই ইচ্ছা প্রকাশ করল। ওর সঙ্গে কথা কইতে কইতে লক্ষ্য করলাম, ওর দুই উরুর মাঝখানে একটা মসৃণ ক্ষতচিহ্ন। এর কারণ জিজ্ঞাসা করতে সে শিশুসুলভ সরলতার সঙ্গে তার কৌপিন খুলে ফেলল। আতঙ্কের সঙ্গে দেখলাম, লোকটার অণ্ডকোষের কোন চিহ্নমাত্র নেই। এই দেখে যে বিস্ময়কর শব্দ আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, তার উত্তরে লোকটি বললে যে খুব ভাগ্য ভাল তাই সে বেঁচে গেছে, মুঙ্গু (ঈশ্বর) দয়া না করলে এযাত্রা সে নির্ঘাত মারা পড়ত।

কাহিনীটা যেমন ওর মুখে শুনেছি তেমনি বলছি। একদিন ভোরে সে তার মৌচাকগুলো দেখতে বেরিয়েছে। এই চাকগুলো হল কাঠের তৈরি, অনেকগুলো খোপর তাতে। গাছের উপরের ডালে ডালে চাকগুলো বাঁধা থাকে, তাতে কোন সময়ে পাখি, কোন সময়ে সাপ, আর কোন সময়ে বুনো মৌমাছি বাসা বাঁধে। মৌমাছি যখন বাসা বাঁধে, স্থানীয় বাসিন্দারা তখন এসে মধু নিয়ে যায়, কারণ জঙ্গলের মধ্যে চিনি যেমন দুষ্প্রাপ্য তেমনি মহার্ঘ।

বড় বড় ঘাসের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে হঠাৎ সে প্রায় একটা মোষের উপর গিয়ে পড়ে। মোষটা বিশ্রাম করছিল, সঙ্গে সঙ্গে সে লাফিয়ে উঠতেই তার একটা বাঁকানো শিং লোকটার দু-পায়ের ফাঁকে লাগে আর এক ঝট্কায় সে শূন্যে ছিটকে ওঠে। তারপর সে সোজা ক্ষিপ্ত মোষটার কুঁজের উপর ঘোড়ায় চড়ার মত করে পড়ে। মরীয়া হয়ে এক হাতে মোষটার একটা কান আর অপর হাতে তার ঘাড় ধরে লোকটা কোনরকমে রয়ে গেল। ক্রুদ্ধ মোষটা তখন সবেগে দৌড়তে লাগল, আতঙ্কিত লোকটা তখনও তেমনিভাবে তাকে আঁকড়ে ধরে রয়েছে। প্রায় ষাট গজ সে তেমনি করে মোষটাকে আঁকড়ে রয়ে গেল, তারপর মোষটা একটা কাঁটা-ঝোপের উপর সবেগে ধাক্কা খেতেই সে ছিটকে পড়ে গেল।

পতনের বেগে সে প্রায় মূর্ছিত হয়ে পড়ল। চিত হয়ে পড়ে গেল সে,—

সেই অবস্থাতেই দেখল, মোষটা আবার তার দিকে ফিরে আসছে। কয়েক ফুটের মধ্যে এসে থেমে দাঁড়ালো মোষটা, তারপর মহা বেগে ছুটে গিয়ে অসহায় মানুষটির পেটে ভয়ঙ্করভাবে গোঁত্তা মারল। মোষটার শিং তার দেহে প্রবেশ করতেই সে সংজ্ঞা হারালো।

জ্ঞান যখন ফিরল, সূর্য তখন অস্তপ্রায়। তার সমস্ত শরীর আড়ষ্ট, যেন পক্ষাঘাতগ্রস্ত। অনেক চেষ্টায় এটুকু সে বুঝতে পারল যে একটা ছোট নদীর কাছে যে পড়ে রয়েছে। শরীরটাকে কোন রকমে টেনে সে নদীর ধারে গেল। একটা হাত ভেঙে গেছে, যাই হোক, ভাল হাতটা দিয়েই সে কোনরকমে জল তুলে তুলে মুখে দিল।

দু-সপ্তাহ সে পড়ে রইল সেই নদীর তীরে। জল খেয়ে, আর নাগালের মধ্যে যখন যা পেল তাই খেয়েই সে ক-টা দিন জীবন ধারণ করল। ক্ষতের কোন সুশ্রূষা করাই তার পক্ষে সম্ভব হয় নি কেবল জল ছিটোনো ছাড়া। রাতে সে গণ্ডারের জল খেতে আসার শব্দ শুনেছে, আর দু বার শুনেছে কাছে-পিঠে হস্তিনীর তীক্ষ্ণ বৃংহিত। বহুবার শুনেছে অনতিদূর থেকে হায়েনার ডাক—কখনো কান্না, কখনো বা হাসি, তবে, সে হায়েনা ভরসা করে কাছে আসে নি। কুমিররা নিঃশব্দে জলের উপর ভেসে উঠে তার কয়েক ফুটের মধ্যে এসেছে। নড়াচড়ার শক্তিটুকু পর্যন্ত তার ছিল না—তেমনি শুয়ে থেকে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর তার কিছু করবার ছিল না। কয়েক মুহূর্ত তাকে লক্ষ্য করে আবার তেমনি নিঃশব্দে তারা চলে গেছে।

অন্যান্য মধু-সংগ্রাহকেরা এসে শেষ পর্যন্ত তার দেখা পায়। গ্রামে সবাই তাকে মৃত বলে ধরে নিয়েছিল, কারণ কোন মানুষ যদি জঙ্গলে ঢুকে মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেও ফিরে না আসে, তার আত্মীয়েরা তার সমস্ত আশা ছেড়ে দেয়। তার ঘা প্রায় সেরে এসেছিল, আর যে সাঙ্ঘাতিক ক্ষতি তার হয়েছিল তার কথা বাদ দিলে আবার সে আগের মতই সুস্থ হয়ে উঠল।

যখন জিজ্ঞাসা করলাম এরপরও কেন সে মোষ শিকার করতে চায়, তার দু-চোখ জ্বলে উঠল। সে বললে, 'বাওয়ানা, শিং দেখলেই আমি সে মোষটাকে ঠিক চিনতে পারব। তখন আমি তার মাকেন্দে (অণ্ডকোষ) কেটে নিয়ে খেয়ে নেব,—যেমন সে আমার অণ্ডকোষ নিয়ে পালিয়েছিল, ঠিক হবে।'

যে মোষদের আমি মারতে এসেছি তারা ছিল মার্মানেট জঙ্গলে। এখানকার ঝোপ অত্যন্ত নিবিড়, তাই এখানে শিকার করা যেমন কঠিন তেমন বিপজ্জনক।

ফাঁকা জায়গায় আমি মোষকে বিশেষ ভয়াবহ জন্তু বলে মনে করি না, কিন্তু জঙ্গল যেখানে ঘন সেখানে অত্যন্ত ভয়াবহ সে। যাই হোক, সর্দার-কুকুর বাফের উপর আমার খানিকটা ভরসা ছিল।

নাইরোবি থেকে আসবার পর কুকুরের দলটাকে কয়েকদিন বিশ্রাম করতে দিয়ে আমি একদিন ভোরে স্কাউট আর কুকুরের দল নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। বনের সর্বত্রই মোষের অস্তিত্বের পরিচয়, তাই কিছুমাত্র ইতস্তত না করেই কুকুররা এগিয়ে চলল। মাসাই রিজার্ভের কুকুররা ছিল সিংহের চিহ্ন অনুসরণে অত্যন্ত অনিচ্ছুক। সিংহের গন্ধেই বোধহয় তারা অস্বস্তি বোধ করত। কিন্তু কুকুররা দেখা যাচ্ছে মোষের গন্ধে ভয় পায় না। কিছুক্ষণের মধ্যেই শোনা গেল ঝোপ ঝাড় ভেঙে মোষের দৌড়ের শব্দ আর তাদের পিছু-পিছু কুকুরের দলের চিৎকার করতে করতে ধাওয়া করার আওয়াজ। স্কাউটদের নিয়ে আমি চেষ্টা করলাম কুকুরের পালের যতটা কাছাকাছি থাকতে পারি। হঠাৎ একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার শোনা গেল। তাকিয়ে দেখি, মোষের শিঙের ঝাপটা খেয়ে একটা কুকুর ঝোপ ঝাড় ছাড়িয়ে শূন্যে ছিটকে উঠেছে। কোথায় সে পড়ল তা আর দেখতে পেলাম না। এভাবে অনর্থক কুকুর নষ্ট না করে ওদের ডেকে নেবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু ঐ হৈ-হল্লার মধ্যে আমার নিজের গলার আওয়াজও শোনা দুষ্কর হয়ে উঠল।

কুকুরের দলের কাছে যখন এলাম, দেখি, পাঁচটা পুরুষ-মোষকে তারা ঘিরে ফেলেছে। মোষগুলো গোল হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তাদের ল্যাজ ভিতরের দিকে আর মাথার শিং বাইরের দিকে কুকুরদের লক্ষ্য করে উদ্যত। হঠাৎ বাফ সবেগে মোষের দলকে লক্ষ্য করে ছুটে গিয়ে একটা মোষের নাক কামড়ে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে মোষটা সেই অবস্থায় একটা গাছ লক্ষ্য করে ছুটে গেল, যাতে বাফকে সেই গাছের গুঁড়ির সঙ্গে পিষে ফেলতে পারে। বাফ কিন্তু অত সহজে কাবু হবার বান্দা নয়, শেষ মুহূর্তে সে ঠিক সামলে নিল। এক গুলিতে আমি মোষটাকে শেষ করে ফেললাম।

সেই থেকে বাফ এই কৌশল অবলম্বন করে চলল। কুকুরের দল একটা কি দুটো মোষকে ঘিরে ফেলতেই বাফ একটা মোষকে আক্রমণ করে বসত, আর সোজা গিয়ে তার নাক কামড়ে ধরত। কোন কুকুর তেড়ে এলেই মোষেরা মাথা নিচু করত যাতে শিঙের পুরো ব্যবহার করতে পারে, আর এতে করে বাফের অসুবিধে না হয়ে সুবিধেই হত বরং, বেশ শক্ত করে সে তার নাক

কামড়ে ধরত। গোজাতীয় প্রাণীদের নাক সাধারণত নরম হয়ে থাকে। মনে পড়ে স্কটল্যাণ্ডে থাকতে দেখেছি, কোন দুর্দান্ত মোষের নাকের ভিতর দিয়ে দড়ি গলিয়ে কত সহজে চাষীরা তাদের নিয়ে যায়, তারা কিছুই করতে পারে না। একবার যদি বাঘ মোষের নাকটা কামড়ে ধরতে পারে তাহলেই ব্যস, কোনমতেই মোষ তাকে ঝেড়ে ফেলতে পারবে না। চারটে পা অনেকটা ফাঁক করে এমন শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সে, যে মোষটা তাকে শিঙে তোলবার সুযোগ পায় না।

পূর্ণদেহ মোষ এক অপূর্ব জন্তু, এদের এক-একটার ওজন প্রায় ২৫ মণের মতও হতে দেখা গেছে। কালো দুই শিঙের গোড়াটা মানুষের উরুর সমান, আর আগাটা ছোরার ছুঁচলো মুখের মত ধারালো। মাথা নিচু করে তেড়ে আসার সময় মোষের মাথার শক্ত খুলি সামনের দিকে উদ্যত থাকে, তার উপর শক্ত শক্ত শিংদুটো তো আছেই। এরকম ক্ষেত্রে খুব বেশি ভারি রাইফেল ব্যবহার না করলে তাকে কাবু করা মুস্কিল। মোষ শিকারের সময় আমি তার বুক, ঘাড, কাঁধ বা চোখের নিচে লক্ষ্য করে গুলি করি ; কিন্তু মোষ যখন তেড়ে আসে তখন আর অত লক্ষ্য স্থির করার সময় থাকে না, যেখানে সম্ভব সেখানেই গুলি করতে হয়।

সিংহ-শিকারেব সময় কুকুরেব পাল আমার যত কাজে এসেছিল, মোষ শিকারের সময় এই কুকুরের পাল এখন তার চেয়ে অনেক বেশি কাজে এল। এর কারণ, সিংহের আক্রমণ এড়ানোর চেয়ে মোষের আক্রমণ এড়ানো সহজ। আমার আগের দলটার বিচারবুদ্ধির চেয়ে বেশি ছিল দুঃসাহস ; খ্যাপা মোষের আক্রমণেও সরে যেত না, সটান দাঁড়িয়ে পড়ত চুপচাপ। এত ক্ষিপ্র গতিতে মোষ তার দুই শিং আর পায়ের খুর চালায় যে সঙ্গে সঙ্গে পালাতে না পারলে নিশ্চিত মৃত্যু।

আমার অনেকগুলো কুকুরই কোন না কোন সময়ে মোষের গোঁত্তা খেয়ে ছিটকে পড়েছে। কোন কুকুরকে আকাশে তুলে দিয়েই মোষ লক্ষ্য করে কোথায় সে পড়বে, তারপর সঙ্গে সঙ্গে সবিক্রমে তাকে আক্রমণ করে বসে, যাতে সে পতনের বেগ সামলাবার সময়টুকুও না পায়। দলের অন্য কুকুরগুলো তখন তার সাহায্যে আসে, মোষের কুঁজ কামড়ে ধরে চেষ্টা করে তাকে নিবৃত্ত করতে। মুহূর্তের জন্যেও যখন তারা কোন মোষকে বাধা দিতে পেরেছে তখনই আমি তাকে গুলি করার সুযোগ পেয়েছি।

মোষের দলকে প্রায়ই দেখা যায় জলা অঞ্চলে চরে বেড়াতে, তাদের সঙ্গে থাকে এগ্রেট পাখির দল। মস্ত মস্ত মোষগুলোর উপরে ওদের দেখে মনে হয় যেন সাদা কাগজের টুকরো কতগুলো। পাখিগুলো মাঝে মাঝে মোষের পিঠে চড়ে বসত, ওদের গা থেকে পোকা ঠুকরে খাবে বলেই হয়ত। বড-বড় ঘাসের আড়ালে লুকিয়ে থাকা মোষের অবস্থিতিও শিকারী কখনো কখনো উড়ন্ত এগ্রেটের নড়াচড়া থেকে আন্দাজ করতে পারে। একদল পূর্ণবয়স্ক মোষ যখন বড-বড় আবলুস-কালো শিং তুলে লম্বা লম্বা ঘাসের মধ্যে দিয়ে চলতে থাকে আর এই তুষারশুভ্র পাখির দল তাদের পিঠে কায়দা করে বসে থাকে বা গম্ভীর পদক্ষেপে তাদের সঙ্গে সঙ্গে চলে, অপূর্ব দেখায় তখন।

যদিবা কখনো কোন ফাঁকা জায়গায় একদল মোষের দেখা মেলে, গুলির পাল্লার মধ্যে ওদের পাওয়াই শক্ত আর ওদের দৃষ্টি আর শ্রবণশক্তি এত তীক্ষ্ণ যে ওদের কাছে যাওয়াই এক সমস্যা। প্রায়ই তাই কুকুরদের শিস দিয়ে লেলিয়ে দিতে হত; তারা ওদের তাড়া করে বাইরে বের করে আনত, তখন আর ওদের গুলি করা আমার পক্ষে কঠিন হত না।

কিন্তু ঝোপের ভিতরে ব্যাপার দাঁড়ায় অন্য রকম। তাড়া-খাওয়া মোষ চুপচাপ ঝোপের আড়ালে আত্মগোপন করে থাকে; আক্রমণ না করে অপেক্ষা করে থাকে, যতক্ষণ না শিকারী একেবারে তার খুব কাছে এসে পড়ছে। পাশ দিয়ে গুলি গেলেও সে একটুও নড়ে না যতক্ষণ না সে নিশ্চিত জানে সে শিকারীকে কাবু করতে পারবে। এসব ক্ষেত্রে কুকুরের প্রয়োজন অত্যন্ত বেশি। প্রায়ই তারা অপেক্ষমান মোষের গন্ধ পায় এবং সে ক্ষেত্রে চিৎকার করে সঙ্কেত জানায়, আর যখন তাও না পায়, শিকারীর আগে আগে যেতে যেতে প্রায়ই তারা মোষের সামনা সামনি হয়ে পড়ে। বলতে বাধা নেই, এই মোষ শিকারের সময় দশ-বারোবার এই কুকুররাই আমার প্রাণ রক্ষা করেছে।

বাফ শেষ পর্যন্ত একেবারে অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। ওর মধ্যে ছিল অদ্ভুত দুঃসাহস আর অপূর্ব বিচার-বুদ্ধির সংমিশ্রণ, যা অত্যন্ত দুর্লভ। সে জানত তেড়ে-আসা মোষকে পথ ছেড়ে দিতে হয়, অথচ মোষকে সে এতটুকু ভয় করত না। অস্বাভাবিক কোন পরিস্থিতির উদ্ভব না হলে এই সাহসী কুকুর কখনো সত্যিকারের বিপদ যাকে বলে তাতে পড়ত না।

একবার এই দল একটা প্রকাণ্ড পুরুষ-মোষের পিছু নেয়। কুকুরগুলো

যাকে তাতে ঘিরে ফেলতে না পারে মোষটা সেজন্যে একটা ছোট নদীর মাঝখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল, কুকুরের তাড়া-খাওয়া জন্তুরা সুযোগ পেলে যা করে থাকে আর-কি। পাড়ের উপর সার বেঁধে কুকুরগুলো দাঁড়িয়ে আছে. আর খুব সোরগোল করছে, কিন্তু সাঁতার কেটে তার কাছে যাবার সাহস হচ্ছে না। বাফ কিন্তু তেমন বান্দা নয়। তীর পর্যন্ত এসে সে মস্ত এক লাফে জলে পড়ল আর সাঁতরে গিয়ে হতভম্ব মোষটার নাক কামড়ে ধরল। তার দুঃসাহস দেখে মুহূর্তকাল অবাক হয়ে রইল মোষটা, তারপর তাড়াতাড়ি বিস্ময় কাটিয়ে বাফকে ধরে জলে চুবিয়ে দেবার চেষ্টা করল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই বাফ ডুবে মারা যেত, যদি না আমি এক গুলিতে এই অসমান যুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে দিতাম। বাফ যখন কাশতে কাশতে তীরে সাঁতরে এল, দেখলাম তার সামনের দাঁতগুলোর অগ্রভাগ ভেঙে গিয়েছে। এ থেকে আন্দাজ করা যায়, কী সাঙ্ঘাতিক তার কামড়ের জোর আর কী প্রচণ্ড তার গোঁ!

এটা নিয়ে বাফের সাহায্যে সতেরোটা মোষ মারা হল,—এদের প্রত্যেক-টাকেই সে কামড়ে ধরে রেখেছিল যতক্ষণ না সে আমার গুলিতে মারা পড়ে।

পরের বার কিন্তু বাফ মোষের কবল থেকে অত সহজে রক্ষা পায় নি। কুকুরের পাল একদল মোষকে ঘিরে ফেলে খুব চেঁচামেচি করছে আর মাঝে মাঝে তেড়ে গিয়ে কামড়ে দিচ্ছে। বাফ একবার তেড়ে গিয়ে একটা প্রকাণ্ড স্ত্রী-মহিষের নাক কামড়ে ধরল। তেমনি কামড়ে ধরে রয়েছে বাফ কিন্তু মোষটার আধা-বয়সী বাছুরটা তার ছোট ছোট শিং দিয়ে বাঘের পাজরে গুঁতোতে শুরু করল। বাফ খুব হাঁপাতে লাগল, কিন্তু তবুও কিছুতেই সে কামড় আলগা করল না। নির্ঘাত সে মারা পড়ত যদি না আমার দু-জন স্কাউট গিয়ে মোষদুটোকে গুলি করে মারত।

এই দুর্ঘটনার পর আমি বাফকে বিশ্রাম দিলাম যতক্ষণ না তার ঘা সেরে ওঠে। দু-শোরও বেশি মোষ মারা হল, ওদের নিঃশেষ করার কাজ প্রায় শেষ। আটক থাকতে বাধ্য হয়ে বাফ ফোঁস-ফাঁস করত আর সতৃষ্ণ নয়নে কেবলই তাকিয়ে থাকত যখন ওর দলের অন্য কুকুরগুলোকে নিয়ে আমি শিকারে বেরোতাম। একজন স্কাউটের উপর কুকুরের পালের জন্যে দুধ আনবার ভার ছিল, তাকে বললাম বাফকে সঙ্গে করে হাঁটিয়ে নিয়ে যেতে, কারণ, আমি দেখলাম, নতুবা হয়ত তার শরীর আড়ষ্ট হয়ে যাবে। আর তা ছাড়া কিছু কাজের ভারও তার উপর দেওয়া হল।

এমনি একটা সফরে একদিন একটা বরাহ বাফের পথে পড়ল। এই একটা প্রাণী যাকে বাফ কোনমতেই সহ্য করতে পারত না। স্কাউটের শত বারণ সত্ত্বেও সে তাড়া করল বরাহটাকে। বরাহটা তাড়া খেয়ে একটা গর্তে ঢুকে পড়ল—বরাহরা যেভাবে গর্ত ঢোকে সেভাবে—ঘুরে দাঁড়িয়ে আগে পেছনের পা দুটো গলিয়ে দিয়ে তারপর বাকি শরীরটা গলায়, যাতে তার খড়্গটা থাকে গর্তের মুখের দিকে। বাফও গর্তে প্রবেশ করতে যাবে, এমন সময় হঠাৎ বরাহটা তাকে তাড়া করে বসল। আমার স্থির বিশ্বাস যে যদি বাফের দাঁতের আগা ভেঙে না যেত তাহলে নিশ্চয় সে বরাহটাকে কামড়ে ধরে রাখতে পারত। কিন্তু তা না পারায় সেই বরাহের ঘামে ভেজা চামড়া থেকে তার কামড় আলগা হয়ে গেল অমনি বরাহের খড়্গের আঘাতে তার বুক চিরে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত্যু হল। স্কাউট বরাহটাকে গুলি করে মারল বটে, কিন্তু ততক্ষণে অনিষ্ট যা হবার হয়ে গেছে। কাছে এসে দেখলাম বীর বাফের মৃতদেহ,—এমন পরিস্থিতিতে সে-মারা পড়ল যখন আমি ধারণা করতে পারিনি যে সে কোনরকম বিপদে পড়তে পারে।

বাফের মত অমন কুকুর আর আমার ভাগ্যে জোটে নি। ওর মৃত্যুর ফলে এ অভিযান আমার কাছে বিষময় হয়ে উঠল। আশা ছিল ওর কোন বাচ্চা হয়ত ওর স্থান অধিকার করবে, কিন্তু তারা কেউই তার যোগ্য হল না। কুকুরের মায়া বড় প্রবল মায়া, সে মারা না যাওয়া পর্যন্ত ধারণাই করা যায় না কত প্রিয় সে ছিল। মাঝে মাঝে তাই ভাবি, কুকুর পোষার যে আনন্দ, তার মৃত্যু শোকের তুলনায় সে আনন্দ যথেষ্ট কি না।

দৈহিক শক্তি ও হিংস্রতার জন্যে মোষ আমার চিরদিনের প্রিয় শিকার। শুধু কেনিয়ায় নয়, উগাণ্ডায় আর কঙ্গোতেও আমি মোষ শিকার করেছি। ওদের শক্তি সম্বন্ধে কোনরকম অহেতুক তাচ্ছিল্য না করেও আমি বলতে পারি যে মোষ শিকারের বিপদকে যেন একটু বাড়িয়ে বলা হয়েছে। মোষের দল যখন তেড়ে আসে তখন যে বিপদ ঘটে তার অনেক কাহিনীই আমি শুনেছি। এসব কাহিনীর বক্তব্য এই যে, তাদের পায়ের তলায় পড়লে মানুষ নির্ঘাত মারা পড়বে। আমি সাড়ে তিনশোরও বেশি মোষ মেরেছি, কিন্তু একবারও আমি মোষকে দলবদ্ধভাবে আক্রমণ করতে দেখি নি, কেবলমাত্র যখন পথ সঙ্কীর্ণ হওয়ায় ছড়িয়ে পড়তে না পেরে বাধ্য হয়ে একসঙ্গে তাড়া করেছে তখন ছাড়া। একে ঠিক আক্রমণ বলা চলে না, ভয়ে পালাতে গিয়েই বরং এই

অবস্থা। আমার অভিজ্ঞতায় বলে, মোষ কখনো দল বেঁধে আক্রমণ করে না, সে আক্রমণ করে একা, সাধারণত যখন দল থেকে আলাদা হয়ে পড়ে তখন।

এই শিকারের কয়েক বছর পরে আমায় দ্বিতীয়বার একবার মোষ শিকারে যেতে হয়,—এবার হল টমসন্‌স্‌ ফল্‌স্‌ অঞ্চলে,—একদল মোষ চাষের ক্ষতি করছিল, তাদের দমন করতে। মাত্র ক-দিন হল ওখানে গিয়েছি, এমন সময় আবেয়া নামে একজন স্থানীয় বাসিন্দা স্কাউটের পদপ্রার্থী হয়ে আমার তাঁবুতে এল। ও হল তুরকানা উপজাতীয়। তুরকানারা একজাতের আদিম বাসিন্দা, অত্যন্ত বন্য; তাদের সহজেই চেনা যায় তাদের খুব ধারালো কবচ দেখে। এই কবচ তৈরি হয় অত্যন্ত ধারালো ছুরি বেঁকিয়ে; খুরের মত ধার সে ছুরিতে। এই কবচের ব্যবহারে ওরা অত্যন্ত সিদ্ধহস্ত, এর এক আঘাতে ওরা মানুষের গলা কাটতে পারে। প্রথম যখন আমি আবেয়াকে দেখি, ও তখন উলঙ্গই ছিল বলতে গেলে। তার মাথার চুলে গোবরের পালেস্তরা। বিষাক্ত তীর দিয়ে শিকার চুরির অপরাধে জীবনের অনেকগুলো দিনই তার জেলখানায় কেটেছে। বর্বরের মত আকৃতি সত্ত্বেও আমার ওকে একরকম পছন্দই হল, শুধু এই কারণে যে, আর কিছু না হোক ও যে শিকারে সিদ্ধহস্ত তাতে সন্দেহ নেই। স্কাউটের দলে ওর ভর্তি হবার কারণ, ওর খুব ইচ্ছে ও একটা বন্দুক পায়। এ উচ্চাকাঙ্ক্ষার মধ্যেও যে দোষের কিছু আছে তা নয়, কিন্তু আমি জানতাম যে স্থানীয় বাসিন্দাদের ধারণা, বন্দুক হল একটা মন্ত্রঃপূত অব্যর্থ বস্তু, অস্ত্র হিসেবে তার কোন মূল্য থাক বা না-ই থাক। আবেয়াকে আমি দলে নিতে রাজি হলাম, কিন্তু এই শর্তে যে রাইফেলের সঙ্গে ভাল করে পরিচিত হবার আগে সে হিংস্র পশুর উপর তা ব্যবহার করতে পারবে না।

চুরিবিদ্যার অভিজ্ঞতার ফলে আবেয়া অত্যন্ত নিপুণ স্কাউট হয়ে উঠেছিল। রাইফেলের ব্যবহারেও সে অবিলম্বেই যেরকম রপ্ত হয়ে উঠল, কাজ চালিয়ে যাবার পক্ষে তা যথেষ্ট। কিন্তু শত চেষ্টা সত্ত্বেও তাকে বোঝাতে পারলাম না যে রাইফেলেরও ব্যর্থ হওয়া সম্ভব। যাই হোক, আমার সবচেয়ে নিপুণ শিকারী হিসেবে দু-জন স্কাউটের সঙ্গে একদিন আমি তাকে মোষ শিকারে পাঠালাম।

কয়েকদিন পরে ফিরে এল স্কাউট দু-জন। তারা বললে আবেয়া তাদের সঙ্গে শিকারে যেতে রাজি হচ্ছে না; গর্বভরে বলে সে, আমরা তুরকানারা সর্বদা একা-একাই শিকার করে থাকি। এ হল সরাসরি আমার হুকুম উপেক্ষা করা; কারণ আমার ধারণা, একা-একা শিকারে যাওয়া কোন মানুষের পক্ষেই

নিরাপদ নয়, দু-জন অন্তত সব সময়েই দরকার,—একজন চিহ্ন অনুসরণ করে চলবে আর অপরজন অতর্কিত আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত থাকবে। ঠিক করলাম, ফিরে এলে আরেযাকে খুব ধমকে দেব।

কিন্তু ফিরল না আরেয়া। পাঁচ দিনের জন্যে আমি অন্যত্র শিকারে গিয়েছিলাম, ফিরে এসে দেখি আরেয়ার স্ত্রী আমার প্রতীক্ষায় রয়েছে। আরেয়া নতুন কিনেছে তাকে, সেও প্রায় উলঙ্গ। তার কাছে শুনলাম আরেয়া আর ফেরেনি, এবং তার আশঙ্কা, হয়ত চরম দুর্ঘটনাই ঘটেছে। সঙ্গে সঙ্গে একটা দল তৈরি করে আমরা তার খোঁজে বেরিয়ে পড়লাম।

মার্গানেটের বনের এখানে ওখানে ফাঁক, মালভূমি ছড়ানো আছে, এইরকম একটা জায়গায় একটা খুব বড় গাছের কাছে আরেয়ার দেহাবশেষ পাওয়া গেল। হায়েনা আর শকুন তার সমস্ত শরীর খেয়ে ফেলেছে, সনাক্ত করলাম তার মাথার খুলি দেখে। প্রমাণ যা মিলল তাতে বোঝা গেল, আর-একজন স্থানীয় বাসিন্দা তাকে হত্যা করেছে। তার অনেকগুলো পাঁজর এমনভাবে ভেঙে রয়েছে যা সম্ভব কেবলমাত্র খুব ভারি মুগুর দিয়ে আঘাত করলে। দুটো হাড়ের মাঝে একটা লম্বা বাকানো কাটা দাগ, সেটাকে একটা বল্লমের আঘাত মনে হয়। তার রাইফেল বা গুলিবারুদের কোন চিহ্নই নেই,—নিশ্চয়ই কোন জন্তু এগুলো নিয়ে যায়নি। স্থানীয় থানার ইনস্পেক্টর মিঃ জে-কে আমি ঘটনাটা জানালাম।

ও অঞ্চলে সেই সময় কয়েকজন দুর্বৃত্ত লুকিয়ে ছিল যারা অনেক ডাকাতি রাহাজানি করেছে। এইসব বদ লোকের হাতে বন্দুক আর গুলি বারুদ পড়াটা অত্যন্ত ভাবনার ব্যাপার। ইনস্পেক্টর আরেয়ার দেহটা পরীক্ষা করলেন। গাছটার নিচে আরেয়া একটা গর্ত খুঁড়েছিল যাতে সে সেখানে লুকিয়ে থেকে মোষের প্রতীক্ষা করতে পারে। কিন্তু কোথাও কোন ধস্তাধস্তির বা মোষের পায়ের চিহ্ন দেখা গেল না। সুতরাং আরেয়াকে যে কোন মানুষ হত্যা করেছে তাতে আর সন্দেহের অবকাশ রইল না।

তবুও একেবারে নিশ্চয় হবার উদ্দেশ্যে ইনস্পেক্টর ঠিক করলেন, বেশ কয়েক মাইল অঞ্চল ঘিরে ভাল করে খুঁজে দেখবেন যদি তার মৃত্যুর সঠিক কোন কারণ আবিষ্কার করতে পারেন। স্থানীয় কনস্টেবল, যাদের ওখানে বলা হয় আসকারি, টমসন্‌স্ ফল্‌স্ থেকে তাদের আনানো হল। আমিও আমার স্কাউটদের নিয়ে ওদের দলে যোগ দিলাম। একদিন সকালে আসকারিদের একটা বড় দল,

স্কাউট আর স্থানীয় লোকজন নিয়ে আবেয়ার দেহাবশেষ যেখানে পাওয়া গিয়েছিল সেখানে জড়ো হয়ে আমরা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে সারা বন খুঁজে বেড়াবার জন্যে বেরিয়ে পড়লাম।

ঘণ্টা-দুই এভাবে ঘোরবার পর একজন স্থানীয় বাসিন্দা একটা প্রকাণ্ড মোষের মৃতদেহ দেখতে পেল। চললাম ওর সঙ্গে। মোষটা যেখানে পড়ে ছিল তার চতুর্দিকে অসংখ্য বিষাক্ত সাফারি পিঁপড়ে, খুব ব্যস্তভাবে মৃতদেহে ভাগ বসাচ্ছে। লোকজন গিয়ে পড়ায় ওদের আহারে ব্যাঘাত হল, তাই ওরা অত্যন্ত মারমুখো হয়ে উঠল, ঠিক করল ওদের খাদ্যের পাঁচ গজের মধ্যে কাউকে আসতে দেবে না।

লোকজনকে বললাম একটা বড় বাঁশ-টাশ দিয়ে মোষটাকে উল্টে ফেলতে। ওল্টানো হয়ে গেলে দেখলাম, তার একটা পাঁজরে একটা গোল গর্ত। পিঁপড়েদের আক্রমণ এড়িয়ে সবেগে গিয়ে সেই পাঁজরটা টেনে নিয়েই আবার তক্ষুনি ফিরে এলাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল দেখা, আট মিলিমিটার বন্দুকের গুলি এই গর্তের সঙ্গে মেলে কি না, কারণ ওর বন্দুকের গুলির মাপ ছিল তাই।

নিখুঁতভাবে মিলে গেল গুলিটা। আমি জানতাম আহত মোষ প্রথমে কোন ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থাকে, তারপর অতর্কিতে ফিরে শিকারীকে আক্রমণ করে বসে। স্কাউটদের বললাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে যেমুখো হয়ে মোষটা চলেছিল সেদিকে খুঁজে দেখতে। একশো গজ মত অগ্রসর হয়ে তারা এক জায়গায় রক্তের দাগ দেখতে পেল। চিহ্নগুলো ভাল করে পরীক্ষা করে নিঃসন্দেহে বুঝলাম যে এখানে এসেই মোষটা আবেয়াকে ধরে ফেলেছিল আর গুঁতিয়েছিল। আর কয়েক ফুট তফাতেই লম্বা লম্বা ঘাসের মধ্যে আবেয়ার রাইফেলটা মিলল। একটা গুলি তখনও তার খোপে রয়েছে; কিন্তু গুলিটা ঠিকভাবে লাগানো নেই। কাছেই একটা গুলির খালি খোল পড়ে রয়েছে দেখা গেল।

তখন যেখানে আবেয়াকে পাওয়া গিয়েছিল সেখান থেকে যেখানে রক্তের দাগ পাওয়া গিয়েছিল এই জায়গাটুকু একফুট একফুট করে পরীক্ষা করে দেখা হল। পাওয়া গেল আবেয়ার অন্য গুলিগুলো, ঘাসের মধ্যে ইতস্তত ছড়ানো অবস্থায়। শুকনো রক্তের দাগও মিলল, তার সঙ্গে জলের মত তরল পদার্থও দেখা গেল—কোন জন্তুর পেটে গুলি লাগলে যেমন দেখা যায় তেমনি।

বনের এইসব সাক্ষ্য থেকে এবার আমি সমস্ত ব্যাপারটা গেঁথে তুললাম।

গাছের নিচে যেখানে সে দাঁড়িয়ে ছিল সেখান থেকে আবেয়া একটা চলমান মোষের পেটে গুলি করে এবং আহত মোষটা রক্তের চিহ্ন রেখে রেখে ঝোপের মধ্যে দিয়ে ছুটে চলে। আবেয়াও চলে তার পিছু পিছু। ইতিমধ্যে আহত মোষটা লুকিয়ে পড়ে ওত পেতে থাকে, আর আবেয়া যখন রক্তের চিহ্ন ধরে অগ্রসর হচ্ছে, অতর্কিতে আক্রমণ করে তাকে। আবেয়াও গুলি করে বটে, কিন্তু তাকে থামাতে পারে না এবং বন্দুকে নতুন করে গুলি ভরবার আগেই মোষটা তার উপর এসে পড়ে। আবেয়াকে একটা কাঠের উপর চেপে ধরে সে, তাতে আবেযার পাঁজর ভেঙে যায় এবং তারপরেই মোষটাও মারা পড়ে। মারাত্মকভাবে আহত হয়ে আবেয়া কোন রকমে গুঁড়ি মেরে গাছের নিচের তার ছোট গর্তটার কাছে যায় এবং সেখানে মারা পড়ে সে। এটুকু যাবার সময়েই তার গুলিগুলো পড়ে যায় পকেট থেকে।

একটা মাত্র জিনিস যার কারণ এখনও ঠিক বোঝা যায় নি সেটা হল আবেয়ার পাঁজরের উপরের বল্লমের চিহ্নটা। ক্ষতটা দেখে আমি বুঝলাম যে মোষের শিঙের আঘাতে এ হয় নি। যে কাঠে মোষটা তাকে চেপে ধরেছিল, আবার পরীক্ষা করলাম সেটা। দেখলাম, একটা গাঁটে ভরা ডাল তা থেকে বেরিয়ে রয়েছে যার মুখটা ছুঁচলো। এই ডালটার উপর চাপ-চাপ রক্তের ছাপ। বুঝলাম, মোষটা যখন কাঠটার উপর আবেয়াকে চেপে ধরে, এই ডালটা তখন তার শরীরের ভিতরে ঢুকে তরোয়ালের আঘাতের মত চিহ্নের সৃষ্টি করে।

আবেয়ার দেহাবশেষ দেখে প্রথমে আমার স্থির ধারণা হয়েছিল যে স্থানীয় কোন লোকের হাতেই তার মৃত্যু হয়েছে। সৌভাগ্যবশত ইনস্পেক্টরের চেষ্টায় এ নিয়ে তদন্ত হয়ে আসল ব্যাপারটা জানা গেল। তবুও আমি বলব যে এতকাল বনে বনে ঘুরেও এমন আশ্চর্য সাদৃশ্য আর কখনো আমার অভিজ্ঞতায় হয় নি।

মোষকে শত্রু হিসেবে একটুও খাটো না করেও আমি বলব যে মোষের হাতে যে যে কারণে মৃত্যু হতে পারে তা মোটামুটি দু-ভাগে ফেলা যায়। এক হল, আহত মোষের চিহ্ন ধরে অগ্রসর হতে হতে সামনের দিকে দৃষ্টি রাখতে ভুলে যাওয়া, আর দুই, মোষের আক্রমণ প্রতিহত করবার উপযুক্ত ভারি বন্দুক ব্যবহার না করা।

আগেই বলেছি, বড়-বড় জন্তু শিকারের ব্যাপারে হালকা রাইফেল ব্যবহার

আমি পছন্দ করি না। পাঠক হয়ত বলবেন যে এ আমার গোঁড়ামি। এর উত্তরে আমি শুধু এই কথাই বলব যে আফ্রিকার জঙ্গলে আমার সবচেয়ে শোচনীয় বন্ধুবিয়োগের কারণই হল হালকা হাতিয়ার নিয়ে বড় জানোয়ার শিকারের দুঃসাহস। দু-জন মানুষের জীবন নষ্ট হল একমাত্র এই কারণে যে, এ লোকটি ভারি বন্দুকের ধাক্কা সহ্য করতে রাজি ছিল না।

লোকটি হল কোন ইউরোপীয় রাজবংশের সন্তান,—এর বেশি পরিচয় আর আমি দিতে চাই না। আমি তাকে শিকারে নিয়ে গিয়েছিলাম, আর আমার সঙ্গে ছিল আমার প্রিয় বন্ধু ও সঙ্গী কিরাকাঙ্গানো। মাসাই বিজার্ভে পরিচিত হবার পর থেকে অনেকবার আমি তাকে শিকারে সঙ্গী করেছি। আর একজন স্থানীয় বাসিন্দা এ যাত্রায় সেই রাজপুত্রের বন্দুকবাহকের কাজ নিয়েছিল। এই লোকটির শিকারের ব্যাপারে নিজের সম্বন্ধে অহেতুক উচ্চ ধারণা ছিল, যদিও আসলে সে সম্বন্ধে সে বিশেষ কিছুই জানত না।

বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে সবেমাত্র আমরা একটা সিংহ-শিকারের সাফারি সমাধা করেছি, সেদিন ফিরে যাব, এমন সময় যুবরাজ দেখলেন, একটা ঝোপের আড়ালে কয়েকটা পুরুষ-মোষ চরে বেড়াচ্ছে। যুবরাজ কোন কথাই শুনবেন না, স্মারক হিসেবে একটা তাঁকে নিয়ে যেতেই হবে। যুবরাজের বন্দুক ছিল '৪১৬,—সিংহ-শিকারের পক্ষে চমৎকার অস্ত্র সন্দেহ নেই, কিন্তু এতে মোষের আক্রমণ প্রতিহত করতে হলে একেবারে মোক্ষম আঘাত দরকার। কিরাকাঙ্গানো আর বন্দুকবাহককে পেছনে নিয়ে যুবরাজ আর আমি সন্তর্পণে মোষের পালের দিকে অগ্রসর হলাম। মোষদের আশি গজের মধ্যে আমরা গিয়ে পৌছলাম, মাঝখানে রইল শুধু একটা ছোটখাট ঝোপ। একটা চমৎকার মোষকে বেছে নিয়ে ভাল করে লক্ষ্য স্থির করে যুবরাজ গুলি ছুড়লেন। মোষটা পড়ে গেল, কিন্তু বন্দুকের আওয়াজ পেয়ে আর-একটা মোষ আমাদের পাশ দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল—আহত মোষটার চেয়ে আরও অপূর্ব এ মোষটা। আবার তিনি গুলি করলেন এবং গুলির আওয়াজে বুঝলাম যে গুলি মোষের পেটে লেগেছে। সঙ্গে সঙ্গে মোষটা তীরবেগে ঝোপের মধ্যে প্রবেশ করে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

কিরাকাঙ্গানোকে সঙ্গে করে আমি মোষটাকে শেষ করবার জন্যে বেরোতে যাচ্ছি, কিন্তু যুবরাজও সঙ্গী হতে চাইলেন। বললেন, নিজের হাতে তাকে না মারলে এ স্মারকের কোন মূল্যই তাঁর কাছে থাকবে না। দুঃখের বিষয় আমি

তার কথায় রাজি হয়ে তাঁকেও সঙ্গে নিয়ে একসঙ্গে জঙ্গলে প্রবেশ করলাম।

মাত্র পনেরো গজ মত অগ্রসর হয়েছি, এমন সময় কিরাকাঙ্গানো মোষটাকে দেখিয়ে দিল,—একটা ছোট ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে। যুবরাজকেও দেখাবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু তিনি দেখতে পেলেন না। আমরা যখন ফিস-ফিস করে কথা কইছি আর অঙ্গভঙ্গি করছি, মোষটা তখন বুঝতে পেরেছে যে আমরা দেখতে পেয়েছি তাকে। সঙ্গে সঙ্গে সে ফিরে ঝোপের আরও ভিতরে ঢুকে গেল।

মোষটা বুঝতে পেরেছিল যে আমরা তাকে দেখতে পেয়েছি, সুতরাং নিশ্চয় এবার সে খুব সাবধান হবে। আমরাও সেই ঘন ঝোপে প্রবেশ করলাম। কিরাকাঙ্গানো চিহ্ন ধরে ধরে চলল আর আমি বন্দুক বাগিয়ে চললাম তার পাশে পাশে। আমাদের পেছনে চললেন যুবরাজ আর তাঁর পেছনে একটা বাড়তি রাইফেল হাতে বন্দুকবাহক। আমার হাতে ছিল '৫০০ নম্বরের জেফ্রি, আর কিরাকাঙ্গানোর হাতে যথারীতি মোরানদের ব্যবহৃত বল্লম।

ঝোপ এতই নিবিড় যে উপরের ঘনসন্নিবদ্ধ পাতা ভেদ করে দৃষ্টি চলে না। তবে, অনেকবারই আমরা মোষটার গায়ের তীব্র গন্ধ পেয়েছিলাম, যখনই সে নেমে দাঁড়িয়ে আমাদের জন্যে ওত পেতে ছিল। অনেকবার আমি শুয়ে পড়ে নিচের দিকের অপেক্ষাকৃত পাতলা ঝোপের মধ্য দিয়ে চেষ্টা করলাম যদি কোন রকমে তার পা দেখতে পারি, কিন্তু প্রতিবারেই সেও আমায় দেখতে পেয়ে এভাবে ধরা পড়ে গিয়ে বিরক্তিসূচক ক্রুদ্ধ শব্দ করে আবার ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে শুরু করল।

এদিকে এ ধরনের শিকারে অনভ্যস্ত যুবরাজের স্নায়ু ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ছিল। মোষটাকে মারবার অত উৎসাহ কোথায় দূর হয়ে গেছে। হঠাৎ তিনি ঘোষণা করলেন, 'কেমন যেন মনে হচ্ছে কী একটা দুর্ঘটনা আমার দিকে এগিয়ে আসছে! এখান থেকে নিয়ে চলুন আমাকে!'

খুব খুশি হতাম যদি এই পূর্বাভাস তাঁর মনে আসত '৪১৬ নং বন্দুকে মোষটার পেটে গুলি করার আগে। যাই হোক, এখন আর কিছু করবার নেই তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া ছাড়া। কিরাকাঙ্গানো আর বন্দুকবাহককে পেছনে রেখে এগিয়ে গেলাম আমরা। বললাম সেখানে থেকে আমার জন্যে অপেক্ষা করতে। ডানদিকের ঝোপের ফাঁক দিয়ে আলো দেখা গেল, তার অর্থ এই বুঝতে হবে যে আমরা যেখানে আছি সেখান থেকে ফাঁকা জায়গাটা বেশি

দূরে নয়। ফাঁকায় বেরিয়ে আমি যুবরাজকে সেখানে রেখে আবার ফিরে মোষটার চিহ্ন অনুসরণে তৎপর হলাম।

লোকদুটিকে যেখানে রেখে এসেছিলাম, তার অর্ধেক পর্যন্ত গিয়েছি কি না সন্দেহ, এমন সময় আমি বন্দুকের আওয়াজ শুনলাম। মুহূর্তকাল আর কোন শব্দ শোনা গেল না। তারপর মোষটার অত্যন্ত ক্রুদ্ধ গর্জন আমার কানে এল। এই গর্জনের অর্থ আমি জানি। মোষ তখনই এমন শব্দ করে যখন সে কাউকে গুঁতোতে থাকে। বুঝলাম মোষটা আমার অনুচরদের হত্যা করছে। পাগলের মত আমি সেই ঘনসন্নিবদ্ধ ঝোপঝাড় ডিঙিয়ে অগ্রসর হলাম,—গাছের ডালপালাগুলো যেন চাবুকের মত আমার উপরে এসে পড়ছে। এবারং যে শব্দ আমার কানে এল তা হচ্ছে শিং দিয়ে কাউকে মাটিতে ফেলে দেওয়ার শব্দ। মরীয়া হয়ে আমি সেই দুর্ভেদ্য ঝোপ ভেদ করে চললাম।

শেষ ঝোপগুলো পার হয়ে যখন আমি গিয়ে পৌছলাম, এক ভীষণ দৃশ্য আমার চোখে পড়ল। মোষটা হাঁটু পেতে বসে কিরাকাঙ্গানোর নিশ্চল দেহে গুঁতোচ্ছে। অর্ধচেতন মানুষটিকে এতই মনোযোগ দিয়ে সে আঘাত করে চলেছে যে আমি যে তার মাত্র পাঁচ ফুটের মধ্যে এসে পড়েছি সেটুকুও সে লক্ষ্য করেনি। এমন সময় সে এক লাফে দাঁড়িয়ে উঠল আর সঙ্গে সঙ্গে আমি তার কাঁধ লক্ষ্য করে গুলি করলাম। ভারি গুলির আঘাতে সে পিছু হঠে কিরাকাঙ্গানোর উপরে গিয়ে পড়ল। হাঁটুতে ভর করে মরে গড়ল সে, তার পেছনের পা দুটো ফাঁক হয়ে গেল। মরা মোষটার সামনের দু-পায়ের নিচে কিরাকাঙ্গানো কোনাকুনিভাবে পড়ে রয়েছে, মোষটার শরীরের সমস্ত ওজন তার উপরে পড়ছে।

মুমূর্ষু বন্ধুর মোটাসোটা দেহটা আমি টেনে বার করবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু তাকে নাড়ানোই একটা দুঃসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো। চিত হয়ে শুয়ে দু-পা দিয়ে জন্তুটাকে ঠেলতে লাগলাম। এভাবে প্রাণপণে ঠেলতে ঠেলতে আমার পিঠের ছাল পর্যন্ত উঠে এল, কিন্তু তবুও কিছুই হল না। তখন আমি উঠে একটা গাছের শক্ত লতা দু-হাতে ধরে দু-পায়ে মোষটার গলা জড়িয়ে ধরলাম আর আপ্রাণ চেষ্টা করলাম যাতে নিজেকে আর মোষটাকে গাছটার দিকে নিয়ে যেতে পারি। এমনকি দাঁত দিয়ে পর্যন্ত লতাটা ধরে টান লাগালাম। কিন্তু তাতেও কিছুতেই মরা মোষটাকে কিরাকাঙ্গানোর

উপর থেকে সরাতে পারলাম না। তখনও সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেনি। বেশ বুঝলাম তার অত্যন্ত যন্ত্রণা হচ্ছে; কিন্তু তবুও সে কোনও নালিশ জানাচ্ছে না, এমনকি কাঁদছেও না পর্যন্ত।

চিৎকার করে যুবরাজকে ডাকলাম আমার সাহায্যে আসবার জন্যে। অনেকক্ষণ পরে, অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে তিনি এলেন। ল্যাজের দিকটা ধরে টানতে টানতে শেষ পর্যন্ত মোষটাকে কিরাকাঙ্গানোর উপর থেকে সরানো সম্ভব হল। মোষটার শিং আর খুরের ঘায়ে অত্যন্ত যখম হয়েছে সে। মোষটার মুখ চেপে ধরতে গিয়ে তার হাতের দুটো আঙুল ভেঙে গেছে।

যন্ত্রণা লাঘব করবার জন্যে তাড়াতাড়ি ওকে মর্ফিয়া ইঞ্জেকশন দিলাম। কয়েক মিনিটের মধ্যেই মনে হল ওর যন্ত্রণা একটু কমেছে। তার প্রথম প্রশ্ন হল, 'বন্দুকবাহকটা মরেছে কি? না যদি মরে তো ছেড়ে দিন, আমার গায়ে সেটুকু শক্তি থাকতে থাকতে ওকে শেষ করে আসি!'

বন্দুকবাহকই এ দুর্ঘটনার জন্যে সম্পূর্ণ দায়ী। কিরাকাঙ্গানো বললে, আমি চলে আসার পরে বন্দুকবাহক লুকিয়ে লুকিয়ে অগ্রসর হয়ে গিয়েছিল, আমার হুকুম আর কিরাকাঙ্গানোর নিষেধ সত্ত্বেও। মোষটা যেখানে শুয়ে ছিল সেখানে এসে সে গুলি করে, আর সঙ্গে সঙ্গে সগর্জনে লাফিয়ে উঠেই মোষটা তাড়া করে আসে। মহাভয়ে লোকটা কিরাকাঙ্গানোকে লক্ষ্য করে ছুটতে শুরু করে এই আশায় হয়ত যে, যদি মোষটা তাকে ছেড়ে কিরাকাঙ্গানোকে তাড়া করে। মোষটা পেছন থেকে এত জোরে তাকে গোঁত্তা মারে যে সে ছিটকে এসে কিরাকাঙ্গানোর উপর পড়ে তাকে ফেলে দেয়। যেটুকু সময়ের মধ্যে মোষটা এসে তার উপর পড়ে, ততক্ষণে সে তার বল্লম ব্যবহারের সামান্যতম সুযোগও পায়নি।

বন্দুকবাহকের খোঁজ করতে গিয়ে দেখি, কিরাকাঙ্গানোর ডান দিকে, ছ-গজ মাত্র তফাতে তার দেহটা পড়ে রয়েছে। চিৎ হয়ে সে পড়ে রয়েছে, তার জিভ বেরিয়ে এসেছে। তার অসাড় দেহটা মাটি থেকে তুলতে ঘাড়টা ঝুলে পড়ল,—মোষের গোঁত্তায় দু-জায়গায় ভেঙে গেছে। দুটো শিঙের আঘাত একসঙ্গে তার গায়ে লেগেছে। তখনও বেঁচে ছিল সে। অস্ফুট উচ্চারণে বললে, 'মাজি',—অর্থাৎ জল। বোতল থেকে খানিকটা জল তার মুখে ঢেলে দিতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু জলটা তার কষ বেয়ে পড়ে গেল।

তেমনি ধরে থাকা অবস্থাতেই আমি তার শ্বাস বন্ধ হওয়া টের পেলাম। তার শিকারী-জীবনের অবসান হল।

তার মারা যাবার খবরটা কিরাকাঙ্গানোকে জানাতে একটা ক্ষীণ হাসির আভা তার মুখে ফুটে উঠল। দেখলাম তার বল্লমটা মোষটার কাঁধে গেঁথে রয়েছে, তাই ভাবলাম হয়ত শেষ মুহূর্তে সে অন্তত একটা সুযোগ পেয়ে থাকবে। কিন্তু সে বললে যে মোষটা হাঁটু গেড়ে বসে তাকে গুঁতোবার সময়ে বল্লমটা আপনা থেকেই তার কাঁধে গেঁথে গিয়েছিল।

তাবুতে ফিরে গিয়ে পোর্টারদের দিয়ে একটা মোটরগাড়ি আনালাম। ঝোপটার কাছাকাছি এসে দাড়ালো গাড়িটা। কিরাকাঙ্গানো আর মৃত বন্দুকবাহককে গাড়িতে তোলা হল। সবচেয়ে কাছের যে ডাক্তার তিনি থাকেন একশো মাইল দূরে, পথ অত্যন্ত জঘন্য। তার উপর আবার বৃষ্টি শুরু হওয়ায় গাড়ি চালানো আরও কঠিন হয়ে উঠল। যুবরাজ গাড়ি চালালেন, আর আমি কিরাকাঙ্গানোর পাশে বসে রইলাম। অর্ধেক পথ মাত্র যেতেই গাড়ি একটা গভীর খাদে আটকে গেল। যুবরাজ অনেক চেষ্টা করলেন গাড়ি চালিয়ে যেতে, কিন্তু কেবলই গাড়িটা হড়কে হড়কে নেমে আসতে লাগল। বেশ মনে পড়ছে, পাছে ধাক্কা লাগে তাই কিরাকাঙ্গানোকে দু-হাতে তুলে নিয়েছিলাম আর সেই সময় মৃত বন্দুকবাহকের দেহ বার-বার আমার দেহে ধাক্কা লাগছিল। প্রতিটি ঝাঁকুনির সঙ্গে আমার শরীরের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে তার প্রতি সহানুভূতি ঝঙ্কৃত হতে লাগল।

শেষ পর্যন্ত কোনরকমে সেখান থেকে ওঠা গেল। মুমূর্ষু মাসাইটা একটা বন্য বরাহ দেখিয়ে দিল,—চমৎকার খড়্গটা তার, মৃত্যুর মুখোমুখি এসেও তখনও সে মনে-প্রাণে শিকারী। তার স্ত্রী তার ছেলেমেয়ে তার গরুবাছুরের কথা সে আমায় বললে। শান্তভাবে মন্তব্য করল যে আর তার তাদের সঙ্গে দেখা হবে না। আমি তাকে উৎসাহ দেবার চেষ্টা করলাম, বললাম শীঘ্রই আবার আমরা একসঙ্গে শিকারে বেরোবো। এই কথায় হাসল সে,—বুঝতে পেরেছিল সে যে সে মরতে চলেছে।

সেই রাত্রেই আমার বন্ধুর মৃত্যু হয়। সে ছিল যথার্থ বীর, ঝোপ-জঙ্গলের অন্ধি-সন্ধি ছিল তার নখদর্পণে,—খাঁটি আফ্রিকাবাসী ছিল সে। এই ভেবে কেবল সামান্য সান্ত্বনা পাই যে অনেক মাসাই যেভাবে মৃত্যু-বরণের স্বপ্ন দেখে সেভাবেই তার মৃত্যু হয়েছে—শিকারে গিয়ে এক বিরাট জন্তুর কবলে সে

প্রাণ হারিয়েছে। খুশি হলাম এই ভেবে যে শেষ-পর্যন্ত তার বল্লম রক্তাক্ত হয়েছিল,—যদিও তা হয়েছিল নিতান্ত আকস্মিকভাবেই। আমার মনে হয়, মৃত্যুর সময় যদি তার বল্লম রক্তমাখা না হত তাহলে হয়ত সে শান্তি পেত না।

॥ ১১ ॥ ইতুরি বন

আফ্রিকার বেশিরভাগ সময়ই আমার কেটেছে হালকা ঝোপ আর বিস্তীর্ণ মালভূমি অঞ্চলে—যে অঞ্চলকে বলা হয় 'শ্বেতাঙ্গদের দেশ'। তবে, নিবিড় জঙ্গলের অভিজ্ঞতাও আমার ছিল, এবং যদিও ঐসব অন্ধকার রহস্যময় অঞ্চলে বাস করা আমার অভিপ্রেত নয়, তবুও তারও যে একটা আকর্ষণ আছে তাতে সন্দেহ নেই। সত্যিকারের জঙ্গল বলতে যা বোঝায় তাকে একরকম ভুতুড়েই বলা চলে,—সেখানে সর্বদা গোধূলি—এমনকি মধ্যদিনে পর্যন্ত। এখানে একসঙ্গে বাস করে ক্ষুদ্রাকার পিগমি আর নরখাদক মানুষ, তাছাড়া এমন অনেক আশ্চর্য জন্তুও এখানে থাকে যাদের অন্যত্র দেখা মেলে না। ঐসব জঙ্গলে শিকারী নিয়ে যেতে আমার খুব ভাল লাগে, কারণ ওর আকর্ষণ হল অনেকটা হানাবাড়ির আকর্ষণের মত। তবে একথাও সত্য যে সাফারি শেষ করে ফিরে আসার পর আমি আবার আরও খুশি হয়েছি।

১৯৩০ সালে এক সময় আমি একটা দল নিয়ে বিশাল ইতুরি বনে প্রবেশ করেছিলাম। এ হল এক অত্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল,—বেলজিয়াম কঙ্গোর উত্তর-পূর্বে প্রসারিত। লণ্ডনের কেনসিংটন মিউজিয়াম থেকে ডাঃ আর. অ্যাক্রয়েডের অধিনায়কত্বে লণ্ডন থেকে এই অভিযানের আরম্ভ। তখন পর্যন্ত অতি অল্প অভিযাত্রীই ইতুরির জঙ্গলে প্রবেশ করেছে। ডাঃ অ্যাক্রয়েডের ইচ্ছে এ অঞ্চল থেকে কিছু জীবজন্তু আর গাছপালার নমুনা লণ্ডনে নিয়ে যান।

কঙ্গো সীমান্ত থেকে ১৮০ মাইল দূরে উগাণ্ডা, সেখানকার কাম্পালায় আমার ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হয়। ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করে আমার খুব ভাল লাগল। ভদ্রলোক মধ্যবয়সী, সুন্দর তাঁর ব্যবহার, আর দেখলেই মনে হয় যেন সর্বদাই যেকোন কাজের জন্যে তিনি প্রস্তুত। পরে পরিচয় পেয়েছিলাম, প্রকৃতিবিদ হিসেবে অত্যন্ত গভীর জ্ঞান তার ছিল। তাঁকে বললাম

কঙ্গোর কিছু অভিজ্ঞতা আমার আছে, কারণ কিছু শিকারীকে নিয়ে সেখানকার খর্বাকৃতি ভয়ঙ্কর লাল মোষ শিকারে গিয়েছিলাম; কিন্তু ইতুরি সম্বন্ধে আমার কোন অভিজ্ঞতাই নেই। শুনে ডাঃ অ্যাক্রয়েড ঘাড় নাড়লেন। বললেন, 'এ সম্ভাবনা আমার মাথায় এসেছিল, তাই একজন অত্যন্ত অভিজ্ঞ পথ-প্রদর্শককে দলে নিয়েছি। বেজেদেনহাটের কথা আপনি শুনে' থাকবেন,—বন্য ওকাপির প্রথম ছবি তারই হাতে তোলা। তার সঙ্গে কথা বলেছি, সে আমাদের বনের মধ্যে নিয়ে যেতে রাজি হয়েছে।

সেদিনই পরে আমার বেজেদেনহাটের সঙ্গে দেখা হয়। রোগা, পাকানো শরীর, চমৎকার মাথার চুল আর অত্যন্ত উৎসুক নীল দুই চোখ। আমার সেরেঙ্গেতি শিকারের বন্ধু ফুরির মত এও হল হল্যাণ্ডের লোক। খবর পেয়েছিলাম লোকটার জীবনে অনেক ঝড় বয়ে গেছে, আর খুব যে ভদ্রভাবে সে জীবন কাটিয়েছে তাও নয়, কিন্তু কিছুক্ষণ তার সঙ্গে কথা কয়ে বুঝলাম যে ইতুরি বন সম্বন্ধে তার জ্ঞান যথেষ্ট এবং মনে হল যে ঠিক সে আমাদের নিয়ে যেতে পারবে। ওর বিখ্যাত ওকাপি ছবিগুলোর কথা জিজ্ঞাসা করলাম। ওকাপি হল এক অদ্ভুত জন্তু, জিরাফ-জাতীয়, কিন্তু তার চেয়ে একটু ছোট, আর ঘাডটাও একটু খাটো। শুনলাম সে নাকি হামাগুড়ি দিয়ে বুনো শুয়োরের চামড়া গায়ে দিয়ে গিয়ে তবে ছবি তুলেছে। বলতে বলতে একটু হেসে উঠল সে, তাতে বুঝলাম কাহিনীটার এখানেই শেষ নয়; তবে, এ নিয়ে আর তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করলাম না।

উগাণ্ডার ভিতর দিয়ে পুবমুখো হয়ে আমরা সেমিলিকি নদীর তীরে ম্বেরেম্বিউল গ্রাম পর্যন্ত গিয়ে পৌছলাম। এখান থেকেই কঙ্গোর শুরু। সশস্ত্র স্থানীয় সৈন্যদল নদীর দুই তীরে পাহারায় রত, আর একজন বেলজিয়ান পুলিশ কর্মচারী আমাদের পাসপোর্ট পরীক্ষা করতে শুরু করল। বেজেদেনহাটের পাসপোর্টটা হাতে নিয়ে থেমে দাঁড়ালেন ভদ্রলোক, খুব মন দিয়ে সেটা দেখতে লাগলেন। আমি পথপ্রদর্শকের দিকে তাকিয়ে দেখব তার কী বক্তব্য আছে, কিন্তু ততক্ষণে সে ধোঁয়ার মত মিলিয়ে গেছে। পুলিশ কর্মচারী মুখ তুলে তাকালেন। বললেন, 'এ জাল পাসপোর্ট, এ আমি মানতে পারি না। কে এ লোকটা?'

ডাঃ অ্যাক্রয়েডের কাছে তার বর্ণনা শুনে তো পুলিশ কর্মচারী প্রায় লাফিয়ে উঠলেন। বললেন, 'এ লোকটা হল আফ্রিকার চোরাই গজদন্তশিকারিদের

একজন। গতবার যখন ও এখানে আসে ও, চেষ্টা করেছিল আমার লোকজনকে দল ছেড়ে বন্দুক আর গুলিবারুদ দিয়ে ওর সঙ্গে গজদন্ত চুরির কাজে যোগ দিতে। গজদন্তের কারবারে ও প্রচুর টাকা করেছিল,—লোকজনদের দিয়ে ও সেই সমস্ত গজদন্ত নিয়ে সাঁতরে নদী পার হয়ে উগাণ্ডায় চলে গিয়েছিল। আর আমরা কোনমতেই তাকে কঙ্গোয় প্রবেশ করতে দেব না।'

সেমিলিকি নদী হল চল্লিশ ফুট চওড়া আর আট ফুট গভীর, আর অসংখ্য কুমির তাতে; এ কাহিনী বিশ্বাস করা আমার পক্ষে কঠিন হয়ে উঠল। ডাঃ অ্যাক্রয়েড আর আমি দু-জনেই ভদ্রলোককে অনেক অনুরোধ করলাম, কথা দিলাম যে কঙ্গো সফরের ক টা দিন আমরা ওর সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করছি। ডাঃ অ্যাক্রয়েড বুঝিয়ে দিলেন যে ওকে না পেলে তার পক্ষে কোন কিছু সংগ্রহ করা সম্ভব হবে না। ভাগ্যক্রমে কর্মচারীটির বিচারবুদ্ধির অভাব ছিল না, বৈজ্ঞানিক অভিযানের গুরুত্ব সম্বন্ধে তিনি সজাগ ছিলেন; শেষ পর্যন্ত রাজি হলেন তিনি। কিন্তু এই শর্তে যে, এই সফরে সর্বক্ষণ সে ডাঃ অ্যাক্রয়েডের তত্ত্বাবধানে থাকবে এবং তাঁর সঙ্গেই বেলজিয়াম রাজ্য ত্যাগ করবে।

আমরা নদী পার হলাম, যাবার সময় বেজেদেনহাট পুলিশ কর্মচারীকে সবিনয় অভিবাদন জানালো। সেখান থেকে আমরা গেলাম ম্বোগা—ওখান থেকে আরও পনেরো মাইল এগিয়ে। গজদন্ত চুরির কাহিনী সত্য কি না জিজ্ঞাসা করতে ও বললে, 'হ্যাঁ; সেমিলিকি পর্যন্ত পুলিশ একেবারে আমার পায়ে পায়ে আসছিল।' বললে সে, 'কুমিরগুলো ছিল অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, তবে বন্দুকের গুলি করে করে কিছুক্ষণের জন্যে নদীর একটা অঞ্চল কুলিদের জন্যে নিরাপদ করে রাখা হয়েছিল; সে সময়ের মধ্যেই ওরা সাঁতরে পার হয়।'

ক্রমেই দেখছিলাম, লোক হিসেবে সে যেমন করিৎকর্মা তেমনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ম্বোগায় এসে আমরা আশিজন কুলি নিযুক্ত করলাম। খুব কাজের লোক ছিল ওরা। ওদের দিনে এক ফ্র্যাঙ্ক করে দিতাম (তখনকার দিনে এর মূল্য ছিল প্রায় এক পেনির মত), আর তার বিনিময়ে তারা সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত প্রায় আধমণ মাল মাথায় করে বইত। তাঁবু খাটানো হলে শিকারিদের মধ্যে যারা বেশি ওস্তাদ তারা শিকারের খবর আনতে বেরিয়ে যেত। কিভাবে কুলিরা খবর পেয়ে গিয়েছিল যে ডাঃ অ্যাক্রয়েড মরা জন্তুর নমুনা জীইয়ে রাখার জন্যে বেশ কয়েক টিন মেথিলেটেড স্পিরিট সঙ্গে নিয়েছেন, তারা কয়েকটা টিন খুলে খুব আশ মিটিয়ে সেই স্পিরিট পান করল। এর

ফলে দু-জন তো মারাই পড়ল; তার পর থেকে আর কেউ সে স্পিরিট স্পর্শ করে নি।

একজন ভাল রাঁধুনি জোগাড় করা এক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল,—এমন একজন রাঁধুনি, যার উপর নির্ভর করা যেতে পারে। যাকে পেয়েছিলাম, রান্নায় সে ছিল সিদ্ধহস্ত, কিন্তু তার লোভ ছিল নরমাংসের উপর। এর ফলে অনেক গোলমালের সৃষ্টি হয়, সে কথা পরে বলব।

অভিযানের সব ব্যবস্থা ঠিক হয়ে গেলে আমরা ম্বোগা ছেড়ে পশ্চিমমুখো হয়ে ইতুরির অভিমুখে রওনা হলাম,—দূরত্ব প্রায় দশ মাইল। নদীর কাছাকাছি অঞ্চলটা অধিকাংশই ঘাসে ছাওয়া ফাঁকা জায়গা, কোথাও কোথাও অনেকখানি জায়গা জুড়ে আগাছা। এই প্রান্তরের উপর দিয়ে একটা স্বচ্ছ ছোট নদী আঁকা-বাঁকা পথে চলে গেছে,—ইংল্যাণ্ডের কোন ছোট নদীর মত। অসংখ্য হাতির পাল আমার চোখে পড়ল, এক-একটা দাঁত তাদের পঁয়ত্রিশ সের থেকে এক মণের মত ওজনের। কয়েক বছর আগে যখন শিকারে কোন বাধা ছিল না, দাঁতের লোভে তখন এখানে অসংখ্য হাতি মারা হত। এখন লাইসেন্স ছাড়া হাতি মারা নিষিদ্ধ হওয়ায় আশ্চর্য হয়ে দেখলাম, একটুকু সময়ের মধ্যেই হাতিদের মানুষের ভয় একেবারে চলে গেছে; আমাদের উপস্থিতিতে তারা একটুও অস্বস্তি বোধ করল না।

বিকেলের দিকে আমাদের দল গিয়ে বনের কিনারায় উপস্থিত হল। অবাক হয়ে গেলাম প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছ দেখে। যেসব জায়গায় ছায়া ছায়া, বিরাটাকার ফার্ন গাছ সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে, আর যে সব জায়গা পাথরে ছাওয়া, সেখানেও রয়েছে একরকম বামন ফার্ন গাছ। লতায় ছাওয়া গাছের গুঁড়ির আনাচে কানাচে সুন্দর সুন্দর অর্কিড দেখা যাচ্ছে। কত রঙের সে ফুল! কোনটা বা গোলাপি, কোনটা আবার চমৎকার সাদা। কালোয় সাদায় মেশানো কত কলিবি বানর গাছে দোল খাচ্ছে, তাদের গায়ে লম্বা লম্বা লোম। যেভাবে আমরা আফ্রিকার মানুষদের দেখি সেভাবে তারা আমাদের দিকে তাকাচ্ছিল।

একটা ঝিরঝিরে নদীর তীরে আমাদের তাঁবু ফেলা হল। পরদিন সকালে আমরা বেজেদেনহাটের নেতৃত্বে বনের মধ্যে প্রবেশ করলাম।

ইতুরি বনের মাঝামাঝি অঞ্চলে আগাছার অস্তিত্ব নেই বললেই হয়। কাঁটাগাছও বেশি নেই, ফলে বড় বড় গাছগুলোর মধ্য দিয়ে বেশ স্বচ্ছন্দেই

চলাফেরা চলে। কিন্তু উপরের ডালগুলো এত ঘনসন্নিবদ্ধ যে প্রায় কোন আলোই তার ভিতর দিয়ে প্রবেশ করতে পারে না, এবং এই কারণেই সেখানে ছোট ছোট গাছ বিশেষ জন্মাতে পারে না। একঝাঁক গিনি ফাউল ভয় পেয়ে একটা বড় গাছের নিচের ডালে এসে বসল, কিন্তু যেখানে তারা বসল সে জায়গাও এত উঁচুতে যে শট গানের নাগাল ততদূর পর্যন্ত যায় না। একটা হালকা রাইফেল দিয়ে গোটা দুই পাখি মারলাম। মেরে আশ্চর্য হয়ে দেখি, এ প্রায় এক নতুন জাতের পাখি,—আগে দেখিনি কখনো, যদিও আকারে আর ওজনে এরা তাদের কেনিয়ার জাতভাইদের থেকে আলাদা নয়।

ইতুরিতে বেশ কয়েক সপ্তাহ কাটাবার পর আমরা প্রথম পিগ্‌মিদের দেখা পাই, যদিও আমরা জানতাম তারা সর্বদাই আমাদের উপর লক্ষ্য রাখছে। যখনই কোন কারণে আমাদের পিছু হঠতে হয়েছে, আমাদের চলে-আসা পথের উপর ওদের ছোট ছোট পায়ের চিহ্ন লক্ষ্য করেছি। কখনো বা চোখে পড়ল, ছায়ার মত একটা কী যেন বোঁ করে চলে গেল যা কোন পশু বা কোন পাখি নয়। আমি ভেবেছিলাম পিগ্‌মিরা বুঝি স্বভাবতই অমন লাজুক, কিন্তু আসলে তা নয়, বেজেদেনহাট বললে, ওরা মনে করেছে আমরা ওদের কাছে ট্যাক্স আদায় করতে এসেছি। কলোনির সকলেরই উপজাতি নির্বিশেষে ট্যাক্স দেবার কথা, কিন্তু এই ছায়ার মত প্রাণীদের কাছ থেকে ট্যাক্স আদায় করা এক সমস্যা। ওরা পয়সার ব্যবহার জানে না, ট্যাক্স দেবার কাজ সারে ছাগল দিয়ে।

পরম গর্বভরে বললে বেজেদেনহাট, 'আমি কিন্তু যখন খুশি ওদের এখানে আনতে পারি। পৃথিবীতে একমাত্র আমার পক্ষেই তা সম্ভব, কারণ আমি হলাম পিগ্‌মিদের রাজা।' বড়াইয়ের বহরটা কম নয়, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই আমি জানতে পেরেছিলাম যে এ বড়াই ওর সাজে।

একদিন সন্ধ্যায় সে দু-জন পিগ্‌মিকে নিয়ে তাঁবুতে ফিরল। হাতে তাদের শরীরের সঙ্গে খাপ খায় এমন ছোট-ছোট তীর ধনুক। পিগ্‌মি ভাষায় তাদের সঙ্গে তার কথাবার্তাও লক্ষ্য করলাম। সে পুরোনো দিনের কথা তুলতে তাদের লোমশ মুখ অত্যন্ত উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আরও অসংখ্য পিগ্‌মি বনের মধ্যে থেকে গড়াতে গড়াতে এসে হাজির হল। তারা আমাদের সঙ্গে হাত মেলালো, ঘুরে ঘুরে কত নাচল কুঁদল, ওদের দেবতা বেজেদেনহাট এসেছে—ওদের আর খুশির শেষ নেই।

বেজেদেনহাটকে বাদ দিলে, পিগ্‌মিদের অনেকেই আমাদের ছাড়া আর কোন শ্বেতাঙ্গকে ইতিপূর্বে দেখেনি। আমাদের ঘিরে দাঁড়ালো ওরা, আমাদের হাতে হাত দিয়ে দেখল, আমাদের পোশাক পরীক্ষা করে দেখল। অসংখ্য প্রশ্ন করে চলল তারা,—কয়েকটা প্রশ্ন আবার ভারি মজার। একজন বুড়ো আমায় জিজ্ঞাসা করল শ্বেতাঙ্গরা স্বপ্ন দেখতে পারে কি না। যখন শুনল পারে, খুব অবাক হল সে। বললে, 'আমি তো জানতাম স্বপ্ন দেখা কেবলমাত্র আমাদের পক্ষেই সম্ভব!'

অন্যান্য আদিবাসিদের মত পিগ্‌মিরাও শিকারিদের দেখা পেয়ে খুব খুশি, কারণ তারা জানে এবার তাদের মাংসের সংস্থান হবে। অনেক বুড়ো পিগ্‌মি যাদের শিকারের বয়স চলে গেছে, আমাকে বানর মেরে দিতে অনুরোধ করল,—বানরের মাংস ওদের অত্যন্ত প্রিয়। ওখানকার গাছের ডালগুলো এতই ঘনসন্নিবদ্ধ যে প্রায়ই দেখা গেছে যে কোন বানর গুলি খেয়েও পড়ে যায়নি, গাছের ডালে আটকে রয়ে গেছে। তখন তারা অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে প্রথমে ভাল করে উঁকিঝুঁকি মেরে দেখে নেয় ঠিক কোন্ জায়গায় বানরটা আটকে আছে, তারপর বড় বড় লতা বেয়ে ঠিক গিয়ে পৌছয় সেখানে। ওদের ছোট ছোট তীর গাছের উপরের বানরের নাগাল পায় না, তবে, কখনো কখনো যখন বানররা দল বেঁধে নিচে এসে কিছু খেতে থাকে, সেই সুযোগে ওরা দু-চারটেকে শিকার করে।

পিগ্‌মিরা চাষবাস করে না, শিকার করে আর ফাঁদ পেতে জীবন ধারণ করে। পোকামাকড়ের পচা শরীর থেকে একরকম বিষ তৈরি করে ওরা ওদের তীরে মাখিয়ে নেয়। সে বিষের সরষের মত রঙ, মারাত্মক হলেও অন্যান্য আদিবাসিদের বিষের মত তেমন কার্যকরী নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ওরা ফাঁদ পেতে শিকার ধরে, ফলে এ বনের কয়েকটা অঞ্চল কেবল মাটি আর গাছের ফাঁদে ভর্তি। গাছের ফাঁদ হল এই রকম। বল্লমের সঙ্গে ভারি কাঠ বেঁধে নিচের দিকে মুখ করে গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখা হয়,—এমন জায়গায়, যেখানে পশুর চলাফেরা আছে। এমন কায়দায় সেই বল্লমের সঙ্গে একটা লতা ঝোলানো থাকে যে কোন জন্তু সেখ'ন দিয়ে যেতে গেলেই সেই লতায় টান পড়ে আর সঙ্গে সঙ্গে বল্লমটা উপর থেকে সবেগে তার উপর এসে পড়ে। আর মাটির ফাঁদ হল গর্ত খুঁড়ে রেখে গাছের ডালপালা আর পাতা দিয়ে এমন হালকাভাবে ঢাকা দিয়ে রাখা যে কোন জন্তু যেখানে পা দিলেই সঙ্গে সঙ্গে

ভিতরে পড়ে যাবে। গর্তের ভিতরে আবার অনেক সময় বিষমাখানো খুঁটিও পোতা থাকে। কেবলমাত্র হাতি আর মোষই নয়, ওকাপিরা পর্যন্ত এই ফাঁদে পড়ে মারা পড়ে। শিকারের পিছু-নেওয়া শিকারীর পক্ষে অত্যন্ত মারাত্মক এই ফাঁদ; তাই যতদিন ওখানে ছিলাম বেজেদেনহাট ক-জন পিগ্‌মিকে আমাদের পথপ্রদর্শকের কাজে নিযুক্ত করেছিল।

বিনা কারণে বা নিছক খেলাচ্ছলে কিন্তু তারা প্রাণীহত্যা করত না, কেবল খাদ্য হিসেবে বা বিনিময়ের জন্যে যেটুকু দরকার সেটুকু করত অর্থাৎ অন্যান্য আদিবাসিরা চাষের খেতকে যেভাবে দেখে, বনকে ওরা সেভাবেই দেখত। আমার মনে হয় ওকাপিই হল আফ্রিকার সবচেয়ে দুর্লভ আর সবচেয়ে ভীরু জন্তু; তাই খুব আশ্চর্য হতাম যখন দেখতাম যে পরম নির্বিকারে তারা এই দুর্লভ জন্তুর মাংস খেয়ে চলেছে। আমি একটু ঐ মাংস মুখে দিয়ে দেখলাম, কেমন গন্ধ-গন্ধ লাগল। কিন্তু আমাদের কুলিরা দিব্যি সে মাংস খেয়ে চলল, সাধারণ শিকারের মাংসের থেকে এই দুর্লভ মাংসের কোন পার্থক্যই বুঝতে পারল না।

ওদের বল্লম আর তীর পিগ্‌মিরা নিজেরাই তৈরি করে থাকে। প্রতিটি পিগ্‌মি সমাজে কামার থাকে, কোন্ পুরাকাল থেকে তারা বংশপরম্পরায় এই জীবিকা নির্বাহ করে আসছে। তার আগুনের বেলো অ্যাণ্টেলোপের চামড়ায় তৈরি, হাতুড়ি লোহার। এই সামান্য যন্ত্রের সাহায্যেই তারা আশ্চয নিপুণতার সঙ্গে অস্ত্র তৈরি করে।

বনের সর্বত্রই ছোট ছোট গ্রামে ওদের বাস। ওদের কুটিরগুলোর মৌচাকের মত আকৃতি, ডাল আর পাতা দিয়ে তৈরি। ওরা সাধারণত চার ফুটের মত লম্বা, ওদের কুটিরও সেই অনুপাতে ছোট। সাধারণত ওরা গভীর বনের বাইরে আসে না, আসে কেবল অন্য এক জাতের পিগ্‌মির সঙ্গে কিছু বিনিময় করতে। এই পিগ্‌মিদের বাস ইতুরির ঝোপঝাড় অঞ্চলে, আসল পিগ্‌মিদের থেকে এরা একটু লম্বা। ওদের নুন আর কলা ওরা পিগ্‌মিদের মাংস আর চামড়ার সঙ্গে বিনিময় করে।

বেজেদেনহাট বলে, পিগ্‌মিদের মধ্যে নৈতিক বোধ অত্যন্ত তীব্র,—এমনটি সে আর কোথাও দেখেনি। ওদের মেয়েদেরও নৈতিক চেতনা অত্যন্ত বেশি। কোনমতেই তারা তাদের স্ত্রীলোকদের বিক্রয় করে না, এবং পিগ্‌মি রমণী কোনরকম অসম্মান সহ্য করার চেয়ে মৃত্যুকেও শ্রেয় মনে করে। এই

বক্তব্যের উদাহরণ হিসেবে আমি এখানে একটি কাহিনীর উল্লেখ করছি।

ইতুরিতে অসংখ্য হাতি মেলে যাদের দাঁত যেমন চমৎকার তেমনি নরম, আর সেজন্যে তার দামও অনেক; আগেকার দিনে চারিদিক থেকে অনেক শিকারী গজদন্তের লোভে এখানে আসত। তাদের মধ্যে সব রকমের মানুষই ছিল, খুব ভাল থেকে খুব খাবাপ। এই শেষোক্ত শ্রেণীর এক ইংরেজ, লম্বায় সে ছ-ফুট চার ইঞ্চি, একটি পিগ্‌মি মেয়েকে দেখে তাকে ধরবে বলে তাড়া করে। মেয়েটি ছুটতে থাকে আর লোকটি তার পিছু-পিছু ছোটে। ভয়-পাওয়া ছোট্ট মেয়েটির অতিকায় পুরুষটির ভয়ে এই পলায়ন—এ নিশ্চয় এক অদ্ভুত দৃশ্যই হয়েছিল। মেয়েটি মাথা ঠিক রেখে চলেছিল, লোকটিকে সে একটা মাটির ফাঁদের কাছে নিয়ে গিয়েছিল। ছোট্ট মেয়েটির ওজন পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ সেরের বেশি নয়, অনায়াসেই সে ফাঁদের হালকা আস্তরণ পার হয়ে গেল; কিন্তু ভারি ইংরেজটার ভর ফাঁদ সইল না, গর্তের নিচের বিষাক্ত খুঁটিগুলোর উপর পড়ে লোকটির মৃত্যু হল।

পিগ্‌মিদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হতে তাদের কয়েকজনকে পথপ্রদর্শক হিসেবে নেওয়া হল, যাতে ডাঃ অ্যাক্রয়েডের নমুনা সংগ্রহের সুবিধে হয়। আদিবাসিরা কিছুতেই বুঝতে পারে না কেন শ্বেতাঙ্গরা কেবলমাত্র সাপ আর জন্তু আর পাখি আর পোকামাকড় সংগ্রহ করবার জন্যে এত কষ্ট স্বীকার করে। এবং আদিবাসিদের খাওয়ার ব্যাপারে কোন বাছ-বিচার না থাকায় তারা ভাল করেই জানে বনের কোন্ অঞ্চলে কোন্ প্রাণী মিলতে পারে। পিগ্‌মিদের নুনের উপর টান খুব বেশি, কারণ জঙ্গলে ওদের যা খাদ্য তাতে নুন অত্যন্ত কম। তাই সামান্য নুনের বিনিময়ে ওদের কাছ থেকে যথেষ্ট সহযোগিতা পাওয়া যায়। সন্ধ্যায় তাঁবুর আগুনের পাশে বসে আমরা ওদের জানিয়ে দিই কী কী আমাদের দরকার, এবং এতে ওদের উৎসাহের প্রাচুর্য দেখে মনে হয় যেন ইতিমধ্যেই আমাদের সমস্ত কিছু সংগ্রহ করা হয়ে গেছে, এখন কেবল মার্কা মেরে রাখা বাকি।

কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেল যে পিগ্‌মিরা আমাদের খুশি করতে এতই উৎসুক যে যেকোন জন্তুর নাম করলেই ওরা তক্ষুনি তা এনে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বসে, এমনকি এমন কোন জন্তুও ওরা এনে দেবার প্রতিশ্রুতি দেয় যা ওরা কখনো চোখেও দেখেনি বা যার কথা কখনো শোনেওনি পর্যন্ত। আমার কাছে এক কপি রোল্যাণ্ড ওয়ার্ডের 'রেকর্ডস্ অব্ বিগ্ গেম' বই ছিল, পৃথিবীর সমস্ত

শিকারের প্রাণীর ছবি ছিল তাতে। সেই বইয়ের পাতা উল্টে উল্টে আমি ওদেব দেখাতাম কোন্ কোন্ প্রাণী আমাদের দবকাব, এবং তাতে তাদের প্রচুর উৎসাহ দেখা যেত। এমনকি আমেবিকার মুজ বা স্কটল্যাণ্ডের অ্যান্টিলার হরিণ পর্যন্ত ওরা এনে দিতে প্রস্তুত। চবম ব্যাপার হল যখন পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে মেরুবাজ্যেব সিন্ধুঘোটকেব ছবি দেখা গেল। একজন খুব খুদে শিকাবী ছবিটার দিকে আঙুল বাড়িযে বললে, 'ওঃ একে আমি ভাল কবেই জানি। বনেব খুব গভীবে এ থাকে আব কেবলমাত্র রাত্রেই সেখান থেকে বেবিযে আসে। অত্যন্ত ভয়ঙ্কর এব স্বভাব, ঐ বড বড দাঁত দিয়ে সে মানুষ মেবে খায, তবে, আপনারা বললে আমি একটাকে ফাঁদ পেতে ধবতে পাবি।'

ইতুবি বনের অভিযাত্রিদেব কাছে অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প শোনা যায। এসব গল্প তাদেব পিগ মিদেব কাছে শোনা। কত জন্তুব গল্পই তাবা করে,—ডাইনোসর থেকে মানুষখেকো ভালুক—কারুব কথাই বাদ পড়ে না। আমার মনে হয এদের অস্তিত্বও সিন্ধুঘোটকের অস্তিত্বেবই মত। তবে, আধুনিক কালের পূর্বে তো পিগ্মিদেব ওকাপিব কাহিনীও কেউ বিশ্বাস করত না, যদিও এই অদ্ভুত জন্তুব অস্তিত্ব কোন-কোন অঞ্চলে ছিল বৈকি। তাই ওদের কোন্ কথায কতটা সত্য আছে তা আবিষ্কার কবা অত্যন্ত কঠিন।

যাই হোক, সিন্ধুঘোটক আমবা পাই আর না ই পাই, পিগ্মি শিকারীরা আমাদেব অশেষ কাজে এসেছিল। একটা ঘাসেব ছাদওয়ালা কুটির তৈরি করা হল, ডাঃ অ্যাক্রয়েড সব সময় সেখানে কাজে ব্যস্ত রইলেন। ওকাপিব চামড়া থেকে উড়ুক্কু কাঠবেড়ালি, অনেক কিছুই সেই সংগ্রহে স্থান পেল। আমাব কৌতূহল জাগল বিশেষ কবে ভোঁদড়েব চামড়াব উপব,—চমৎকার তার লোম, পেটের কাছে অদ্ভুত ধরনের বুটি কাটা। বেশিবভাগ জন্তুরই ছাল ছাড়াবার সময় পেটের দিকটা কাটা হয়, কিন্তু ভোঁদড়ের ছাল ছাড়াবার সময় পিগ্মিরা কাটে তাদেব পিঠের দিকটা, যাতে পেটেব সুন্দব চামড়াটা নষ্ট না হয়। সন্ধের দিকে ঝরনাব জলে মাছ খেতে এসে অনেকগুলো ভোঁদড়ই আমাদেব জালে ধরা পড়ল।

উবগ যত সংগ্রহ করা হল তার মধ্যে সাপেব সংখ্যা হল অনেক। ঘাসে তৈরি ঝুড়ি করে পিগ্মিরা এইসব উরগদেব এনে সারি সারি সাজিয়ে রাখত। যেসব সাপ এল তাদের মধ্যে এক ধরনের সাপই ছিল বেশি· লম্বায় আর পরিধিতে তা পাফ অ্যাডার-এর মত, কিন্তু সুন্দর লালচে গায়ের রঙের

জন্যে তাকে তত খারাপ দেখাতো না। এইরকম দুটো শিং-ওলা সাপকে বার করে আমি একটা লাঠি দিয়ে তাদের খ্যাপাতে লাগলাম,—যাতে লক্ষ্য করতে পারি কত তাড়াতাড়ি তারা ছোবল মারতে পারে। একটা সাপ তো লাঠিটার ব্যাপারে কোন কৌতূহলই প্রকাশ করল না, তার চেষ্টা কেবল, কেমন করে পালাতে পারে। কিন্তু অপরটিকে লাঠি দিয়ে ছোঁয়াতেই সে আলোর ঝলকের মত লাফিয়ে উঠে সঙ্গে সঙ্গে ছোবল মারল। এদের জীবন্ত ধরতে নিশ্চয় পিগ্‌মিদের অনেক কসরত করতে হয়েছে, কারণ ছোবল খাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা তাতে। একজাতের গোখরো সাপও অনেক এল যারা তাদের বিষ ফুৎকার করে দিত, এরা আবার আরো বেশি সাংঘাতিক। উত্তেজিত হলে তারা সাধারণ গোখরোর মত ফণা তোলে বটে, আসলে কিন্তু এরা সত্যিই লক্ষ্য স্থির করে বিষ নিক্ষেপ করে থাকে। কাটা বা খোলা জায়গায় না পড়লে এ বিষে কোন অনিষ্ট হয় না, তাই এই চালাক সাপেরা চোখ লক্ষ্য করে বিষ নিক্ষেপ করে থাকে। এর ফলে প্রায়ই মানুষ অন্ধ হয়ে যায় ও অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে। বিষ নিক্ষেপ করার সময় এই সাপেরা ফণাটা পেছন দিকে নিয়ে গিয়ে মুখের বরাবর করে আনে, তারপর হঠাৎ বিষদাঁতের পেশীগুলো সঙ্কুচিত করতেই দুটো সরু লাইন করে হলদে বিষ ছিটকে বেরিয়ে আসে। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে হচ্ছে যে প্রায় অমোঘ ওদের লক্ষ্য।

এই গোখরোদের নিয়ে আমি কয়েকবার পরীক্ষা করে দেখেছি। মুখের সামনে একটা কাঁচ আর একটা লাঠি নিয়ে সে পরীক্ষা। প্রথমবারে বিষ আসে ন-ফুট পর্যন্ত, দ্বিতীয়বারে প্রায় পাঁচফুট। তৃতীয়বারের বার শুধু বিষ গড়িয়ে পড়ে খানিকটা।

পিগ্‌মিদের সঙ্গে বনে ঘুরতে ঘুরতে একবার একজন শিকারী হঠাৎ বাঁ চোখে হাত চেপে চিত হয়ে পড়ে গেল আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল, একটা গোখরো সাপ ঝোপের মধ্যে মিলিয়ে যাচ্ছে। তখনই বুঝতে পারলাম ব্যাপারটা। লোকটা খালি পায়ে হালকা পদক্ষেপে যেতে যেতে হঠাৎ একেবারে এই গোখরোটার সামনে পড়ে যায়, আর গোখরোটা ভয় পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে তার বিষ নিক্ষেপ করে। ও যদি কোন শ্বেতাঙ্গ হত তাহলে ওর ভারি পদক্ষেপে সাপটা আগে থেকেই পালিয়ে যেত, এ দুর্ঘটনা আর ঘটত না। আমি তো ভেবে পেলাম না কিভাবে ওকে সাহায্য করতে পারি, কিন্তু ওর বন্ধুরা দেখলাম এ বিষয়ে যথেষ্ট তৎপর। অদ্ভুত এক প্রতিকারের ব্যবস্থা

তারা করল। দু-জনে তাকে জোর করে চিত করে ফেলে এমন চেপে ধরল যে, লোকটার আর নিজের উপর কোন ক্ষমতাই রইল না। তার চোখটা টকটকে লাল হয়ে উঠেছে, দু-গাল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। অত্যন্ত আশ্চর্য হলাম যখন আর-একজন পিগ্‌মি ওঁর সেই চোখটায় প্রস্রাব করে দিল। প্রস্রাব করা হয়ে গেলে আহত লোকটি কোন কথা না বলে উঠে পড়ল, নীরবে আমরা তাঁবুতে ফিরে গেলাম। পরদিন সকালে শুনলাম, যে রাত্রেও আর-একবার এভাবে ওর চিকিৎসা করা হয়েছে। তিন দিনের মধ্যেই ওর চোখ একেবারে ভাল হয়ে গেল। পিগ্‌মিরা বললে যে এ না করলে অতি অবশ্যই ওর চোখ একেবারে নষ্ট হয়ে যেত। এ থেকে কেবল এটুকুই আন্দাজ করা যায় যে অ্যামোনিয়া আর ইউরিক অ্যাসিডের মধ্যে নিশ্চয় এর কোন প্রতিকার আছে।

পিগ্‌মিদের পথপ্রদর্শক করে আমি ঐ বনে অনেক ঘুরে বেড়ালাম। সুন্দর এ অঞ্চলটা। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছ থেকে লম্বা লম্বা লতা ঝুলছে, উড়ুক্কু কাঠবেড়ালিরা উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে তার মধ্য দিয়ে। তোতাপাখির দল চিৎকার করতে করতে এই চিরগোধূলির রাজ্যে উড়ে বেড়াতে থাকে, সুন্দর ছোট্ট সানবার্ড তীরবেগে উড়তে উড়তে বনবহুল অর্কিড রাশির মধ্যে পোকা ধরে ধরে খায়। গাছের ফোকরে বড় বড় প্রজাপতি ঘোরে ফেরে, কখনও বা দলে দলে হাতির নাদির তরল অংশটা পান করে। বলতে কি, এই জঙ্গলের মাত্র এক বর্গমাইল অঞ্চলে যেসব জীবজন্তুর সন্ধান মেলে, একটা পুরো জীবন কাটিয়ে দিলেও তার অতি সামান্যমাত্র পরিচয় পাওয়া যায়।

নমুনা সংগ্রহের ব্যাপারে পুরোপুরি পিগ্‌মিদের উপর নির্ভর না করে আমরা নিজে থেকেও কিছু-কিছু শিকার করলাম। দেখা গেল, ছোট ছোট পাখি আর জন্তুদের ধোঁয়ার বোমা ছুড়ে ডালপালার জটিল আবেষ্টনী থেকে বের করা সম্ভব। ভোল ও অন্যান্য জাতের তীক্ষ্ণদন্তীদের ফাঁদের সাহায্যে ধরা যায়। এইভাবে আমরা একটা মাম্বা সাপও ধরে ফেললাম; আফ্রিকার সবচেয়ে বিখ্যাত সাপ বলে ওর খ্যাতি। মাম্বা সাপ খুব সরু, বুড়ো আঙুলের চেয়ে মোটা হবে না। ওর চলাফেরা অত্যন্ত ক্ষিপ্র। লম্বায় ওরা ফুট-দশেকের বেশি হবে না। ভোল শিকার করতে গিয়ে ভুল করে সে আমাদের জালে জড়িয়ে পড়ে। মুক্তির চেষ্টায় সে অনেকখানি জমি গোল করে তছনছ করে ফেলেছিল, তার ফলে সে আরো দুটো ফাঁদে আটকে পড়ে এবং মুক্তির চেষ্টায় মারা পড়ে শেষ পর্যন্ত।

অনেকগুলো হাতির দাঁত পিগ্‌মিরা আমাদের কাছে নিয়ে এল,—কোন হাতি ওদের ফাঁদে ধরা, কোনটার বা স্বাভাবিক কারণে মৃত্যু হয়েছে। এর বিনিময়ে এদের চাহিদা অতি অকিঞ্চিৎকর—একমুঠো কাঁচা নুন মাত্র। অর্থাৎ এক পেনি দামের নুনের বিনিময়ে কুড়ি পাউণ্ড বা তারও বেশি ওজনের হাতির দাঁত মিলল। এখন বুঝলাম, গজদন্ত-শিকারীরা কিভাবে এত টাকা উপার্জন করে।

একরাশ গজদন্ত সংগ্রহ হল, এবং তাদের ওজন এমন কিছু একটা হল না যাতে কোন অসুবিধেয় পড়তে হতে পারে। দাঁতগুলো পুঁতে রেখে ওখান থেকে চলে গেলাম, ফেরার পথে নিয়ে যাব বলে। কিন্তু পরবর্তীকালে যখন সেই গজদন্ত নিয়ে যাবার অনুমতির জন্যে গেলাম, বেলজিয়ামের কর্মকর্তা জানালেন তা করতে হলে বিশেষ লাইসেন্স করতে হবে যার দাম ২৫,০০০ ফ্র্যাঙ্ক; তাও আবার সহজে পাওয়া যায় না। গজদন্তের কথা তিনি আমায় ভুলে যেতে উপদেশ দিলেন এবং আমি তাঁর সে উপদেশ গ্রহণ করলাম।

আমি কখনও ওকাপি শিকার করিনি, তাই ঠিক করলাম ডাঃ অ্যাক্রয়েডের জন্যে একটা ওকাপি শিকার করব, কারণ পিগ্‌মিরা যে ওকাপির চামড়া এনে দিয়েছিল সেগুলোর অবস্থা ভাল নয়। পিগ্‌মিদের কাছে ওকাপির মূল্য আহার্য মাংস হিসেবেই যায়। তাই তার ছাল ছাড়াবার ব্যাপারে তারা কোনই যত্ন নেয় না। কিন্তু বেজেদেনহাট বললে ওকাপি এতই লাজুক আর সাবধানী যে তার সন্ধান পাওয়া একরকম অসম্ভব। বললে সে, 'আমার তো মনে হয় না কোন শ্বেতাঙ্গ কখনো ওকাপি শিকার করেছে। ওর চামড়া নিয়ে যারা ফিরে গেছে সে চামড়া পিগ্‌মিদের কাছ থেকে পাওয়া। এমনকি পিগ্‌মিরা পর্যন্ত সহজে ওকাপি শিকার করতে পারে না, সাধারণত ফাঁদ পেতেই তারা সে কাজ সারে।'

তখনও আমার আশা ছিল যে হয়ত কয়েকটা বড় জন্তু মারতে পারব। পিগ্‌মিদের সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে একদিন একটা বনের মধ্যে এক জায়গায় গিয়ে পড়লাম। সেখানকার মাটি নোনা, বনের জন্তুরা সেখানে এসে সেই নোনা মাটি চেটে মুখের স্বাদ বদলায়। চিহ্ন দেখে বোঝা গেল, রাত্রে অনেক জন্তু সেখানে যাওয়া আসা করে। তারই কাছে একটা মাচান তৈরি করে সেদিন সন্ধ্যায় তার উপর উঠে বসলাম। কিন্তু মশার জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠতে হল। এই অসহ্য প্রাণীগুলো লুকিয়ে-থাকা মানুষকে পর্যন্ত ঠিক খুঁজে বের করবে। তাদের

একঘেয়ে ভন্‌ভনানিও তাদের হুল ফোটানোর চেয়ে কম বিরক্তিকর নয়।

চাঁদ উঠতে দেখলাম, একপাল হাতি নুন চাটতে এসেছে। কিন্তু হাতি শিকার করতে আমি আসিনি, সে ব্যাপারে আমার কোন কৌতূহল নেই। একটা রোগাটে অল্পবয়স্ক হাতি দল ছেড়ে বেড়াতে বেড়াতে আমি যে মাচানের উপর ছিলাম তার নিচে এল, তারপর সেই গাছের গুঁড়িতে তার কাঁধ ঘষতে শুরু করল,—যদি তাতে করে ঘাড়ের রক্তচোষা পোকাগুলোকে ঝেড়ে ফেলতে পারে। তার প্রতিটি নড়াচড়ার সঙ্গে গাছটা দুলতে শুরু করল, মাচানটার বাঁধনগুলোও আলগা হয়ে আসতে লাগল। হাতিটার ঘাড়ের উপর পড়া আমার অভিপ্রেত নয়, তাই ওকে ভয় দেখিয়ে তাড়াবার জন্যে বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করলাম। হাতিগুলো নিজেদের মধ্যে কিসব শব্দ করছিল, গুলির আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে একেবারে চুপ হয়ে গেল। কাছে কোন জলায় ব্যাঙেরা ডেকে চলেছিল, মুহূর্তের জন্যে থেমে গেল তারাও। হাতির পাল কিন্তু আমি যেমন ভেবেছিলাম, ভয়ে পালালো না, খানিকক্ষণ স্থাণুর মত নিশ্চল দাঁড়িয়ে উৎকর্ণ হয়ে রইল। বোঝা গেল ইতিপূর্বে তারা বন্দুকের শব্দ শোনেনি, অবাক হয়ে তাই ভাবছে এ কিসের শব্দ। তারপর হঠাৎ ফিরে নিঃশব্দে বনের মধ্যে চলে গেল।

মধ্যরাত্রি পর্যন্ত মশার এই উপদ্রব চলল। এই অভিজ্ঞতার পর আমি ঠিক করলাম ইতুরিতে আর শিকার নয়, পিগ্‌মিদের সে কাজ পিগ্‌মিদের উপরেই রইল।

মাংসের লোভ পিগ্‌মিদের এত বেশি যে সেজন্যে তারা যেকোন ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করতে প্রস্তুত। এই মাংসের নেশা অনেক উপজাতির মধ্যেই অত্যন্ত প্রবল এবং এর থেকে হয়ত কোনদিন নরমাংসের প্রতিও লোভ জন্মানোও বিচিত্র নয়। আফ্রিকার অনেক উপজাতির মধ্যেই নরমাংস ভক্ষণ প্রচলিত ছিল, কিন্তু সে ছিল ধর্মের অঙ্গ হিসেবে, খাদ্য হিসেবে নয়। শুনেছি পঞ্চাশ বছর আগেও নাকি প্রায়ই দেখা যেত কোন ক্রীতদাসকে গ্রামে বেঁধে রাখা হয়েছে আর খরিদ্দারটা তাকে টিপে-টুপে দেখছে মাংস হিসেবে সে কেমন হবে—অর্থাৎ গৃহকর্ত্রীদের বাজারে গিয়ে মাংস পরীক্ষা করে দেখার মত আরকি। এমন যদি হয় যে পুরো মানুষটা কেনবার খরিদ্দার জুটছে না, বিক্রেতা তখন তার বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিভিন্ন খরিদ্দারের কাছে বিক্রয় করে থাকে। প্রত্যেক খরিদ্দার হাড়-পোড়া ছাই দিয়ে তার কেনা অংশটা চিহ্নিত

করে তার উপর নিজের চিহ্ন এঁকে দেয়। বেচারা ক্রীতদাসকে কখনো কখনো সপ্তাহের পর সপ্তাহ এই অবস্থায় কাটাতে হয়, যতদিন না তার দেহের অপেক্ষাকৃত অবাঞ্ছনীয় অংশগুলিও বিক্রীত হচ্ছে। তারপর তাকে মেরে ফেলে ভাগ করে ফেলা হয়।

কঙ্গোয় যখন ছিলাম, একদিন দেখি একজন শ্বেতাঙ্গ প্রহরী অনেকগুলো স্থানীয় বাসিন্দাকে ধরে নিয়ে চলেছে। প্রত্যেকের গলায় একটা করে লোহার শেকল বাঁধা, পরস্পরের মধ্যে তাদের তিন ফুট ব্যবধানের শেকল। প্রহরীর কাছে শুনলাম নরখাদক হিসেবে তাদের শাস্তি দিতে নিয়ে চলেছে।

আমার কুলিদের মধ্যেও সে নরখাদক আছে এ কথা আমার কখনো মনে হয়নি। কিন্তু একদিন আমার ভয়ানক চমকে যেতে হয়েছিল। খাদ্যের জন্যে বুনো শুয়োর শিকার করতে গিয়েছিলাম, কিন্তু শূন্য হাতে ফিরতে হয়েছিল। দেখলাম রাঁধুনি তার কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে দিব্যি এক স্টু রান্না করেছে। হয়ত কুলিরা শিকারে গিয়েছিল এবং কিছু শিকার পেয়েছে, এই মনে করে আমি বসে পড়ে এক প্লেট মাংস চেয়ে নিলাম। কোন কথা না বলে রাঁধুনি একপ্লেট এনে দিল। রান্নাটা চমৎকার হয়েছিল,—অনেকটা শুয়োরেরই মত, কেবল একটু বেশি নোনতা লাগল। মাংস শেষ করে যখন আবার দেবার জন্যে প্লেট বাড়িয়ে দিলাম, একজন কুলি ভয়ে ভয়ে বললে, 'এ মাংস আপনার কাছে নিষিদ্ধ!' এ কিসের মাংস জিজ্ঞাসা করতে সে বললে, 'মাকোনো', অর্থাৎ, 'হাত'। আমি শিকারে বেরিয়ে যাবার পর স্থানীয় বাসিন্দার একটা দল আমাদের তাঁবুর পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিল, কিছু নুনের বিনিময়ে আমাদের কুলিরা তাদের খাদ্যসম্ভার থেকে একটা মানুষের হাত লাভ করে। দ্বিতীয় প্লেট আর খাব না স্থির করলাম।

যাই হোক, সমস্ত দোষ ত্রুটি সত্ত্বেও উত্তর কঙ্গোর মানুষদের আমার ভালই লাগত। ওদের স্বভাব ভাল, এবং ওদের ব্যাপারে বিশেষ হস্তক্ষেপ না করলে ওদের কাজ করানোও বেশ সহজ হয়ে ওঠে। ওদের নিয়ে আমাদের কখনো কোন বিপদে পড়তে হয়নি। আমার অভিজ্ঞতায় বলে, বন্য আদিবাসীরা সাধারণত কোন বিপদের সৃষ্টি করে না,—বিপজ্জনক হল সেই আদিবাসী যে শহরের আবহাওয়ায় বড় হয়ে উঠেছে। এও আমি লক্ষ্য করে দেখেছি যে কোন বন্দী বনের জন্তু সাধারণ বনের জন্তুর চেয়ে বেশি সাঙ্ঘাতিক হয়ে ওঠে। যেসব বাসিন্দাদের সঙ্গে আমাদের বনে দেখা হয়েছে তারা কারুর ক্ষতি করতে চায়

না, কেবল যারা ট্যাক্স আদায় করতে আসে তাদের ছাড়া ; আর, অনেক সময় তারা নষ্ট করে এই ট্যাক্স-আদায়কারিদের ডাইনি-মন্ত্রে মেরে ফেলবার সাধনায়। ডাইনি-মন্ত্র সফল হয় না তাই রক্ষা, না হলে আর এতদিনে ও অঞ্চলে ট্যাক্স আদায়কারীর কোন সন্ধান মিলত না।

ডাঃ অ্যাক্রয়েডের কাজ শেষ হলে আমরা ইতুরি ত্যাগ করে চলে গেলাম। উত্তর-পুবমুখো হয়ে আমরা লেক অ্যালবার্ট-এর পশ্চিম তীরে কাসেনাই-এ গেলাম, সেখান থেকে স্টীমারে করে হ্রদ পার হয়ে পূর্ব উপকূলে গিয়ে পৌঁছলাম বুতিয়াবায়। এখানে এসে আমরা দু-ভাগে ভাগ হয়ে গেলাম, ডাঃ অ্যাক্রয়েড আর আমি নাইরোবি ফিরলাম আর বেজেদেনহাট তার কাজে চলে গেল।

আফ্রিকায় আমি যত মানুষ দেখেছি তার মধ্যে বেজেদেনহাটের মত আশ্চর্য মানুষ আর একটি দেখিনি। যেমন তীক্ষ্ণ তার বুদ্ধি, তেমনি নৃশংস সে। ইচ্ছে করলে সে প্রচুর ক্ষমতার অধিকারী হতে পারত, কিন্তু তার অসুবিধে এই যে বেশিদিন সে জঙ্গল থেকে দূরে তার পিগ্‌মিদের ছেড়ে থাকতে পারে না।

এরপর কতকাল আমি কঙ্গো অঞ্চল থেকে ফেরা শিকারিদের বেজেদেনহাটের কথা জিজ্ঞাসা করেছি, কিন্তু কেউই কোন খবর দিতে পারেনি।

বলা বাহুল্য, নিরুদ্দেশ হয়েছে লোকটা। কিন্তু আমার নিশ্চিত ধারণা যে যদি সে আজও বেঁচে থাকে তো নিশ্চয় সে ঐ বিস্তীর্ণ ইতুরি বনের অভ্যন্তরে তার অতি প্রিয় পিগ্‌মিদের সঙ্গে বাস করছে।

॥ ১২ ॥ গণ্ডার শিকার

এই অধ্যায়ে আমি এমন একটা শিকারের কাহিনী বিবৃত করব যা কেবল আমার জীবনের নয়, যে-কোন শিকারীর জীবনের সবচেয়ে বড় শিকারের কাহিনী।

মাচাকোস-এর জেলা কমিশনার জর্জ ব্রাউনের কাছে ওয়াকাম্বা উপজাতির জরুরি তাগাদার ফলে আমি এ কাজে হাত দিই। এর প্রধান উদ্দেশ্য হল ঔপনিবেশিকদের জন্যে অধিক জমির সংস্থান করা। ব্রিটিশ শাসনে ওয়াকাম্বা উপজাতির সংখ্যা যেমন অন্তত ছ-গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, ওদিকে আবার

যেখানে যেখানে উপনিবেশ বসেছিল সেসব অঞ্চলে পর্যন্ত গণ্ডারের সংখ্যা এত বৃদ্ধি পেয়েছিল যে মহা আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছিল। এমনকি গণ্ডাররা যেন তাদের কুটির ও খেত-খামারের উপরেও তাদের দাবি জানাতে চায়। ফলে সন্ধ্যার পরে আর কেউ বেরোতে সাহস করত না,—গণ্ডারের আতঙ্ক এমনভাবে সকলকে পেয়ে বসেছিল।

অথচ এই অবস্থায় যে ওয়াকাম্বা শিকারিদের তীর ধনুক নিয়ে শিকার করতে দেওয়া হবে তাও নিরাপদ নয়, কারণ তাহলে আহত গণ্ডারের সংখ্যায় সমস্ত অঞ্চলটা একেবারে নরকে পরিণত হবে।

যে কাঁটা-ঝোপের অন্তরালে গণ্ডাররা আশ্রয় নিয়েছে, অত্যন্ত ঘন সে ঝোপ। সেখানে অগ্রসর হওয়া অত্যন্ত দুরূহ। সেই দুর্গম এলাকায় গিয়ে গণ্ডার শিকার করতে হলে প্রচুর চালাকির খেলা খেলতে হয়। গণ্ডারদের কাছ থেকে আমি অনেক চালাকিই শিখেছি, শিখেছি যে সাবধানে চলার চেয়েও বেশি দরকার শ্রবণশক্তির তীক্ষ্ণতা বাড়ানো। অবশ্য সম্পূর্ণ নিঃশব্দে অগ্রসর হতে না পারলে তো কোন কাজই হতে পারেনা। কতবার কতভাবে আমাদের হতাশ হতে হয়েছে। কখনো বাতাস, কখনো বা পাখির দল (ডানাওয়ালা গুপ্তচর !) আমার অস্তিত্ব প্রকাশ করে দিয়েছে। ভাগ্যের কথা এই যে আমার মত গণ্ডাররাও মাঝে মাঝে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ওঠে। নেহাৎ দৈববশেই একটা নতুন কায়দা আমার মাথায় এসেছিল ; যথাসম্ভব গণ্ডারের কাছাকাছি হয়ে, একটুও না নড়ে আমি আমার কাঁধ দোলাতে থাকতাম, আর তাতে আমার উপস্থিতি সম্বন্ধে সজাগ হয়ে পরম বিরক্তিভরে সঙ্গে সঙ্গে আমায় তাড়া করে আসত। এভাবে তারা আমার বন্দুকের আওতার মধ্যে এসে পড়ত। ব্যাপারটা যে প্রচুর উত্তেজনার, তাতে সন্দেহ নেই।

ক্যাপ্টেন রিচি আমায় এ-কাজে নিযুক্ত করেন বটে, কিন্তু তার আগে তাঁকে অনেক চিন্তা করতে হয়েছিল। উৎসাহী প্রকৃতিতত্ত্ববিদ ক্যাপ্টেন রিচি আফ্রিকায় শিকার সংরক্ষণের ব্যাপারে যা করেছেন তেমন আর কেউ করেননি। এর উপর আবার ছিল একটা বাড়তি সমস্যা,—ৎসেৎসে (Tsetse) মাছি দমন করার কাজ। মাচাকোস জেলায় এই মাছি দু-রকমের আছে,—পাওলিপিডিস আর লঙ্গিপেনিস। বড় সাইজের হর্সফ্লাই-এর সমান এর আকৃতি, এর কামড় গনগনে ছুঁচ ফোটানোর মত। তবু ভাগ্য ভাল যে এর কামড়ে সেই মারাত্মক ঘুম-রোগ হয় না যার ফলে মানুষের মৃত্যু ঘটে। কিন্তু তাদের বিষে গৃহপালিত

ক্রমশ।

প্রাণীর, বিশেষ করে গরু বাছুরের মৃত্যু হয়ে থাকে। তা আছে। এ বে...নি,—
এ বিষে কোন অনিষ্ট হয় না। আজও পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা...শিরভাগই ছোট
করতে পারেননি যাতে করে এ থেকে গরু বাছুরকে বাঁচানো সম্ভব হতেপারে। মেয়ের

এই পতঙ্গদের এড়াবার একমাত্র উপায় হল যে জঙ্গলে ওরা ডিম পাড়ে সেই জঙ্গল পরিষ্কার করা, যাতে আর ওদের বংশ-বৃদ্ধি না হয়। আবার ঝোপ পরিষ্কার করতে হলে প্রথমেই দরকার গণ্ডারদের মেরে ফেলা, কারণ গণ্ডার যে অঞ্চলে থাকে সেখানে কাজ করা কুলিমজুরদের পক্ষে অসম্ভব। সাত বছর ধরে ক্যাপ্টেন রিচি সমস্ত রকম ভাবেই চেষ্টা করে দেখেছেন কিভাবে সমস্ত গণ্ডারকে না মেরেও বসবাসের কাজ চালানো সম্ভব হতে পারে। মাচাকোস জেলার এই মাকুয়েনি অঞ্চলই হল আফ্রিকার সবচেয়ে বড গণ্ডারের ঘাঁটি, সেই হিসেবে বলতে গেলে একেই পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে বড গণ্ডার শিকারের কাহিনী বলা যেতে পারে।

যদিও আমি ইতিপূর্বে অনেক শিকারীকে নিয়ে গেছি এবং নিজেও অনেক গণ্ডার শিকার করেছি, এবারের ব্যাপারটা কিন্তু তা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। নমুনা সংগ্রহের জন্যে শিকার করা আর ঝোপের মধ্যে ঢুকে গণ্ডারের এলাকায় গিয়ে গণ্ডার শিকার করা এ-দুয়ের পার্থক্য যে কত তা কথায় বোঝানো সম্ভব নয়। নমুনার জন্যে শিকার সাধারণত কতকটা ফাঁকা এলাকাতেই হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে দূর থেকে তাদের দেখা যায় এবং শিকারটা বেছে নেওয়া সম্ভব হয়ে থাকে, আর যদি সেই গণ্ডার বনের মধ্যে পালিয়ে যায় তো শিকারী তার পিছু নেয় না, কারণ ঝোপে ঢুকে শিকার করা কোন শিকারীরই অভিপ্রেত নয়, কেননা সেক্ষেত্রে প্রায়ই দেখা যায় শিকারীকে আত্মরক্ষার তাগিদে গুলি করতে হয়েছে এবং ফলে নমুনা যা মেলে তা অনেক সময়েই খুব ভাল হয় না।

তিনজন স্থানীয় লোককে পথপ্রদর্শক হিসেবে নেওয়া হল,—জীবনের অধিকাংশ দিনই তাদের চোরাই শিকারের অপরাধে জেলে কেটেছে। তাদের একজনের বয়স চল্লিশের কোঠায়। কয়েক মিনিট তার সঙ্গে কথা কয়েই বুঝলাম যে ঝোপ-ঝাড়ের সঙ্গে যেমন নিবিড তার পরিচয়, শিকারের পিছু নেওয়ার কাজেও তেমনি অত্যন্ত নিপুণ সে। দ্বিতীয় ব্যক্তিটির বয়স অপেক্ষাকৃত অল্প, গাছে চড়ার ব্যাপারে সে অত্যন্ত ওস্তাদ এবং এজন্যে তার গর্বের সীমা নেই। ঝোপ অঞ্চলে শিকার করতে হলে এ এক মস্ত বড় গুণ,—কারণ প্রায়ই কোন বড় গাছে চড়ে শিকারের সন্ধান করতে হয়। পরম গর্বভরে সে বললে, 'গাছ

যেখানে যেখানে উপনিবেশগাতে যত কাঁটাই থাকুক তাতে আমার কিছু যায়
বৃদ্ধি পেয়েছিল যে মহ'আপনারা যেমন সহজে পথ চলেন তেমনি সহজে আমি
তাদের ,ভূঁতে পারি। এ বিষয়ে বেবুনরা পর্যন্ত আমায় হিংসা করে।' তৃতীয় লোকটির বয়স অত্যন্ত অল্প, সবেমাত্র তার বাল্যকাল কেটেছে। কিন্তু অদম্য তার উৎসাহ। অপর দু-জনের মত অভিজ্ঞতা না থাকলেও আমার মনে হল শিক্ষা পেলে সেও খুব ওস্তাদ হয়ে উঠবে।

এরা তিনজনেই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে এসেছে, বিপদের সম্ভাবনার সম্যক উপলব্ধি সত্ত্বেও। যেমন পযসা ওরা সাধারণত পেযে থাকে সে হিসেবে অবশ্য এখন ভালই পাবে, কিন্তু সে-লোভে ওরা আসেনি। জীবনে এই প্রথম তারা বন্দুকের ব্যবহার শিখবে, আর যখনই দরকার আমায় সাহায্য করবে। এই অলৌকিক বস্তুর প্রসঙ্গ উঠলেই ওদের চোখ জ্বলজ্বল কবে, খুশির হাসিতে ওদের মুখ উদ্ভাসিত হযে ওঠে। ওরাও আমার মত শিকাবেব কাজেই জীবন উৎসর্গ করেছে,—বাডিঘরের চিন্তা, সংসাবের ভাবনা, অর্থ বা শাবীবিক নিরাপত্তা সমস্তই এদের কাছে গৌণ।

কিন্তু যতই দিন যেতে লাগল ততই আমার মন দমে যেতে লাগল এই তিনজনেব আলোচনা শুনে—সে আলোচনার বিষয়বস্তু হল, বন্দুক নিযে ওরা কী কী করবে। বয়স্ক দু-জন যে ঝোপ-ঝাডের অভিজ্ঞতায় আমার চেয়ে অনেক বড তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু এদেশীয়দের পক্ষে মাসের পর মাস অভ্যাস না করে বন্দুকে হাত পাকানো একরকম অসম্ভব। ওদের স্থির বিশ্বাস যে গুলিব আঘাতের চেয়ে ববং বন্দুকের প্রচণ্ড শব্দেই জন্তু মারা পডে। ওদের কাছে রাইফেল হল এমনই এক আশ্চর্য বস্তু যে এ যে আবার লক্ষ্য স্থির করে ছুডতে হয় এ কথা ওদের বিশ্বাস করানোই দুষ্কর। তীব ধনুকের ব্যবহারে যত পারদর্শীই ওরা হোক, তীরন্দাজের মানসিক গঠন আর রাইফেলধারীর মানসিক গঠন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ওদের তীরধনুকের ব্যবহার কতকটা বেহালাবাদকের স্বর-সৃষ্টির মত ;—হাতিয়ারের স্পর্শের উপরেই উভয়ের সাফল্য। বন্দুক ব্যবহারের জন্যে দরকার সম্পূর্ণ অন্য রকমের মানসিক প্রস্তুতি।

নাইরোবি থেকে মাকুয়েনি পর্যন্ত রাস্তা থাকায় পথের প্রথম অংশটা লরি করেই যাওয়া গেল। সেখানে পৌঁছে আমরা লরি ছেড়ে ঝোপের মধ্যে প্রবেশ করলাম।

পূর্ব-আফ্রিকার ঝোপের একটা বৈশিষ্ট্য আছে যা আমি স্কটল্যাণ্ডে দেখি নি,

ক্রমশ।

এবং আমার মনে হয় না পৃথিবীর অন্য কোথাও তা আছে। এ বে নি,— জঙ্গল, না ফাঁকা জায়গা। বড়-বড় গাছ অতি অল্পই, বেশিরভাগই ছোট মেয়ের কাঁটা গাছ, বড়জোর দশ বা পনেরো ফুট উঁচু। এইসব কাঁটা গাছ ,। কাঁটা-ঝোপ প্রায় এক একর জমির উপর জন্মায়, কখনো বা এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে পড়ে; সেই সময় তাদের ভিতর দিয়ে হেঁটে যাওয়া সহজ। সেখানকার মাটি বালি মেশানো, আর লালচে। এ মাটিতে সহজেই পায়ের ছাপ পড়ে, তাই কোন জন্তুর চিহ্ন লক্ষ্য করে অগ্রসর হওয়া সম্ভব; কিন্তু কোথাও কোথাও আবার শক্ত হাতি ঘাসে ছাওয়া, সেখানে কারুর পায়ের চিহ্ন আবিষ্কার করা শক্ত। কোন-কোন জায়গায় গুচ্ছ-গুচ্ছ ঘাস জন্মায়, সেখানে ফাঁকে-ফাঁকে বেলে মাটি চোখে পড়ে। কিন্তু প্রায়ই শিকারীকে এমন অঞ্চলে গিয়ে পড়তে হয় যেখানে অনেকখানি জায়গা জুড়ে হাঁটু-সমান ঘাস জেগে উঠে কাঁটাঝোপের তলায় কার্পেটের মত বিছিয়ে থাকে। এহেন জায়গাতেই কোন জন্তুর চিহ্ন ধরে অগ্রসর হওয়া কঠিন।

কোন-কোন জেলায় এক বিশেষ ধরনের মাটি দেখা যায় যা কড়া রোদের তাপে প্রায় ইঁটের মত শক্ত হয়ে ওঠে, কোন জন্তু তার উপর দিয়ে হেঁটে গেলে তার কোন চিহ্নই দেখা যায় না। বলতে কি, বড়-বড় রাস্তা তৈরির কাজেও কেনিয়ায় এই মাটির ব্যবহার হয়,—এ প্রায় বিটুমেন-এর মত মজবুত। তবে, কাঁটা-ঝোপের নিচে এ মাটি যথেষ্ট নরম এবং সেইসব জায়গাতেই শিকারী বন্য জন্তুর পায়ের চিহ্নের সন্ধান করে।

মাচাকোস-এর জেলা কমিশনারের কাছে ঝোপ অঞ্চলের একটা ওয়াকাম্বা গ্রাম থেকে প্রায়ই গণ্ডারের অত্যাচারের খবর এসে পৌঁছচ্ছিল। এ গ্রামের সর্দারের নাম মুতুকু। আমাদের অভিযান এই গ্রাম থেকেই শুরু হল।

পরস্পরের প্রতিবেশী হলে কী হয়, মাসাইদের থেকে ওয়াকাম্বাদের পার্থক্য প্রচুর। লম্বায় তারা সাধারণ ইউরোপীয়ের থেকে কিছুটা ছোট, আর মাসাইরা সাধারণ ইউরোপীয়ের থেকে বেশ খানিকটা লম্বা। তাদের মুখের আদলে কোন-কোন উপজাতির মত নিগ্রয়েড ভাব বিশেষ স্পষ্ট নয়, বা মাসাই-দের পাতলা ঠোঁট আর নাসারন্ধ্র তাদের নয়। লড়িয়ে জাত না হয়ে তারা হয়েছে শিকারী। চিরাচরিত প্রথায় ওদের পুরুষরা শিকার করত আর স্ত্রীলোকেরা খেত খামারের কাজ করত, যদিও সে প্রথায় এখন ভাঙন ধরেছে। দেখলাম কয়েকজন যুবক ধনুক আর তীরভর্তি তূণ কাঁধে করে চলেছে।

যেখানে যে রকমের অস্ত্রের উপর আমার প্রচুর কৌতূহল, ওদের অস্ত্রগুলো পরীক্ষা বৃদ্ধি পেচোইতে ওরা তক্ষুনি রাজি হল।
তাদে" ,নুকগুলোর গঠননৈপুণ্য অপূর্ব, দুই কোণ সূচ্যগ্র। এক একটা ধনুকের ওজন হবে প্রায় পঁয়ত্রিশ সেরের কাছাকাছি। যে গাছ থেকে এ ধনুক তৈরি তার নাম মুতুবা, রঙ তার ঘন মেহোগেনি। কৌতূহলের সঙ্গে দেখলাম, ছিলা আটকাবার জন্যে ধনুকে কোন খাঁজ কাটা নেই, ওয়াকাম্বারা তার বদলে খানিকটা করে কাঁচা চামড়া সেখানে জড়িয়ে রাখে, যাতে ছিলাটা পিছলে না আসে।

ওদের তীরগুলোও চমৎকার,—সবচেয়ে বেশি বুদ্ধির পরিচয় মেলে সেই তীরের মাথার দিকটায়। বোনবার ছুঁচের মত সরু ছ-ইঞ্চিটাক লম্বা একটা ফলা সেখানে লাগানো। এই ফলার ইঞ্চিখানেক তীরটার ভিতরে ঢুকিয়ে একরকম গাছের আঠা দিয়ে আটকানো। যে পাঁচ ইঞ্চি বেরিয়ে রইল তাতে বিষ মাখানো থাকে। ঠিক মাথাটায় কিন্তু কোন বিষ মাখানো হয় না, কারণ যতই বিস সেখানে মাখানো হোক না কেন, নিতান্ত ছোট শিকার ছাড়া তাতে কারুর কোন ক্ষতিই হতে পারে না। এর কারণ, এই বিষ টাটকা অবস্থায় যত কার্যকরীই হোক না কেন, ভিজে গেলে কিংবা রোদ লাগলে অল্পক্ষণের মধ্যেই তার কার্যকরিতা হারিয়ে ফেলে, যেজন্যে ওয়াকাম্বারা এই বিষ-মাখানো ফলাটা অ্যান্টেলোপের চামড়া দিয়ে সযত্নে ঢেকে রাখে, এবং একেবারে চরম মুহূর্ত না আসা পযন্ত সে ঢাকা খোলে না।

গণ্ডার শিকারে যাবার আগে আমি আমার স্কাউটদের নিয়ে মুতুকু সদাবের সঙ্গে কয়েকটা দিন কাটালাম। ইতিমধ্যে ওদের শেখাতে লাগলাম কীভাবে রাইফেল ব্যবহার করতে হয়, আর নিজেও ওয়াকাম্বাদের ভাষা ও আচার ব্যবহার সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হতে থাকলাম। ওদের আমার ভাল লাগত। ওরা মনখোলা, সৎ প্রকৃতির মানুষ। ওদের মেয়েরা প্রচুর পরিশ্রম করে; কেবলমাত্র যে খেতের কাজ করে তাই নয়, রান্নার কাজ, বন থেকে কাঠ বয়ে আনার কাজও তারা করে। এদের ভার বহনের ক্ষমতা দেখলে অবাক হতে হয়। যখন থেকে টলে টলে হাঁটে সেই বয়স থেকেই ওরা যায় মায়ের সঙ্গে কাঠ কুড়োতে। ফেরার পথে মা গম্ভীরভাবে কিছু কাঠ তারও পিঠে বেঁধে দেয়। আর যতই সে বড় হতে থাকে, তার মোটও ততই ভারি হতে থাকে,—এই ভার বাড়তে বাড়তে শেষ পর্যন্ত প্রায় দু-মণের

কাছাকাছি পর্যন্ত হয়ে ওঠে। এইভাবে তারা বড় হয়ে ওঠে ক্রমশ।

প্রচুর দারিদ্র্য সত্ত্বেও কিন্তু গণিকাবৃত্তি ওদের মধ্যে চালু হয়নি,—অবশ্য সভ্যতার সংস্পর্শে যারা এসেছে তাদের মধ্যে ছাড়া। কোন মেয়ের যৌবনোন্মেষের সময় তাকে যে বিয়ে করতে চায়, কথামত পণ দিয়ে যায় সে। এই পণ দেওয়ার অর্থই হল, তার সঙ্গে তার বিবাহ হয়ে যাওয়া। তখন সে তার স্বামীর ঘর করতে যায় এবং খুব পরিশ্রম করে যাতে স্বামী যথেষ্ট রোজগার করে আবার একটি স্ত্রী ঘরে আনতে পারে যে তাকে গৃহস্থালির কাজে সাহায্য করবে।

কিবাকাঙ্গানোর অভাবে আমার একজন লোকের দরকার হল যে সমস্ত কাজের তদারক করবে—তাঁবুর ব্যবস্থা করা থেকে সাফারির অসংখ্য খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলো পর্যন্ত। অথচ যেসব স্কাউট আমার সঙ্গে শিকারের সন্ধানে জঙ্গলে প্রবেশ করবে, তাদের কারুর মধ্যেই সদারের গুণের লেশমাত্র আছে কি না সন্দেহ। তবে, ভাগ্যক্রমে আমি মুলুম্বেকে পেয়ে গেলাম। তার বয়স হয়েছে, সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য সে। আমাদের মধ্যে ক্রমে এমন সদ্ভাব গড়ে ওঠে যে সেই থেকে এখনো সে আমারই কাছে আছে, আমার বাড়ির তদারক করে আর শিকারে গেলে আমার বন্দুক বহন করে।

একদিন রাত্রে গ্রামের কুকুরদের ভীষণ চিৎকারে আমার ঘুম ভাঙল। এর কারণ যে গণ্ডার, তা আমি বুঝতে পারি নি। কুকুররা সিংহের গন্ধ পেলে জড়সড় হয়ে যায়, তাই আমি ভেবেছিলাম যে গণ্ডারের গন্ধেও হয়ত তাদের তেমনি অবস্থাই হবে। পরে জেনেছিলাম যে গণ্ডারের গন্ধ পেলে তারা বরং অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। ভোরবেলা মুতুকু সদারের কাছে শুনলাম, গণ্ডারের দল শাম্বায় প্রবেশ করেছিল। তার কথা মিথ্যা নয়, কারণ গণ্ডারের চিহ্ন প্রায় সর্বত্রই দেখা গেল। সঙ্গে সঙ্গে আমি স্কাউটদের নিয়ে চিহ্ন অনুসরণ করে জঙ্গলে প্রবেশ করলাম।

প্রথমটা জঙ্গল খুব একটা দুর্গম বোধ হচ্ছিল না, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তা অত্যন্ত নিবিড় হয়ে উঠল,—কেবল কাঁটা আর ঝোপের ঘন বুনুনি। ভাগ্য ভাল এখন বর্ষাকাল নয়, গাছে যে-কটি পাতা তাও শুকিয়ে হলদে হয়ে যাওয়া,—গণ্ডারের ধূসর রঙের সঙ্গে তার প্রচুর পার্থক্য। আমরা এগিয়ে চলেছি। একমাত্র যে জন্তু চোখে পড়ল সে একটা ছোট্ট ডিক-ডিক,—আকারে স্কটল্যাণ্ডের খরগোসের সমান। ছোট্ট প্রাণীগুলো ঝোপ ঝাড়ের ভিতর থেকে লাফিয়ে

বেরিয়ে আসছিল আর আচম্‌কা এমন তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠছিল যে শুনলে ভয়ানক চমকে উঠতে হয়।

একটা প্রায় অভেদ্য জঙ্গল আমাদের সামনে পড়ল। একমাত্র উপায় এখন সেই সঙ্কীর্ণ আঁকা-বাঁকা পথ যা ধরে গণ্ডাররা চলে গেছে। চলেছি, আর প্রাণপণে এই আশা করছি, যেন এই অবস্থায় অতর্কিতে কোন গণ্ডারের সামনে পড়ে যেতে না হয়! এছাড়া আর এখন আমাদের কিছুই করার নেই।

এই ভূতপূর্ব চোরাই-শিকারিদের ঝোপের মধ্যে পথ চিনে চলার যে ক্ষমতা দেখলাম তাতে তাদের একশোর মধ্যে একশো নম্বর না দিয়ে পারলাম না। শক্ত মাটিতে বা পাথুরে জায়গায় গণ্ডারের চিহ্ন লক্ষ্য করতে করতে কতবার আমার চোখ ঝাপসা হয়ে উঠেছে, অথচ আমার স্কাউটরা যেভাবে অবলীলাক্রমে সেই চিহ্ন লক্ষ্য করে চলেছে তাতে মনে হয়, তারা যেন একটা বিশেষ চিহ্নিত পথ ধরেই চলেছে। ওদের একজন চিহ্ন লক্ষ্য করে চলেছে আর আমি রাইফেল উদ্যত রেখে তাকে আগলে আগলে চলেছি। ক্লান্ত হয়ে পড়লে সে পেছিয়ে আসে, তখন আর-একজন এগিয়ে গিয়ে তার দায়িত্ব গ্রহণ করে। এইভাবে তারা সকলেই পালাক্রমে যথেষ্ট চোখের বিশ্রাম পায়।

হঠাৎ সামনের স্কাউটটা থেমে দাঁড়ালো, মাথা উঁচু করল কি শোনবার চেষ্টায়। কয়েক মুহূর্ত আমি কিছুই শুনতে পেলাম না, তারপর গণ্ডারটার কিছু চিবোবার ক্ষীণ শব্দ আমার কানে এল। আমাদের বাঁ দিকের ঝোপের মধ্যে সে চরছিল। যথাসম্ভব নিঃশব্দে আমরা অগ্রসর হতে লাগলাম। একজন স্কাউট কেবলই খানিকটা করে মাটি গুঁড়িয়ে হাওয়া পরীক্ষা করতে লাগল। বাতাসের গতি এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই, এবং যাতে একটুও শব্দ না হয় সেদিকে আমি বিশেষ করে দৃষ্টি রাখলাম। আমার ধারণা যে কোন বন্য জন্তুর থেকে গণ্ডারের শ্রবণশক্তি বেশি প্রখর,—অনেকটা দূর থেকেও সে অদ্ভুতভাবে মানুষের পায়ের শব্দ শুনতে পায়। আমার পায়ে ছিল আমেরিকান জুতো—এ জুতোর সুবিধে হল এই যে, এ পরে কোন নরম ডালের উপর পা দিলে তার ভেঙে যাওয়া অনুভব করা যায় ও সঙ্গে সঙ্গে সাবধান হওয়া সম্ভব হয়। আর আমার স্কাউটদের তো খালি পা, তাই আমার চেয়েও নিঃশব্দে চলাফেরা করা তাদের পক্ষে সম্ভব। তাদের আরো একটা সুবিধে এই যে তারা প্রায় উলঙ্গ বললেই চলে,—গাছের ডালপালা তাদের খালি গায়ে লেগে কোন শব্দই তোলে না। কিন্তু কী করে যে তারা কাঁটার আঁচড় সহ্য করে এগিয়ে চলে তা

আমার ধারণার বাইরে,—কাঁটার আঁচড়ে আঁচড়ে তাদের শরীর অসংখ্য সাদা সাদা দাগে ভরে যায়।

প্রায়ই আমাদের থেমে পড়ে গণ্ডারের সেই চিবোনোর শব্দ শুনতে কান পাততে হচ্ছিল। যতক্ষণ সে শব্দ পাচ্ছি, জানি যে সে আমাদের এগিয়ে আসা আন্দাজ করতে পারে নি। কিন্তু হঠাৎ এক সময়ে থেমে গেল সে শব্দ। তখন একজন স্কাউট সামনের দিকে দেখিয়ে দিল। দেখলাম, একটা গণ্ডার মাথা তুলে নিশ্চল দাঁড়িয়ে রয়েছে, তার দুই কান একবার পেছন দিকে একবার সামনের দিকে নড়ছে, সে চেষ্টা করছে যাতে সামনে থেকে বা পেছন থেকে কোন শব্দই তার কান এড়িয়ে না যায়। গণ্ডারের দুই কান আলাদাভাবে কাজ করে চলে,—একই সঙ্গে সে একটা কান সামনে রেখে অপর কানটা পেছন দিকে রাখতে পারে, এতে করে সে সামনে থেকে যেমন, তেমনি পেছন থেকেও যেকোন শব্দ শুনতে পারে।

অপেক্ষা করে রইলাম কখন গণ্ডারটা এমন অবস্থায় আসবে যখন আমি তাকে গুলি করতে পারব। স্কাউটরা ছটফট করতে লাগল,—স্থানীয় বাসিন্দারা যখন শিকারের সন্ধান পায় অথচ দেখে গুলি করতে দেরি হচ্ছে তখন তারা এমনিই ছটফট করে থাকে। অনেকগুলো পাখি গণ্ডারটার পিঠে বসে পোকা খেয়ে চলেছে আর চারিদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখছে। গণ্ডারের দৃষ্টিশক্তি ভাল নয়, এই পাখিগুলোই তার চোখের কাজ করে থাকে। গণ্ডারের চামড়ার বড়-বড় খাঁজের মধ্যে থেকে এরা পোকা খেয়ে চলে, আর তার বিনিময়ে তারা প্রহরীর কাজ করে তাকে সাবধান করে দেয়। স্কাউটদের অস্বস্তি প্রকাশের শব্দে পাখিরা দেখতে পেল তাদের। সঙ্গে সঙ্গে তারা সাবধানী ডাক ডাকতে ডাকতে আমাদের দিকে উড়ে আসতে লাগল আর মুহূর্তমধ্যে গণ্ডারটা সাবধান হয়ে উঠে পাখিগুলো যেদিকে উড়ে গেল চট্ করে সেদিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালো,—তার দু-কান সামনের দিকে ঘোরানো, সামান্যতম শব্দও যাতে তার কান এড়িয়ে না যায়। তারপরে সে ল্যাজ শূন্যে তুলে একটু একটু করে আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। মাত্র দশ গজ এগোতে না এগোতেই তার চোখে পড়ল আমাদের নিশ্চল মূর্তি। যেভাবে সে ধীরে ধীরে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছিল দেখে মনে হয় যেন একটা প্রকাণ্ড শিঙাল ট্যাঙ্ক এগিয়ে আসছে,—ট্যাঙ্কটার ইঞ্জিনের মধ্যে মগজ রয়েছে। গণ্ডারকে বোধহয় এমন কোন বদমেজাজি ক্ষীণদৃষ্টি বৃদ্ধ কর্নেলের সঙ্গে তুলনা করা চলে, যার বাগানে

কেউ বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করেছে। তার প্রথম ঝোঁকটাই হবে আগন্তুককে তাড়িয়ে দেওয়ার, কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হবে যে হয়ত লোকটা সাঙ্ঘাতিক, তাই একটু ইতস্তত করবে সে। সসম্মানে চলে যাওয়া যদি তার পক্ষে সম্ভব হয় তাহলে হয়ত চলেই যাবে, কিন্তু যদি তার গরহজম হয়ে থাকে, বা যদি সে স্বভাবতই বদমেজাজি হয়, হয়ত তখন ঝঞ্ঝাটের সৃষ্টি করবে সে।

স্কাউটরা তো ইতিমধ্যে উত্তেজনায় কাঁপতে শুরু করেছে। তাদের এই অতি সামান্য নড়াচড়াই আক্রমণ ডেকে আনার পক্ষে যথেষ্ট হল। তার মাথা নিচু হল, ঝোপ ঝাড় ভেঙে সে তেড়ে এল আমাদের লক্ষ্য করে। আমি গুলি করতেই সে হাঁটুতে ভর করে পড়ে গেল। মুহূর্তমধ্যে আবার উঠে দাঁড়ালো সে। এক ঝোঁকে আমাদের কাছ থেকে ফিরে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে আমার দ্বিতীয় গুলিটা তাব কাঁধে গিয়ে লাগল। এবার যে সে পড়ে গেল, আর উঠল না।

আমার গুলিব শব্দ মিলিয়ে যেতে না যেতেই পেছন থেকে উল্লাস-ধ্বনি শোনা গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই অর্ধনগ্ন মানুষের দল ঝোপ ঝাড় ডিঙিয়ে শিকার লক্ষ্য করে এগিয়ে আসতে শুরু করল। প্রত্যেকের হাতে একটা করে পাত্র,—ঝুড়ি, থলি যে যা পেরেছে নিয়ে এসেছে। সকলের হাতেই কোন না কোন রকমের দেশী ছুরি। খেত-খামারে গণ্ডারের উপদ্রবের জন্যেই বলতে গেলে, এ অঞ্চলের বাসিন্দারা যেভাবে দিন কাটাচ্ছে তা প্রায় অনশনের কাছাকাছি বলা চলে। পিঁপড়ের মত তারা সারে সারে এসে গণ্ডারটাকে ছেঁকে ধরল, যতক্ষণ না আর ছাল ছাড়ানো হয় ততক্ষণ পর্যন্তও তাদের আটকে রাখা কঠিন হয়ে উঠল। যে মুহূর্তে ছাল ছাড়ানো হয়ে গেল সেই মুহূর্তেই অসংখ্য কালো মূর্তির আড়ালে গণ্ডারটা ঢাকা পড়ে গেল, আর তাদের ছুরিগুলো এত ঘন ঘন উঠতে আর পড়তে লাগল যে ভয় হল হয়ত ওরা উৎসাহের আতিশয্যে নিজেদেরই মারাত্মকভাবে আঘাত করে বসছে; কিন্তু তবুও সেদিকে কারুর লক্ষ্য নেই। বাদামি রঙের চিলের ঝাঁক মাঝে মাঝে এসে ছোঁ মেরে পড়ে, কখনো কখনো হয়ত কারুর হাত থেকে এক টুকরো মাংস ছিনিয়ে নিয়ে আবার উড়ে পালায়। এই চিলেরা এত বেগে উড়তে পারে যে অনেক সময় মানুষ বুঝতেই পারে না কী হল, খালি হাতের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে ভাবে, কোথায় গেল মাংস!

আশ্চর্য অল্প সময়ের মধ্যেই সেই বিরাট গণ্ডারের দেহের আর বিশেষ

কিছুই অবশিষ্ট রইল না কেবলমাত্র কয়েকটা হাড ছাড়া। মাংসলোলুপ মানুষের দল নাড়িভুঁড়িগুলো পর্যন্ত নিয়ে যেতে ছাড়ল না।

গণ্ডারটার খড়্গ আর চামড়া আমি গভর্মেন্টের জন্যে রেখে দিলাম। গণ্ডারের চামড়ার দাম দশ পাউণ্ড,—তাতে টেবিল-রুপ হয়, চাবুক হয়, আবার চেয়ারে পেতে বসবার কাজেও লাগে। ভাল করে তেল লাগালে এর রং স্নিগ্ধ হয়ে আসে, অপূর্ব দেখায় তখন। আর খড়্গগুলোর এক পাউণ্ডের দাম হয় তিরিশ শিলিঙের মত,—সবার সেরা গজদন্তের চেয়ে দশ শিলিং বেশি। গণ্ডারের এই খড়্গ কিন্তু আসলে আর কিছুই নয়, কেবল জমাট বাঁধা লোম শুধু, হাতির দাঁতের মত একে কেটে কুটে কোন কাজে লাগানো যায় না, কাটতে গেলেই এ গুঁড়িয়ে যায়।

এ অঞ্চলে বারোটা গণ্ডার আমি শিকার করলাম, তাদের কোনটাকে মারতেই আমার বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। তারপর মিঃ বেভার্লি এসে আমার সঙ্গে যোগ দেন। কৃষি দপ্তর থেকে তিনি এক প্রকাণ্ড দল নিয়ে জঙ্গল পরিষ্কার করতে এসেছেন। মিঃ বেভার্লির সঙ্গে আলোচনার পর আমরা আমাদের কর্মপদ্ধতি স্থির করলাম।

তিনি বললেন, 'লোকজনকে জঙ্গলে পাঠাবার আগে আমার নিশ্চয় হওয়া দরকার যে সে এলাকায় আর কোন গণ্ডারের অস্তিত্ব নেই, কারণ যদি দু-একজন গণ্ডারের গুঁতো খায় তাহলে আর কেউ কাজ করতে রাজি হবে না এবং তখন আর আপনি তাতে আপত্তি করতে পারবেন না। আমার মনে হয় আপনার উচিত সব সময়ে আপনার লোকজনদের নিয়ে এগিয়ে থাকা। আমরা এগোবো যখন আপনার কাছ থেকে খবর পাব যে এ অঞ্চলের গণ্ডার সব মারা পড়েছে।'

ভাল যুক্তি, সন্দেহ নেই, যদিও এর অর্থ এই যে সর্বদাই আমায় স্কাউটদের নিয়ে নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে থাকতে হবে এবং লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে একটা গণ্ডারও হাতছাড়া হতে না পাবে। কিন্তু আপত্তি করবার উপায় নেই, কারণ আমাদের কাজই হচ্ছে তাই।

পরদিন সকালে বেরিয়ে পড়লাম আমরা। ঝোপের অন্তরালে যেতে যেতে আমরা শুনতে পেলাম মিঃ বেভার্লির দলের সবিক্রমে জঙ্গল কাটার শব্দ।

এগোতে এগোতে সমতল জমি ক্রমে নিচু তরাই জমির মত হয়ে উঠল, তার এখানে ওখানে সঙ্কীর্ণ উপত্যকা। এহেন অঞ্চলে বাতাস হল এক

মহা সমস্যা—একভাবে বইতে বইতে যখনই কোন শৈলশিরার কাছে পৌছয় সঙ্গে সঙ্গে নানা কারণে একেবারে অন্যদিক থেকে বইতে থাকে। অর্থাৎ সন্তর্পণে কিছুক্ষণ কোন গণ্ডারের পিছু নেবার পর হয়ত হঠাৎ দেখা গেল যে বাতাস গতি পালটে শিকারীর দিক থেকে শিকারের দিকে বয়ে চলেছে। আর আমার মনে হয়—হয়ত এ আমার কল্পনা মাত্র, যে এ অঞ্চলের মাটিতে পদক্ষেপের শব্দ অনেকগুণ বর্ধিত হয়। এ জেলার অনেক অংশেই আগ্নেয়গিরির উদ্গারের চিহ্ন বর্তমান ; তার শক্ত, ছিদ্রবহুল আস্তরণের উপর প্রতি পদক্ষেপে এমন একটা ফাঁপা আওয়াজের সৃষ্টি হয়, যেন কোন প্রকাণ্ড গুহার ছাদের উপর হেঁটে বেড়ানো হচ্ছে।

প্রথম দিনই আমার সবচেয়ে ছোট স্কাউটটি প্রায় মারা পড়তে বসেছিল। সবেমাত্র তার বন্দুকের ব্যবহারে হাতেখড়ি হয়েছে, ইতিমধ্যে সে এই নতুন বিদ্যার পরিচয় দিতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। একটা ঝোপের ধারে একটা গণ্ডারকে দেখে সঙ্গে সঙ্গে সে তার দিকে অগ্রসর হল। গণ্ডারটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়তে সেও গণ্ডারের পথ ধরে হালকা ঝোপের আড়াল দিয়ে সন্তর্পণে তার পিছু নিল। বাতাস ছিল তার অনুকূল, কিন্তু গণ্ডারটা বোধহয় শক্ত মাটিতে তার পায়ের আওয়াজ পেয়েছিল, মুহূর্তমধ্যে ঘুরে দাঁড়িয়ে তাকে তাড়া করে এল।

সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটা প্রচুর উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে দু-পা ফাঁক করে শূন্যে লাফিয়ে উঠল এবং এতে করেই সে প্রাণে বেঁচে গেল, নতুবা নির্ঘাত তার দুই পায়ের মাঝখানে গণ্ডারের খড়্গের গোঁত্তা লাগত। গণ্ডারের দুটো খড়্গ থাকে, একটার পেছনে আর-একটা। লাফিয়ে ওঠার ফলে সামনের খড়্গটা এড়িয়ে গেলেও কিন্তু পেছনেরটা এড়াতে পারল না, সেটা তার দেহ স্পর্শ করল। সঙ্গে সঙ্গে গণ্ডার তাকে এক গোঁত্তা মারল আর তৎক্ষণাৎ সে আকাশে ছিটকে উঠল, তার রাইফেলটা ছিটকে পড়ল ; গুলি করার সুযোগমাত্র সে পেল না। মাটিতে পড়ে সে প্রায় অচৈতন্য হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি ছুটে গেলাম তার কাছে, ভয় হল হয়ত মারাই গেছে সে। কিন্তু দেখলাম, কেবল কয়েকটা ছড়ে যাওয়ার দাগ আর দু-পায়ের মাঝখানের খানিকটা মাংস হারানো ছাড়া বিশেষ আঘাত সে পায়নি।

তুলে ধরতে ছেলেটি ক্ষমা প্রার্থনার স্বরে বললে, 'বাওয়ানা, গুলি করবার সময়ই আমি পাইনি! রেলগাড়ির মত জোরে ছুটে এল গণ্ডারটা! আমার

সামনের সমস্তটা যেন ও ঢেকে ফেলল,—বন্দুক তুলে নেবার কথা ভাববারও সময় পেলাম না!'

ওর মনের ভাব আমি সহজেই অনুমান করতে পারি। অত ভারি শরীর সত্ত্বেও গণ্ডাররা অসম্ভব বেগে ছুটতে পারে এবং পূর্ণ বেগে ছুটতে ছুটতেও তারা নিজেদের যেটুকু দৈর্ঘ্য মাত্র যেটুকু জায়গার মধ্যেই ঘুরে দাঁড়াতে পারে। যেভাবে তারা পাক খেতে বা শরীর দোমড়াতে পারে, যেকোন পোলো খেলার টাট্টুও লজ্জা পাবে তাতে। ঝোপ ঝাড়কে তারা একেবারেই গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না এবং অত্যন্ত জটিল জঙ্গলও যেভাবে তারা অতি সহজেই ভেদ করে যায়, যেন তা সামান্য তৃণ ছাড়া কিছু নয়।

জঙ্গলের সকল প্রাণীই গণ্ডারকে পথ ছেড়ে দেয়। দু'বার আমি হাতিকে দেখেছি খ্যাপা গণ্ডারের সঙ্গে লড়াই থেকে বিরত হতে। একটা সঙ্কীর্ণ পথের বিপরীত দিক থেকে ওরা এসে পড়েছিল, এবং একই সঙ্গে ওরা পরস্পরের অস্তিত্বের সন্ধান পায়। গণ্ডার তার পথ আগলে নিশ্চল দাঁড়িয়ে পড়ল, আর হাতিটা প্রথমে নার্ভাসভাবে বাতাসে ঘ্রাণ নিল, তারপর পথ ছেড়ে যথেষ্ট সন্তর্পণে খানিকটা ঘুরে গণ্ডারকে এড়িয়ে চলে গেল। উভয় ক্ষেত্রেই এই একই ব্যাপার দেখেছিলাম।

গণ্ডারদের এই বদমেজাজের কারণ আমি জানি না, যদিও আমার এক শিকারীর এক অদ্ভুত ধারণা ছিল। একটা খ্যাপা মাদি গণ্ডার একবার ভদ্রলোককে গুঁতিয়ে দেয়। সম্পূর্ণ বিনা কারণে এভাবে গুঁতিয়ে দেওয়া ভদ্রলোকের কাছে মনে হয় অত্যন্ত অসঙ্গত। এরপর দেখি, চলতে চলতে তিনি যখনই পাচ্ছেন গণ্ডারের বিষ্ঠা পরীক্ষা করে দেখছেন। শেষকালে খুব গম্ভীরভাবে আমায় বললেন, 'জান হাণ্টার, কেন এই গণ্ডারগুলো এত বদমেজাজি? এর কারণ, ওদের কখনও পেট পরিষ্কার হয় না।' ভদ্রলোকের এ কথা আমি কখনো ভুলি নি এবং আমার মনে হয় এর মধ্যে কিছুটা সত্যতা থাকা খুবই সম্ভব, কারণ গণ্ডার তার খাবার ভাল করে না চিবিয়েই খেয়ে ফেলে, যার ফলে তার নাদিতে প্রচুর অজীর্ণ খাদ্যবস্তু পাওয়া যায়।

ঝোপ ঝাড়ের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে যাবতীয় গণ্ডার সব মারতে মারতে অগ্রসর হওয়া দেখলাম নেহাতই অসম্ভব ব্যাপার। বিভিন্ন গ্রাম থেকে গণ্ডারের উৎপাত থেকে বাঁচাবার জন্যে এত আর্ত আহ্বান আসতে লাগল যে সে-ডাকে সাড়া না দেওয়াটা অত্যন্ত অমানুষিক হত। সৌভাগ্যবশত জঙ্গল কাটার কাজে

সময় লাগে বেশি, তাই এসব ডাকে সাড়া দেবার সময়টুকু পেয়ে যাই। এ সত্ত্বেও আমাকে দেখতে হয় কোন্ ডাকটা কম জরুরি আবার কোন্‌টা বেশি জরুরি। মুতুকুও আমায় কতবার ডেকে নিয়ে গেছে তার খেত থেকে গণ্ডারের উৎপাত দূর করতে। বিভিন্ন গ্রামের কয়েকজন সর্দার তো রীতিমত অস্থির হয়েই উঠল ; তাদের ধারণা, আমি মুতুকুর জেলায় বড বেশিদিন রয়ে গেছি। মাচোকা নামে এক সর্দার একবার সদলে আমার কাছে এসে হাজির,—একটা অত্যন্ত দুর্দান্ত গণ্ডার নাকি তাদের গ্রামে মানুষ দেখলেই তাড়া করছে। একটু বিরক্তির সঙ্গে তাকে বললাম যে একই সময়ে সব জায়গায় থাকা তো আমার পক্ষে সম্ভব নয়, মুতুকুর গ্রামের কাজ সেরে তাদের গ্রামে যাব। এতে সে অত্যন্ত আহত হল, যদিও আমি তাকে কথা দিয়েছিলাম যে দু-দিনের মধ্যেই আমি তার গ্রামে যাচ্ছি।

সেদিনই বিকেলে কয়েক ঘণ্টা পরে আমি হঠাৎ দেখলাম, মাচোকা ছুটতে ছুটতে আমার তাঁবুর দিকে আসছে। গ্রামে ফিরেই সে শোনে, ইতিমধ্যে গণ্ডারটা একটি স্ত্রীলোককে হত্যা করেছে। স্ত্রীলোকটি জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করতে গিয়েছিল। তার দেহ আমি দেখব বলে রেখে দেওয়া হয়েছে।

এই খবর শুনে আমার যে কী মনোভাব হল তা সহজেই অনুমেয়। সঙ্গে সঙ্গে আমি মাচোকা সর্দারের সঙ্গে বেরিয়ে পডলাম, মুচুকু সর্দারকে বলে গেলাম এই গণ্ডারটাকে আগে মেরে তারপর তার গ্রামে আসব।

পাথরের নুড়িভরা একটা শৈলশিরার ঢালের উপর স্ত্রীলোকটি পড়ে রয়েছে, যেসব কাঠকুটো সে সংগ্রহ করেছিল সে সমস্ত ছড়ানো রয়েছে ইতস্তত। ঢালু পথটা যুগ-যুগ ধরে মানুষের খালি পায়ের চাপে মসৃণ হয়ে নেমে গেছে। বোঝা গেল, স্ত্রীলোকটি এই ঢালু বেয়ে নেমে যাচ্ছিল, আর ঠিক সেই সময়ে গণ্ডারটা উঠে আসছিল। দেখামাত্রই নিশ্চয় গণ্ডারটা তাকে তেড়ে এসে এক গোঁত্তায় শেষ করে ফেলেছে।

পায়ের দাগ দেখে বুঝলাম, গণ্ডারটা মাদি। মাত্র কয়েক পা যেতেই একটা গণ্ডার-শাবকের পায়ের দাগও তার পাশে পাশে পাওয়া গেল। বোঝা গেল, এই বাচ্চা সঙ্গে ছিল বলেই তার মা এরকম ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। সঙ্গে বাচ্চা আছে এমন কোন স্ত্রী-পশুকে কেউ মারতে চায় না, তাই প্রচুর বিরক্তির সঙ্গে আমাকে তার পিছু নিতে হল।

যদি আমি কোন বাচ্চা গণ্ডার ধরতে পারি সেটাকে নিয়ে আসবে বলে

মিঃ সভেজ নামে জনৈক পেশাদার দু-জন লোক আমার সঙ্গে পাঠিয়েছিলেন, কারণ বাচ্চা গণ্ডারের চিড়িয়াখানায় প্রচুর চাহিদা। এবার আমি তাদের সতর্ক হতে বললাম। তারপর দু-জন স্কাউটকে নিয়ে মাদি গণ্ডারের চিহ্ন লক্ষ্য করে অগ্রসর হলাম।

স্ত্রীলোকটি যেখানে মারা পড়েছিল যেখান থেকে যে বিস্তীর্ণ অঞ্চল চোখে পড়ে, তার সমস্তই ঘন ঝোপে ভর্তি। এই জঙ্গলের মধ্যেই আমাদের গণ্ডার আর তাব শাবকের সন্ধান মিলবে। এই উঁচু জায়গা থেকে জঙ্গলটা বিশেষ ঘনসন্নিবদ্ধ বলে মনে হল না। অসংখ্য মানুষেব ভিড় হয়েছে, স্ত্রীলোকটির হত্যাকারীর মৃত্যু দেখবে বলে আব টাটকা মাংসের লোভে। শৈলশিরার উপর তারা অনেক দূর পযন্ত ছড়িয়ে বসে রয়েছে আর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকাচ্ছে, যদি কোনক্রমে নিচের ঝোপ জঙ্গলের আড়ালে গণ্ডারটার দেখা মেলে। এভাবেই তাব সন্ধান মেলা সহজ এই মনে করে আমি আর তার চিহ্ন ধরে অগ্রসর হলাম না। স্কাউটদের নিয়ে বসে পড়ে প্রতীক্ষায় রইলাম।

এইভাবে আধঘণ্টাটাক কাটল। তারপর হঠাৎ শোনা গেল একটা উত্তেজিত চিৎকার। অনেকগুলো আঙুলের নির্দেশ অনেকটা দূরে উপত্যকার মধ্যে একটা জায়গা দেখিয়ে দিল। কিছুক্ষণ আমি কিছুই দেখতে পেলাম না, তারপর একটা ধূসর রঙের বস্তু পলকের জন্যে আমার চোখে পড়ল,—সেটাকে একটা গ্র্যানাইট পাথরের টুকরো মনে হতে পারত যদি না সেটার মন্থর গতি ঝোপঝাড়ের মধ্যে চলতে চলতে কখনো দৃশ্যমান আর কখনো অদৃশ্য হয়ে যেত।

নাকের সিধেয় ধরতে গেলে গণ্ডারটার আর আমাদেব মধ্যের দূরত্ব আধ মাইলের বেশি হবে না। বাতাস আমাদের অনুকূল ছিল, তাই মনে হল নিশ্চয় ওর কাছে যেতে বেশি সময় লাগবে না। একজন স্কাউটকে সঙ্গে নিয়ে আর অপর জনকে শৈলশিরা থেকে গণ্ডারের গতিবিধি লক্ষ্য করতে বলে আমি ঢালু বেয়ে উপত্যকায় নামতে শুরু করলাম।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝলাম যে উপর থেকে দেখে যতটা মনে হয়েছিল এ জঙ্গল আসলে তার চেয়ে অনেক বেশি দুর্গম। মাত্র কয়েক গজ অগ্রসর হতেই যেখান দিয়ে আমরা এসেছি সে জায়গাটা অদৃশ্য হয়ে গেল। যেখানে গণ্ডারটাকে দেখা গিয়েছিল তার অর্ধেক পর্যন্ত অগ্রসর হওয়ার পর দেখা গেল, কোথায় সে বিশ্রামের জন্যে শুয়েছিল। এক্ষেত্রে ভুল হবার কোন সম্ভাবনাই

নেই,—মা-গণ্ডারের বড় বড পায়ের দাগ আর বাচ্চার ছোট ছোট পায়ের দাগ দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট। গণ্ডারের একটা বিশেষ ধরনের বিশ্রামের জায়গা আছে—সে হল জঙ্গলের সবচেয়ে ছায়া-ঘেরা অঞ্চল। সেখানে গিয়ে তারা দিনের সবচেয়ে গরম সময়টা কাটায়। এদিকে তুপুর এগিয়ে আসছে, বুঝলাম এবার সে তার বিশ্রামের জায়গায় আসবে। তাই ঠিক কবলাম তার জন্যে অপেক্ষা করব।

আধ ঘণ্টা পরে হঠাৎ স্কাউটটা তাব আঙুল সামনের দিকে প্রসারিত করল, তারপর আঙুলটা বেঁকিয়ে আমার দিকে নির্দেশ করল। অর্থাৎ সে গণ্ডারটার সাড়া পেযেছে এবং জানতে পেরেছে যে গণ্ডারটা আমাদের দিকে আসছে। আর' কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল গণ্ডারটা আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে, বাচ্চাটা তাব পিছু পিছু। স্ত্রীলোকটির দেহের শুকনো রক্ত তখনও তার খড়্গে লেগে রয়েছে। মুহূর্তের জন্যে গণ্ডারটা থেমে দাঁড়ালো আর বাচ্চাটা এগিয়ে এসে তার বাঁট থেকে তুধ খেতে শুরু করল। বাতাস একভাবে বয়ে চলেছে বটে, কিন্তু তবুও গণ্ডারটা কিভাবে জানিনা আমাদের সন্ধান আন্দাজ করে অস্থির হয়ে উঠল। ফিরে দাঁড়ালো সে, তার ছোট-ছোট চোখ দিয়ে আমাদের লক্ষ্য করতে লাগল। বাচ্চাটা তখনো সেইভাবে স্তনপান করে চলেছে। শৈলশিরা থেকে লোকজনের সাড়া ভেসে আসছে, বোঝা গেল তাতে সে ঘাবড়ে গেছে একটু। তৈরি হয়ে নিল সে,—হয় তাড়া করবে, নয় তো পালাবে। অত্যন্ত নিষ্ঠুর ব্যাপার, কিন্তু আর উপায় নেই। করলাম গুলি। সঙ্গে-সঙ্গে সে থপ্ করে পড়ে গেল, যন্ত্রণার কোন চিহ্নই প্রকাশ করল না। বাচ্চাটা দাঁড়িয়ে রইল তার পাশে। গুলির আওয়াজ শুনে লোকজনরা মুহূর্তকাল থেমে দাঁড়ালো, তারপর সবাই একসঙ্গে চেঁচাতে চেঁচাতে পাহাড়ের গা বেয়ে দৌড়ে নামতে লাগল।

ওদের আসতে দেখে বাচ্চাটা তার মাকে গুঁতোতে লাগল যাতে সে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে। যখন দেখল তাতে কাজ হচ্ছে না, পরম সাহসের সঙ্গে সে তখন ওদের সম্মুখীন হল। বাচ্চা গণ্ডারটার বীরত্বের প্রশংসা করতেই হবে। যখন সে দেখল সবাই মরা গণ্ডারটাকে ঘিরে ফেলেছে, বারবার সে তাদের তেড়ে গেল—যদি সে তার মাকে রক্ষা করতে পারে। বাচ্চাটা বড-সড নয়; তার সামনের খড়্গটা সবেমাত্র গজাতে শুরু করেছে, আর একটা গোলাকার চিহ্ন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যেখানে দ্বিতীয় খড়্গটা একদিন গজাবে।

বাচ্চাটার আঘাত করবার ক্ষমতা না থাকলেও সবাই তার ভয়ে পালাতে শুরু করল। স্কাউটদের সাহায্যে আমি তাকে ধরতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু সে এক মহা সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো। শেষ পর্যন্ত আমার মনে হল হয়ত ধরতেই পারব না ওকে, এমন সময় মিঃ সভেজের সেই দু-জন লোক এগিয়ে এল।

যেভাবে ওরা বাচ্চাটাকে ধরল, ব্যবস্থাটা কার্যকরী হলেও অত্যন্ত করুণ সে দৃশ্য। একজন গুঁড়ি মেরে মরা গণ্ডারটার কাছে গেল, তারপর তার স্তন দুলিয়ে বাচ্চাটাকে লোভ দেখাতে লাগল। বাচ্চাটাও হাঁপিয়ে উঠেছিল, তার খিদে পেয়েছিল। এ লোভ সে সামলাতে পারল না, এগিয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে লোকটা তার বাঁ কানটা চেপে ধরল আর তৎক্ষণাৎ তার সঙ্গীও লাফিয়ে উঠে চেপে ধরল তার ডান কানটা। প্রাণপণে চেঁচাতে লাগল বাচ্চাটা, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তাকে বেঁধে ফেলা হল।

চটের থলি কেটে তা দিয়ে বাচ্চাটাকে দুটো লম্বা কাঠের সঙ্গে বেঁধে নেওয়া হল। বয়ে নিয়ে যেতে দরকার হল ছ-জন মানুষ। তাঁবুতে ফিরে তাকে একটা বড় গাছের ছায়ায় বেঁধে রাখা হল, আর একটা বোতল থেকে ছাগলের দুধ খাওয়ানোর ব্যবস্থা হল। প্রথম দু-দিন ওর মেজাজ অত্যন্ত রুক্ষ হয়ে রইল,—যে কাছে আসে তাকেই তাড়া করে। পূর্ণবয়স্ক গণ্ডারের মত শব্দ করত বাচ্চাটা,—নিশ্বাস ছাড়ার সময় তার উপরের ঠোঁটটা কেঁপে উঠত। তবে, তৃতীয় দিনের দিন থেকে সে ক্রমেই শান্ত হয়ে এল। ছোট বাছুরের মত সে আমাদের হাত চুষত, আর মাঝে মাঝে খেলাচ্ছলে এসে গুঁতিয়ে দিত,—বাচ্চা কুকুর যেমন খেলাচ্ছলে ছদ্ম গম্ভীর গর্জন করে তেমনি। আমি নিজেও মাঝে মাঝে তাকে খাইয়ে দিতাম, তাই কিছুদিনের মধ্যেই তাকে যারা ধরেছিল তাদের মত আমাকেও চিনে ফেলল। সব সময়ে সে আমাদের পায়ে পায়ে ঘুরত, কিন্তু অচেনা কাউকে দেখলেই সে সঙ্গে সঙ্গে গুঁতোবার ভঙ্গিতে মাথা নিচু ক্রুদ্ধ শব্দ করতে করতে তাকে তেড়ে যেত।

বেশ কয়েকটা সপ্তাহ আমাদের জঙ্গলের মধ্যে কাটল, পঁচাত্তরটা গণ্ডার মারা হল সবশুদ্ধ। ঠিক করলাম গণ্ডারগুলোর চামড়া আর খড়্গ নিয়ে মাচাকোস-এ ফিরে যাব। একদল স্বল্পবেশা স্থানীয় তরুণী ওগুলো লরিতে তোলার জন্যে বয়ে নিয়ে চলল।

মাচাকোস-এ এসে সমস্ত চামড়া আর খড়্গ নামিয়ে নেওয়া হল। এই যে মাত্র কয়েক দিনের জন্যেও নিরবচ্ছিন্ন শিকারের থেকে বিশ্রাম মিলল, সত্যি

বলতে কি, খুশিই হলাম তাতে; কারণ ঘুমের ঘোরের রুদ্ধশ্বাস দুঃস্বপ্নগুলো আবার আমার ফিরে আসতে শুরু করেছিল, সারা রাত একটুও ঘুমোতে পারছিলাম না। এইসব স্বপ্নে সেই সমস্ত জন্তুই আমার সম্মুখীন হচ্ছিল যাদের আমি আগের দিন মেরেছিলাম, তফাতের মধ্যে শুধু এই যে, স্বপ্নে সেই জন্তুদেরই জয় হচ্ছিল। স্বপ্ন দেখতাম হয় আমার বন্দুকে গুলি আটকে গেছে কিংবা বন্দুকের দুটো গুলিই ব্যর্থ হয়েছে, আর জন্তুটা একেবারে আমার উপর এসে পড়েছে। ঘর্মাক্ত দেহে আমার ঘুম ভেঙে যেত এবং পাছে আবার এইসব দুঃস্বপ্ন আমায় ভর করে সেই ভয়ে আর ঘুমোতে সাহস হত না।

আমার স্কাউটদেব কিন্তু এসব দুঃস্বপ্নের বালাই ছিল না। সারাদিন হাজার বার নিতান্ত ভাগ্যক্রমে বেঁচে গেলেও রাত্রে তারা ঘুমোতো একেবারে মড়ার মত।

এর পরের কয়েক সপ্তাহে অবশ্য আমার লোকজনদের স্নায়ুব শক্তিপরীক্ষার অনেক সুযোগ মিলল, কারণ এবার আমরা যে শিকারের সম্মুখীন হতে চলেছি, তার তুলনায় এ শিকার কিছুই নয় বলতে গেলে। চামড়া আর খড়্গ লরি থেকে নামাতে না নামাতেই আবার চারিদিক থেকে সন্ত্রস্ত মানুষের আর্ত আহ্বান আসতে লাগল। শ্বেতাঙ্গরা তাদের রক্ষা করবে এই ভরসায় তারা ক্রমেই তাদের কৃষিক্ষেত্রের সম্প্রসারণ করে চলেছে এবং এর ফলে গণ্ডাররাও তাদের উপর হামলা চালাচ্ছে। তবে, গণ্ডাবরা যেন অত্যন্ত বেশি খেপে উঠেছে, এতটা খেপে উঠার কারণ ঠিক বুঝতে পারলাম না।

খবর পাওয়ামাত্র আমি আমার স্কাউটদের নিয়ে জঙ্গলে প্রবেশ করলাম। মাচোকা সর্দার আমায় তার ক্ষতির পরিমাণ দেখিয়ে দিল। যা দেখলাম, তাতে তার উদ্বেগের যথেষ্ট কারণ আছে মনে হল। অনেক মানুষকেও নাকি গণ্ডাররা তাড়া করেছে, তবে, সৌভাগ্যের বিষয়, কাউকে মারতে পারে নি।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছিল, তবুও আমি স্কাউটদের নিয়ে জঙ্গল ভেঙে এগিয়ে চললাম। অনেকখানি অগ্রসর হয়েও যখন কোন গণ্ডারের সাড়া মিলল না, প্রায় হাল ছেড়ে ফিরে আসার মত অবস্থা, এমন সময় একজন স্কাউট একটা তীক্ষ্ণ চিৎকারের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। চিৎকারটা আসছিল আমাদের ডান দিক থেকে। সেই শব্দ অনুসরণ করে এগোতে এগোতে এক জায়গায় দুটো গণ্ডার আমাদের চোখে পড়ল,—একটা পুরুষ আর একটা স্ত্রী-

গণ্ডার। কোন কারণে খেপে গিয়ে স্ত্রী-গণ্ডার পুরুষ-গণ্ডারটাকে সজোরে গোঁত্তা মারছে, কিন্তু পুরুষ-গণ্ডারটা কিছুই বলছে না।

এদের এইসব লক্ষ্য করছি, এমন সময় একজন স্কাউট দেখিয়ে দিল, আর-একটা পুরুষ-গণ্ডার জঙ্গল ভেঙে ওদের দিকে এগিয়ে আসছে। কাছে এসে সে স্ত্রী-গণ্ডারটাকে দেখিয়ে দেখিয়ে প্রচুর লম্ফঝম্প করে বীরত্ব জাহির করতে লাগল।

প্রথম পুরুষ-গণ্ডারটা আমাদের দেখতে পেয়েই হোক বা আমাদের গন্ধ পেয়েই হোক হঠাৎ সবেগে আমাদের আক্রমণ করল। সঙ্গে সঙ্গে আমি গুলি করলাম এবং গুলির শব্দে অপর দুটো গণ্ডারও যেন পাগলের মত হয়ে গেল, ক্রুদ্ধ চিৎকার করতে করতে তারা গোল হয়ে ঘুরতে শুরু করল। তারপর আমাদের দেখতে পেয়ে তারাও আমাদের তাড়া করে এল।

কোন রকমে রাইফেলে গুলি ভরে নেবার সময় পেয়েছিলাম। আগে এল স্ত্রী-গণ্ডারটা, গুলির সঙ্গে সঙ্গে সে প্রচুর লাল ধুলো উড়িয়ে মহাবেগে পড়ে গেল। বাকি গণ্ডারটা ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এ অঞ্চলে গণ্ডারের এই অস্বাভাবিক হিংস্রতার কারণ বোঝা গেল। এখন তাদের মিলনের সময়; এই সময়ে স্বভাবতই তারা নার্ভাস আর মারমুখো হয়ে ওঠে।

স্কাউট তিনজনকে বন্দুকের ব্যবহার শেখাতে গিয়ে আমায় অনেক খাটতে হচ্ছিল। গণ্ডার দেখলেই তার শরীরের যেখানে হোক গুলি মারা,—এ কদভ্যাস তারা এতদিনেও কাটিয়ে উঠতে পারল না। একদিন আমি আমার ছোট্ট স্কাউট আর গাছে চড়ায় ওস্তাদ স্কাউটকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছি। ওদের বলে দিলাম, যা কিছু গুলি করার আজ তা তারাই করবে, আমি শুধু তাদের সঙ্গে থেকে লক্ষ্য করব। শেষবারের মত ওদের বলে দিলাম, কিছুতেই যেন ওরা গুলি না করে যতক্ষণ না লক্ষ্য সম্বন্ধে একেবারে নিশ্চয় হতে পারছে।

জঙ্গল ভেঙে অগ্রসর হতে হতে এক জায়গায় গণ্ডারের চিহ্ন চোখে পড়ল। তখন গাছে চড়ায় ওস্তাদ স্কাউটটা একটা বড় আকাশিয়া গাছে উঠে পাখির মত স্বরে ইঙ্গিত করে জানালো, সে চারটে গণ্ডার দেখতে পাচ্ছে। সে নেমে এলে আমরা এগিয়ে চললাম সেদিকে, স্কাউট দু-জন চলল আগে আগে। একজনের হাতে একটা দোনলা জেফ্রি, আর অপরজনের হাতে একটা ম্যাগাজিন রাইফেল। ওদের এই বলে সাবধান করে দিলাম যে বিপদের

সম্ভাবনা এলে যেন অতি অবশ্যই ওরা আমায় গুলি করার সুযোগ দেয়। কিন্তু তার উত্তরে তারা যথেষ্ট জোরের সঙ্গেই বললে যে তেমন কোন বিপদের সম্ভাবনা হবে না, যেকোন পরিস্থিতির জন্যেই তারা তৈরি।

জঙ্গল বিশেষ ঘন না হওয়ায় আমাদের অগ্রগতিতে কোন অসুবিধে হল না। স্কাউটরা কান পেতে রইল, যদি তারা গণ্ডারের খাওয়ার শব্দ শুনতে পায়। আমি জানি ওদের ঘ্রাণশক্তি আমার থেকে অনেক বেশি তীক্ষ্ণ, সুতরাং শিকারের এই ব্যাপারটা আমি ওদের উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলাম। এগিয়ে চললাম তাড়াতাড়ি, কারণ আমি নিশ্চয় জানি যে কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা গণ্ডারের কাছাকাছি গিয়ে পৌছব।

হঠাৎ কতগুলো পাখি আমার পেছন থেকে এসে বড়-বড় বৃত্ত করে আমাদের চারিদিকে চেঁচাতে চেঁচাতে ঘুরতে শুরু করল। এই পাখিরা গণ্ডারের গা থেকে পোকা বেছে খায়। ছোট্ট স্কাউট এই দেখে জিভ দিয়ে একটা বিরক্তিকর শব্দ করল, যার অর্থ, 'শয়তানের দল!' পরমুহূর্তেই সামনে থেকে গণ্ডারের ডাক পরিষ্কার ভেসে এল—সে ডাক শুনলে রক্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে, হাতের রাইফেলকে মনে হয় একটা খেলনা ছাড়া কিছু নয়। গুঁড়ি মেরে স্কাউটরা এগিয়ে চলল, আর আমি চললাম আস্তে আস্তে তাদের পিছু পিছু, যাতে ওরা ওদের ক্ষমতা প্রকাশ করার সুযোগ পায়।

একটা ঝোপের মধ্যে খেয়ে চলেছে গণ্ডাররা। কিন্তু কিছুতেই ওদের ভাল করে দেখা সম্ভব হল না—বুঝতে পারলাম না কোন্‌টা মাথা আর কোন্‌টা পেছন দিক। এবার একটা গণ্ডার একটু সরে এল। দেখলাম ঝোপের মধ্যে যে পাঁচ গজ চওড়া ফাঁকা জায়গাটা ছিল সেটা সে অতিক্রম করে চলেছে। এ দৃশ্য বড় স্কাউটটারও চোখে পড়ল। সে তার বন্দুকের সেফ্‌টি ক্যাচটা সরাতেই যে শব্দ হল তাতেই গণ্ডারদুটো পাক খেয়ে আমাদের দিকে ফিরল। পাখিগুলো আমাদের ঘিরে তেমনি ঘুরে চলেছে, আর গণ্ডাররা স্থির দাঁড়িয়ে আছে। এইভাবে কাটল কিছুক্ষণ।

তারপর আবার গণ্ডারটা চলতে শুরু করল। সে ফাঁকা জায়গাটা পার হয়ে যেতে লক্ষ্য করলাম, সে পুরুষ-গণ্ডার। স্কাউটটা রাইফেল তুলে ভাল করে লক্ষ্য করল, কিন্তু গুলি আর করে না। আস্তে আস্তে গণ্ডারটা ফাঁকা জায়গাটুকু পার হয়ে গেল, ক্রমে তার ঘাড় আর কাঁধ আড়ালে পড়ে গেল। গুলি করতে ছেলেটা বড় বেশি দেরি করে ফেলেছে। অন্য সময়ে হলে আমি

তাকে বাধা দিয়ে নিজে গুলি করতাম, কিন্তু এখন আমার তা উদ্দেশ্য নয়,—আমি দেখতে চাই ও কী করে। হঠাৎ গুলি করল সে, আর সঙ্গে সঙ্গে গণ্ডারটা মুখ ফিরিয়ে তেড়ে এল, আর তার পিছু পিছু দ্বিতীয় গণ্ডারটাও ছুটে এল—এটা একটা স্ত্রী-গণ্ডার। স্কাউটটা তখন তার দ্বিতীয় নলটাও খালি করল, কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হল সে। ছোট্ট স্কাউটটা এতক্ষণ তার সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিল, এবার সে তার ম্যাগাজিন রাইফেলটা তুলে নিল, তারপর তাড়াতাড়ি লক্ষ্য স্থির করে ঘোড়া টিপে দিল। কিন্তু কিছুই হল না। এর পরেও সে কয়েকবার চেষ্টা করে দেখল, কিন্তু তবুও কোনই ফল হল না।

ইতিমধ্যে গণ্ডারদুটো আমাদের কুড়ি গজের মধ্যে এসে পড়েছে। ছেলেটা তার রাইফেলটা খুলে আমায় দেখিয়ে দিলে যে গুলিটা বেরিয়ে যায় নি এবং এ জন্যে তাকে দোষ দেওয়া যায় না।

আর কয়েক মুহূর্ত দেরি হলেই গণ্ডারদুটো দু জন স্কাউটকে গুঁতিয়ে দিত। সৌভাগ্যবশত বড় স্কাউটটা তাড়াতাড়ি উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল, যাতে আমি তার উপর দিয়ে গুলি করতে পারি। যে গুলি আমি করলাম, জীবনে কখনো এত ভাল লক্ষ্যভেদ করেছি কি না সন্দেহ। দু-নলের দুই গুলিতে গণ্ডারদুটো একটার উপরে একটা পড়ে গেল।

ছোট্ট স্কাউটের রাইফেলটা পরীক্ষা করে দেখলাম, কার্তুজের কৌটোটায় কোন দাগই লাগেনি। গুলি ভরবার সময় সে রাইফেলের বল্টুটা সরিয়ে দেয়নি, যেজন্যে এই কাণ্ড। ভুলটা বুঝতে পেরে ছেলেটি খুব আপশোস করতে লাগল। প্রচুর সাহস ছিল ছেলেটির, স্কাউট হিসেবেও সে ছিল চমৎকার; দোষের মধ্যে কেবল এই যে, সে তার গুণপনা দেখাতে একটু বেশি মাত্রায় ব্যস্ত ছিল।

এদিকে বর্ষা শুরু হওয়ায় আমাদের কয়েক সপ্তাহ ওখানেই থেকে যেতে হল। ডালপাতায় ভরা একটা ডুমুর-কুঞ্জের নিচে খাটানো হল তাঁবু। ঘাস এখানে যেমন টাটকা তেমনি সবুজ, আর পাশ দিয়েই একটা পরিষ্কার ঝরনা বয়ে চলেছে,—তাঁবুর পক্ষে যার প্রয়োজনীয়তা বলে শেষ করা যায় না। মাটিতে পালক দেখে বোঝা গেল যে গিনি ফাউল আর ফ্র্যাঙ্কোলিনও কাছেপিঠেই মিলবে। এ দৃশ্যে আমার মন উৎফুল্ল হয়ে উঠল, কারণ বুঝলাম, এতদিনে একটু খাবারে বৈচিত্র্য আসবে। সঙ্গের খাবার কমে আসায় আমি মুলুম্বের সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করছিলাম, বাড়িতে গৃহকর্ত্রী রাঁধুনির সঙ্গে

যেমন আলোচনা করে থাকে। তবে কিনা, এই কথোপকথন যেন একটু বেশিরকম একঘেয়ে হয়ে উঠেছিল :

আমি। আজ রাত্রে কী স্যুপ হবে, মুলুম্বে ?

মুলুম্বে। গণ্ডারের স্যুপ, বাওয়ানা।

আমি। কী মাংস ?

মুলুম্বে। গণ্ডারের, বাওয়ানা।

আমি। কাল কী মাংস হবে ?

মুলুম্বে। গণ্ডারের হৃৎপিণ্ড, বাওয়ানা।

তার শরীরের যে মাংসই খাই না কেন, আমার মনে ভাসে সেই জন্তুর কথা যে তার নিজের ডেরা নিজেব অধিকার রক্ষা করতে গিয়ে মারা পড়েছে, এবং এর ফলে যে আমাব হজমের ব্যাঘাত ঘটে তাতে সন্দেহ নেই।

তাঁবুর মধ্যে শুয়ে বাইরে বৃষ্টির শব্দ শুনতে বড ভাল লাগত। মনে পড়ত স্কটল্যাণ্ডে থাকতে কিভাবে সলওয়ে ফার্থের ঝড়ের শব্দ আমাদের বাড়ির ছাদের উপর শোনা যেত।

বর্ষাকাল চলে যেতে দেখলাম, সমস্ত অঞ্চলটার চেহারাই পালটে গেছে এবং এই পরিবর্তন মন্দের দিকে। এত পোকামাকড়ের আবির্ভাব হয়েছে যে মনে হয় যেন বৃষ্টিবিন্দুগুলোই এক-একটা পোকায় পরিণত হয়েছে। বড়-বড় এক-একটা পতঙ্গ সাবা রাত আলোব লণ্ঠন ঘিরে ফুর-ফুর করে উড়ে চলেছে, কখনো বা ধপাস করে আমার খাবারে, স্যুপে পড়ছে। বিছে, শতপদী আর বড়-বড় রোমশ মাকড়সা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, তাদের গর্তে জল ঢোকায় বাধ্য হয়ে তাদের বেরিয়ে আসতে হয়েছে।

বর্ষার ফলে শিকারও অনেক দুরূহ হয়ে উঠেছে। ছোট-ছোট ঝোপে ঝাড়ে জীবনের সাড়া জেগেছে, তাদের সবুজ পাতার ফাঁক দিয়ে দৃষ্টি চলে না। বিরাট বিরাট কাঁটা আর বিছুটি জাতের গাছ গজিয়ে উঠেছে। তাদের কোন-কোনটা আবার এক ইঞ্চিরও বেশি পুরু,—হাতি পর্যন্ত সেই গাছকে এড়িয়ে চলে এবং তাদের মধ্যে গড়াগড়ির ফলে ঘোড়া মারা পড়েছে এমন নিদর্শন তো আছেই। শিকারীর দিক থেকে বর্ষার ফলে একটা যা সুবিধে হয়েছে সে হল এই যে এতে করে মাটিটা অনেকটা নরম হয়ে উঠেছে, যার ফলে নিঃশব্দে জন্তুর পদাঙ্ক অনুসরণ করা সম্ভব হয়েছে।

এইসব কারণে কাজ মন্থর গতিতে চলল। ইতিমধ্যে আমরা ১৩৭টা গণ্ডার

নিধন করেছি। যতই গণ্ডার মরছে, ততই বাকি গণ্ডাররা সতর্ক হয়ে উঠছে। স্থানীয় বাসিন্দারা আমাদের অনেক কাজে এল,—নিজেদের উৎসাহেই তারা গণ্ডারের সন্ধানে যেতে লাগল আর যখনই কোথাও কোন গণ্ডারের সন্ধান মিলল, তাদের পাঠানো লোক দৌড়ে এসে তাবুতে খবর দিতে লাগল।

যখন দেখলাম এ অঞ্চলের গণ্ডার একরকম নিঃশেষিত হয়েছে, নিকটবর্তী গ্রামের সর্দার ন্দীভাকে বললাম যে এবার আমি মাকাচোস-এ ফিরে যাব। এ কথায় সে অত্যন্ত বিপন্ন বোধ করল,—চারিদিকে লোক পাঠালো, যদি কোথাও কোন গণ্ডারের সন্ধান মেলে।

যেদিন আমাদের ওখান থেকে চলে আসার কথা তার দিন দুই আগে দু-জন স্থানীয় বাসিন্দা হাপাতে হাপাতে হন্তদন্ত হয়ে এসে খবর দিল যে কয়েক মাইল দূরে এক জায়গায় তারা তিনটে গণ্ডারের সন্ধান পেয়েছে। একজন লোককে তারা বুদ্ধি করে কাছের একটা গাছে চড়িয়ে রেখে এসেছে যাতে সে গণ্ডারদের চলাফেরার উপর নজর রাখতে পারে। একজন স্কাউটকে সঙ্গে নিয়ে আমি তৎক্ষণাৎ তাদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। লোকটি তখনও তেমনি গাছের উপরেই ছিল, সে খবর দিল যে গণ্ডারগুলো জঙ্গলে ঢুকেছে, তবে, একটা বড় ক্যাকটাস গাছ সে নিশানা করে রেখেছে, সেখান থেকে তাদের চিহ্ন ধরে এগোনো যাবে। ঠিকই বলেছিল সে। সহজেই আমরা গণ্ডারদের পায়ের দাগ ধরে অগ্রসর হতে লাগলাম।

যেসব কাঁটা-ঝোপ ভেঙে আমাদের অগ্রসর হতে হচ্ছিল অতি বিশ্রী সেগুলো। ভয়ঙ্কর ওয়েট-এ-বিট কাঁটাও তাদের মধ্যে ছিল,—জোড়া জোড়া তার কাঁটা, এক ধরনের বঁড়শির মত দেখতে কতকটা। ছোট-ছোট আকাশিয়া গাছও অজস্র ছিল, তার কাঁটাগুলো পরস্পরের দিকে পেছন করে বিপরীত দিকে মুখ করে বসানো। ফলে, যতই তাদের এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা যাক না কেন, কোন-না-কোন দিক থেকে সে কাঁটা ঠিক জামাকাপড়ে আটকে যাবে। স্কাউটটা আমার পিছু পিছু আসছিল, তার কাজ হল আমার পোশাক থেকে কাঁটা খুলে দেওয়া। ক্রমাগত ঘষা লেগে লেগে আমার দু-কান জ্বালা করছিল। কিছুক্ষণ পরে আমরা অত্যন্ত নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে পড়লাম, তার ভিতর দিয়ে গণ্ডারের চলাফেরার ফলে একটা সুড়ঙ্গের মত তৈরি হয়েছে। শরীরটা অনেকখানি নুইয়ে কোনরকমে আমরা এই সুড়ঙ্গ-পথ ধরে অগ্রসর হলাম।

একজনের পেছনে একজন, এভাবে আমাদের এগোতে হল। খানিকটা গিয়ে দেখলাম, সামনে মেটে রঙের কি দুটো পদার্থ রয়েছে। পত্রবহুল জঙ্গলের আলো-আঁধারিতে অনেক চেষ্টা করেও কিছুতেই এর চেয়ে ভাল করে দেখা সম্ভব হল না।

এমন সময় স্কাউটটা বাঁ দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করল,—এ দুটো ছাড়াও আরো একটা গণ্ডার তার চোখে পড়েছে। আমি যেখানে ছিলাম সেখান থেকে এটা দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল না, তাই আমি সেই সামনের দুটোর দিকেই মনোনিবেশ করলাম। ঠিক সামনেই একটা ফাঁকা জায়গার মত রয়েছে, সেখানে গেলে আমরা সিধে হয়ে দাঁড়াতে পারব। গেলাম সেখানে। স্বস্তি পেলাম খানিকটা সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে। গণ্ডারদুটো থেকে চোখ না ফিরিয়ে স্কাউটটাকে ইঙ্গিতে বললাম তৃতীয় গণ্ডারটার দিকে লক্ষ্য রাখতে। কিন্তু এতে যে অত্যন্ত সামান্য নড়াচড়া হল তার ফলেই সামনের গণ্ডারদুটো সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল।

স্ত্রী-গণ্ডারটাকে লক্ষ্য করে আমি গুলি করলাম। সঙ্গে সঙ্গে সে সশব্দে হাঁটুতে ভর করে পড়ে গেল, আর পুরুষ-গণ্ডারটা সবেগে গোল হয়ে ঘুরে গেল। এই সুযোগে আমি বন্দুকে গুলি ভরে নিলাম। পরক্ষণেই তাড়া করে এল সে। সঙ্গে সঙ্গে আমার ডান নলের গুলি তার বুকে গিয়ে লাগল, কিন্তু সে আঘাত উপেক্ষা করে সে মাথা নিচু করে আমায় তেড়ে এল। হঠাৎ বাঁ দিকে ঝোপ ভাঙার শব্দ শুনতে পেলাম, বুঝলাম তৃতীয় গণ্ডারটা ওদিক থেকে আমাদের আসছে।

এদিকে আমি এগিয়ে-আসা পুরুষ-গণ্ডারটার উপর থেকে চোখ ফিরিয়ে নিতে পারছি না। আবার গুলি করলাম। গুলিটা গিয়ে লাগল তার কানের নিচে, সঙ্গে সঙ্গে সে পড়ে গেল। ঠিক সেই মুহূর্তেই ডান দিকে অপর গণ্ডারটার সাড়া পেলাম। ঝোপ-জঙ্গল ভেঙে সে আমার পাশ দিয়ে চলে গেল,—দেখলাম আমার স্কাউট তার খড়্গো ঝুলে রয়েছে। তাড়াতাড়ি গুলি ভরে নিলাম। আমি যেখানে ছিলাম সেখান থেকে ছেলেটাকে বাঁচিয়ে মোক্ষম আঘাত অসম্ভব, তাই মুহূর্তমাত্র অপেক্ষা করে গণ্ডারটার কাঁধ লক্ষ্য করে গুলি করলাম। সঙ্গে সঙ্গে গণ্ডারটা পড়ে গেল, আর ঘোড়া লাফাতে গিয়ে হঠাৎ থেমে পড়লে তার সওয়ার যেমন পিঠের উপর থেকে ঠিকরে পড়ে তেমনিভাবে স্কাউটটা ঠিকরে পড়ল তার খড়্গোর উপর থেকে। যেভাবে সে নিশ্চল

পড়ে রইল, তা দেখে আমার মনে হল, হায় হায়, ওকেও হত্যা করলাম; কারণ আমার তখন স্থির বিশ্বাস যে আমার গুলি ছেলেটার দেহ ভেদ করে তারপর গণ্ডারের দেহে প্রবেশ করেছে। কাছে গিয়ে যে ছেলেটিকে পরীক্ষা করে দেখব সে সাহসও আমার হল না, সেখানেই দাঁড়িয়ে থেকে বন্দুক বাগিয়ে তাকিয়ে রইলাম সেদিকে।

হঠাৎ দেখলাম ছেলেটি নড়ে উঠল। এতে আমার যে আনন্দ হল, এত আনন্দ আমি আর কিছুতে পেয়েছি কি না সন্দেহ। এক দৌড়ে তার কাছে গেলাম। প্রথমেই পরীক্ষা করে দেখলাম তার শরীরে গুলির আঘাত লেগেছে কি না। না, লাগেনি। আমার গুলি হয়ত আর এক ইঞ্চি হলেই তার গায়ে বিঁধত। গণ্ডারের খড়্গও তার শরীরে প্রবেশ করেনি। ওকে ছিটকে ফেলবার জন্যে গণ্ডারটা মাথা নিচু করতেই ছেলেটি কোন রকমে তার সামনের খড়্গটা ধরে ফেলে শরীরটাকে তার আঘাত থেকে বাঁচিয়ে রেখেছিল, এই অবস্থাতেই গণ্ডারটা তাকে নিয়ে সবেগে ধেয়ে চলে। নির্ঘাত মৃত্যুর কবল থেকে সামান্যর জন্যে বেঁচে যাওয়ার যে কটি নজির আমার অভিজ্ঞতায় আছে, তাদের মধ্যে এটি অন্যতম।

এর পর দেখলাম স্কাউটটা তার বন্ধুদের সঙ্গে খুব হৈ হল্লা আর হাসি গল্প করছে, ব্যাপারটা যেন তার মনে কোনই রেখাপাত করেনি।

নভেম্বর নাগাদ আমার কাজ সমাধা হল। যে যে অঞ্চল থেকে গণ্ডারের উপদ্রব বন্ধ করার হুকুম হয়েছিল তা পালন করা হয়েছে। সবশুদ্ধ ১৬৩টা গণ্ডার মেরেছি। এতগুলো গণ্ডার মারা হয়ত অবিশ্বাস্য বলে মনে হবে, কিন্তু এই সমস্ত হিসেবই নাইরোবির শিকার দপ্তরের কাগজপত্রে আছে, কারণ সমস্তগুলো খড়্গ আর চামড়াই গভর্মেণ্টে জমা দেওয়া হয়েছিল। এমন কিছু আমি বলছি না গভর্মেণ্টের কাগজপত্রে যার প্রমাণ না মিলবে।

এবার আমি দল-বল নিয়ে মাচাকোস এর দিকে যাত্রা করলাম। এখন আর ভাবনা নেই, গণ্ডারের সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। একজনের পেছনে একজন করে আমরা একটা উঁচু জায়গায় উঠলাম। হঠাৎ থেমে দাঁড়ালাম অবাক হয়ে, আর স্কাউটরাও দেখলাম আমার পিছু পিছু আসতে আসতে রুদ্ধশ্বাস বিস্ময়ে থমকে দাঁড়িয়েছে।

তিন মাস আগে এই অঞ্চল দিয়েই আমরা গিয়েছিলাম, সমস্ত অঞ্চলটাই তখন ছিল ঘনসন্নিবদ্ধ কাঁটাঝোপে ছাওয়া। কিন্তু আজ সে অঞ্চল

পালিশ-করা টেবিলের মত ঝকঝকে। মিঃ বেভার্লির কুলির দল আমাদের পিছু পিছু এসে সমস্ত জঙ্গল সাফ করে ফেলেছে। কিছুকাল আগেও যে অঞ্চল ছিল ঈশ্বরের নিজের হাতে গড়া খাঁটি আফ্রিকার এক ফালি, আজ তা খামারে পরিণত হয়েছে। একটা গাছ বা একটা ঝোপেরও অস্তিত্ব কোথাও নেই। যে সমস্ত অঞ্চলে গণ্ডারের চলাফেরার চিহ্ন চোখে পড়ছিল, জঙ্গল ঘুচে যাওয়ায় তাও ইতিমধ্যেই ঘাসের তলায় অন্তর্হিত হতে চলেছে। যেসব পাগলাটে জন্তু শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এখানে ঘুরে বেড়াতো আজ আর তাদের কোন অস্তিত্ব নেই। বিস্তীর্ণ সমতল ভূমির উপর এখানে ওখানে তাদের সাদা সাদা হাড়ের রাশি জমা হয়ে আছে। কোথাও কোথাও বা বেশ খানিকটা অঞ্চল কালো হয়ে রয়েছে, তা থেকে বোঝা যায় কোন্ কোন্ জায়গায় জঙ্গল সাফ করার সময় গাছপালা জড়ো করে আগুনে পোড়ানো হয়েছিল।

স্কাউটদের সঙ্গে আমি অতি সহজেই এ অঞ্চল অতিক্রম করে গেলাম। যেন স্বপ্নের ঘোরে চলেছি। অথচ আমরা গুঁড়ি মেরে অনেক কষ্টে এ অঞ্চল অতিক্রম করে চলেছি,—মনে হল এ যেন মাত্র কালকের ঘটনা! এখানে ওখানে স্থানীয় বাসিন্দাদের কুটির দেখা দিচ্ছে। মেয়েরা চাষের জন্যে লাঙল দিচ্ছে। জঙ্গলের মধ্যে অন্তত কয়েক মাইল সভ্যতার বিস্তার চলেছে। গণ্ডারের কবলে কাঠকুড়োনি মেয়ের প্রাণনাশের কাহিনী আর মাত্র কয়েক পুরুষ পরেই রূপকথায় পরিণত হবে।

এ ছাড়াও আমি আরও কয়েকবার গণ্ডার শিকার করেছি। স্থানীয় বাসিন্দাদের যত জমির প্রয়োজন হচ্ছে ততই আমায় তাদের সাহায্যে যেতে হয়েছে। যখন এ কাহিনী লিখছি ততদিন পর্যন্ত এক হাজারেরও বেশি গণ্ডার শিকার করেছি। ক্রমবর্ধমান সমাজের তাগিদে মাত্র কয়েক একর জমির জন্যে এই যে চমৎকার জীবদের হত্যা করা, এর কি কোন যুক্তি আছে? জানি না। কিন্তু এটুকু জানি যে এমন দিন আসবে, যখন পরিষ্কার করার মত আর কোন ভূখণ্ড থাকবে না। কী হবে তখন? যাই হোক, আপাতত যে মানুষ আর পশুর সঙ্ঘর্ষের ফলে এক সমস্যা ও দুর্ভাবনা দেখা দিয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই।

মাকিন্দু জেলার কোন-কোন অঞ্চলে ৎসেৎসে (tsetse) মাছির ভয়ানক উপদ্রব. কিন্তু হিসেব করে দেখা গেছে যে তা নিবারণ করতে এই লাভায় ছাওয়া অঞ্চলে জঙ্গল পরিষ্কার করার যা খরচ তাতে তা পোষায় না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে যতদিন না বিজ্ঞানীরা গোজাতির মধ্যে এই মাছির কামড়ের কোন প্রতিষেধক কিছু আনতে পারছেন, ততদিন এ অঞ্চল গণ্ডারের পক্ষে নিরাপদ। একবার আমার এই মাছির কামড় খেতে হয়েছিল, এই অপরাধে আমি এই চমৎকার মাছি জাতকে যেসব গালাগালি করেছিলাম সেজন্যে আমি অত্যন্ত অনুতপ্ত।

এই জেলার শিকার পরিদর্শনের ভার তখন আমার উপরে।. আমার কাজ হল শ্বেতাঙ্গ ও স্থানীয় উভয় প্রকারের চোরা শিকারীর হাত থেকে এখানকার গণ্ডারদের রক্ষা করা। গণ্ডার শিকার করতে করতে এই লড়িয়ে জন্তুর প্রতি আমার প্রচুর প্রীতির সঞ্চার হয়েছিল, খুশি মনেই তাই আমি এ দায়িত্ব গ্রহণ করলাম। অবশ্য এর ফলে আমার পারিবারিক জীবনে অনেক সমস্যার উদ্ভব হল।

হিল্ডা আর আমি যদি মাকিন্দুতে থাকি তাহলে ঙং বোডের বাড়িটা বিক্রি করতে হয়। অবশ্য সেটা যে খুব একটা বড় রকমের ক্ষতি তা নয়। ছেলে-মেয়েরা বড় হয়ে উঠছে, বাড়িটা তাই আমাদের পক্ষে বেজায় বড় মনে হচ্ছে এখন। দুই মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে, তারা এখান থেকে চলে গেছে—একজন আছে ইংল্যাণ্ডে, আর অপরটির স্বামী ব্রিটিশ সৈন্যদলে কাজ করে, তার সঙ্গে সে সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াচ্ছে। বড় ছেলে গর্ডনও আর আমাদের কাছে থাকে না। গর্ডন এক সময়ে স্থির করেছিল আমার পদাঙ্ক অনুসরণ করে শিকারীর বৃত্তি গ্রহণ করবে ; শিকারী হিসেবে প্রচুর সম্ভাবনাও তার মধ্যে দেখা দিয়েছিল এবং তাকে নিয়ে আমারও গর্বের অন্ত ছিল না। কিন্তু বিবাহের পরে সংসারের দায়িত্ব তার উপর এসে পড়ায় সে ঠিক করল, এ বৃত্তি গ্রহণ না করে এমন একটা জীবিকা গ্রহণ করবে যার মধ্যে অনিশ্চয়তার ঝুঁকি বিশেষ থাকবে না। তাই সে চাষবাসের বৃত্তিই বেছে নিয়েছে, আমাদের বংশের যুগ-যুগের ধারা বহন করে। যে ভবিতব্য এড়াবার জন্যেই আমার দেশ ছেড়ে আফ্রিকায় আসা, সেই আমারই বড় ছেলে, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ শিকারের দেশে জন্মগ্রহণ করেও স্বেচ্ছায় সে পেশা ত্যাগ করে বংশের পুরোনো ধারায় ফিরে

গেল। যাই হোক, তাতে আমার দুঃখ নেই, এবং এ কাজ যে তার মনের মত হয়েছে এতে বরং আমি খুশিই হয়েছি।

মেজো ছেলে স্থপতির পেশা গ্রহণ করে সারা দেশে যে অসংখ্য ঘরবাড়ি তৈরি হচ্ছে সেই কাজে আত্মনিয়োগ করেছে। কিন্তু ছোট ছেলেদুটি এখনও আছে আমাদের কাছে। হিল্ডার আশঙ্কা হল হয়ত তারা মাকিন্দু পছন্দ করবে না, কারণ যা কিছু তাদের প্রিয় সমস্তই হল নাইরোবিকে কেন্দ্র করে। অনেক যুক্তি পরামর্শের পর স্থির হল, বাড়িটা বিক্রি করে দিয়ে নাইরোবির কাছাকাছি একটা ছোট আধুনিক ধরনের বাড়ি কেনা হবে, ছেলেরা থাকবে সেখানে। আমি থাকব মাকিন্দুতে, আর হিল্ডা থাকবে কখনো মাকিন্দুতে আর কখনো নাইরোবিতে।'

আমার সংসার গুছিয়ে দেবার জন্যে হিল্ডা আমার সঙ্গে মাকিন্দুতে চলল। প্রথম দর্শনেই জায়গাটা আমার পছন্দ হয়ে গেল। ছোট গ্রাম, নাইরোবি-মোম্বাসা রেলপথের ছোট্ট স্টেশন একটা। আগে এখানে রেল-কর্মচারিদের কিছু অফিস ছিল, এবং এখন সেসব অফিস নাইরোবিতে চলে যাওয়ায় রেল-কর্মচারিদের জন্যে যেসব চমৎকার বাড়ি ছিল তার একটা বেছে নিয়ে সেটা ভাড়া করা হল। আবহাওয়া পরিষ্কার থাকলে বাড়ির সামনে থেকে কিলিমান্‌জোরো পর্বতশ্রেণীর তুষার-শৃঙ্গ দেখা যায়,—হঠাৎ দেখলে মনে হয়, যেন সাদা মেঘের মধ্যে ভেসে রয়েছে। রাত্রে শুতে গিয়ে কতদিন হায়েনার হাসির শব্দ আমাদের কানে আসত, কখনো বা ঘুমিয়ে পড়তাম কাছের কোন গ্রাম থেকে ভেসে আসা ঢাকের শব্দ শুনতে শুনতে। বাড়ির মাত্র একশো গজের মধ্যে উটপাখি ঘুরে বেড়াতো; আর যেদিন সকালে জিরাফের লম্বা লম্বা পা ফেলার সাড়া না মিলত সেদিন সকালটাই যেন মাটি হয়ে যেত।

মুলুম্বে আমাদের লোকজনদের কাজের তদারক করত। তার বৌদের মধ্যে তিনজনকে সে সঙ্গে করে এনেছিল, বাকি বৌদের রেখে এসেছিল তার চাষবাসের দেখাশুনোর কাজে। রান্না আর ঘরকন্নার কাজের জন্যেও একজন লোক ছিল। তার উপর ছিল গভর্মেণ্টের দেওয়া স্কাউট, সব মিলে ছোটখাট একটা উপনিবেশ মত গড়ে উঠেছিল।

মাকিন্দুতে আমার ভারি সুখে দিন কাটত। নিজের বাড়ির যা কিছু আরাম তাও আমাদের ছিল, আবার জঙ্গলের মধ্যে বাস করার আনন্দটাও ছিল। সারাটা দিনে একেবারেই ফাঁক মিলত না। সাধারণত ভোরবেলাই

আমাদের ঘুম ভাঙত। একটি ছেলে দরজার বাইরে বসে থাকত, নড়াচড়ার আভাস পেলেই সে ছুটত রান্নাঘরে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে ফিরে এসে দরজায় টোকা মারত, তারপর নিঃশব্দে খালি পায়ে ট্রে-তে করে আমাদের সকলের জন্যে চা নিয়ে হাজির হত। হিল্‌ডার শিক্ষায় সে সব সময়ে পরিষ্কার সাদা পোশাক পরত, আর মাথায় পরত লাল ফেজ। হিল্‌ডা একবার ওদের সকলকে জুতো পরাতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু যখন দেখা গেল যে জঙ্গলের এই অধিবাসীরা জুতো পরে অস্বস্তি বোধ করে আর অত্যন্ত শব্দ করে, সে চেষ্টা থেকে বিরত হল সে।

খাওয়া-দাওয়া আমাদের সর্বদাই খুব ভাল হত। রোজ সকালে স্থানীয় বাসিন্দারা ডিম দিয়ে যেত, আর ভাঁড়ারে কোন সময়েই বেকনের অভাব ঘটত না। রান্নার ব্যাপারে খানিকটা বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হত যখন আগের দিন শিকারে বেরোতাম। আমি স্কট, তাই পরিজ ছিল আমার বিশেষ প্রিয়, আর হিল্‌ডাও সর্বদা লক্ষ্য রাখত যাতে আমার ভাগে পরিজ যথেষ্ট পরিমাণে পড়ে।

প্রাতরাশের পর আমি আমার দিনের প্রথম পাইপটা ধরাই আর লোকজনেরা লরির ঢাকা খুলে তাতে রাইফেল্স আর জলের বোতল রেখে দেয়। তারপর আমিও রিজার্ভের দিকে বেরিয়ে পড়ি, আর সূর্যও উঁকি মারে। রাস্তা বলতে ঠিক যা বোঝায় রিজার্ভে যেতে তেমন কিছু ছিল না, তবে, লরি চালাবার মত মোটামুটি একটা পথ আমি করে নিয়েছিলাম, সেই পথে নরম ধুলোর উপর পায়ের চিহ্ন লক্ষ্য করতে লরি চালাই আর মুলুম্বে আর আমার স্কাউটরা পেছনে বসে চারিদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে করতে চলে।

রিজার্ভের যা আয়তন তাতে সমস্ত অঞ্চলটার উপর লক্ষ্য রাখা সম্ভব নয়। তবে, চিহ্ন দেখে দেখে মোটামুটি আন্দাজ পাওয়া যায় একটা। যেমন, আকাশে শকুনের দল ঘুরছে দেখলে বুঝতে হবে কিছু একটা মারা পড়েছে,—স্বাভাবিক কারণেই হোক বা শ্বেতাঙ্গ কি কৃষ্ণাঙ্গ কোন চোরাই শিকারীর হস্তক্ষেপের ফলেই হোক। সুতরাং অনুসন্ধান প্রয়োজন। কোন অরিক্স, টমি বা জিরাফের পাল চোখে পড়লে আমি লরি থামিয়ে বাইনোকুলার দিয়ে লক্ষ্য করতাম। কোন জন্তু তার দল থেকে পেছিয়ে পড়েছে দেখলে খোঁজ করতাম, কারণ হয়ত কোন কারণে সে অসুস্থ হয়ে পড়েছে,—হয়ত ছোঁয়াচে কোন অসুখ যা তার থেকে দলের অন্যদের মধ্যে সংক্রামিত হতে পারে। যদি দেখতাম তার অবস্থা খারাপ তাহলে তাকে গুলি করে তার রক্ত

নিতাম। এই রক্ত পরে নাইরোবিতে পরীক্ষার জন্যে পাঠানো হত।

ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমার রিজার্ভ পরিদর্শনের সময়েরও পরিবর্তন হত। বর্ষাকালে যখন ঘাস খুব বড হয়ে ওঠে, শিকারের জন্তু ছড়িয়ে পড়ে রিজার্ভের সর্বত্র। এই সময়ে জন্তুদের খবরাখবর খুব ভাল করে রাখা সম্ভব হয় না, কারণ পথ প্রায়ই কাদায় কাদা হয়ে থাকে,—ভারি লরির পক্ষেও তখন সে পথে অগ্রসব হওয়া একবকম অসম্ভব। তবে, এজন্যে আমার বিশেষ দুশ্চিন্তা ছিল না, কারণ আমি জানতাম যে আমাব লবি যেখানে যেতে পারছে না, অন্য কোন লবির পক্ষেও সম্ভব নয় সেখানে যাওবা; সুতবাং শ্বেতাঙ্গ চোরা শিকারী সম্বন্ধে নিশ্চন্ত হওয়া যেত। তা ছাড়া আমি জানি যে স্থানীয় চোরা শিকারীরাও সে অবস্থায় বিশেষ কিছু করতে পারবে না, কারণ এই সময়ে জন্তুরা এমনভাবে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে যে তাদের নাগালের মধ্যে পাওরা অত্যন্ত কঠিন।

বর্ষার শেষে ঘাস যখন শুকোতে শুরু কবে, জন্তুরা তখন্ সেইসব অঞ্চলে চলে যায় ঘাস যেখানে তখনও বেশ বড-বড। কয়েক সপ্তাহ আগে যে ঘাস ছোট-খাট টমির কাঁধ পর্যন্ত উঠত, সেই ঘাস এখন জন্তুরা খেয়ে খেয়ে একেবারে গল্‌ফ্‌ মাঠের মত করে এনেছে,—তেমনি ছোট, আর তেমনি সবুজ। তখন আমায় ভাল করে লক্ষ্য করার দরকার হয, কারণ এখন জন্তুদের লুকিয়ে থাকার সুযোগ অল্প এবং ফলে তাদের শিকার করাও অনেকটা সহজ। যে গণ্ডার বর্ষাকালে সমস্ত রিজার্ভ জুড়ে নির্ভাবনায় ঘুরে বেড়াতো, এখন তারা কোন কাদা-মাখা জায়গায় বা কোন জলাশয়ের কাছে-পিঠে এসে জড়ো হতে শুরু করে। এইসব কাদার রাজ্যে আমায় পায়েব ছাপ পরীক্ষা করে বেড়াতে হত,—কেবল জন্তুর নয়, মানুষেরও।

বেলা এগারোটা নাগাদ আমি মাকিন্দুতে ফিরতাম। বাড়ি ফিরে প্রায়ই দেখতাম দু-তিনজন লোক কম্বল মুড়ি দিয়ে আমার প্রতীক্ষায় বসে আছে। কেউ হয়ত অসুখে পড়ে সাহায্য চাইতে এসেছে, কারুর হয়ত কোন নালিশ আছে। প্রায়ই শুনতাম রিজার্ভের কোন গণ্ডার হয়ত তাদের ফসল নষ্ট করছে। কথা দিতাম, খোঁজ করে দেখব। লাঞ্চের পর আমি আর হিল্‌ডা বিশ্রাম করতাম বিকেল পর্যন্ত, সন্ধ্যার দিকে ওদের নালিশ সম্বন্ধে খোঁজখবর করতাম। কখনো হয়ত কোন নতুন বন্দুকের নিশানা ঠিক করা, লরির কিছু মেরামত প্রয়োজন হলে তাও করা—অর্থাৎ শিকার পরিদর্শকের অসংখ্য

টুকিটাকি কাজে মনোনিবেশ করি। এইভাবে দিব্যি দিনগুলো কেটে যায়।

মাঝে মাঝে মনে হয়, আমার কাজই হয়েছে যেন সভ্যতার অভিযানের বিরুদ্ধে এক নিরবচ্ছিন্ন লড়াই চালিয়ে যাওয়া। বিভার্ডের মধ্যে একটা ছোট নদীর তীরে কয়েকটা চমৎকার ইউক্যালিপ্‌টাস গাছ ছিল। স্থানীয় মেয়েরা প্রায়ই দল বেঁধে সেখান থেকে কাটকুটো নিয়ে আসত জ্বালানি হিসেবে ব্যবহারের জন্যে। একদিন খবর পেলাম, নাইরোবির এক দপ্তর জ্বালানি কাঠের জন্যে এই গাছগুলো কেটে ফেলার অনুমতি চাইছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে নাইরোবিতে ক্রমেই কাঠ একটা সমস্যা হয়ে দেখা দিচ্ছিল। উত্তরে আমি বুঝিয়ে বললাম যে ঐ গাছগুলোর জন্যেই নদীর পাড়টা ঠিকভাবে রয়েছে, সুতরাং ওগুলো কেটে ফেললে বর্ষাকালে সমস্ত অঞ্চলটার উপর বন্যা বয়ে যাবে। এই আপত্তির ফলে সে অনুমতি দেওয়া হয়নি। কিন্তু আমি জানি, সেই দপ্তর আবার চেষ্টা করে দেখতে ছাড়বে-না। বনজ সম্পদের উপর এই নিষ্ঠুর ধ্বংসলীলার ফলে কেনিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চল চিরকালের জন্যে নষ্ট হয়ে গেছে। অথচ স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্যে কেবলই তাগিদ—বাড়ি তৈরির জন্যে আরও জায়গা চাই—চাষের জন্যে আরও খেত-খামার চাই। কে জানে এর শেষ কোথায়!

প্রায়ই হিল্‌ডা নাইরোবিতে গিয়ে ছেলেদের দেখাশোনা করে আসত,—আমিও যেতাম, তবে খুব বেশি নয়, ক্বচিৎ কখনো। নাইরোবির বাড়িটা যেমন চমৎকার তেমনি আধুনিক ধরনের,—ফুলের বাগান আর লনগুলো হিল্‌ডার হাতে অপূর্ব হয়ে উঠেছিল। কিন্তু আধুনিক নাইরোবি আমার ভাল লাগে না, সেখানকার হট্টগোল, সেখানকার ভিড় আমার বিশ্রী লাগে। মনে হয় যেন আমি নিজেকে এখানে ঠিক খাপ খাওয়াতে পারছি না। কয়েকদিন যেতে না যেতেই আমি অস্থির হয়ে পড়ি, মাকিন্দুতে ফিরে যাবার জন্যে মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। ট্রেন যখন মাকিন্দুতে পৌঁছয় তখন রাত সাড়ে এগারোটা; কিন্তু ট্রেনের জানলা দিয়ে একটু টর্চের আলো ফেললেই হল, সঙ্গে সঙ্গে মুলুম্বে আর তার কয়েকজন সঙ্গী প্ল্যাটফর্মে এসে জিনিসপত্র নামাতে শুরু করবে। মাকিন্দু হল ওয়াকাম্বাদের দেশ। তারা রাজনীতির বা আধুনিকতার কোন ধার ধারে না; তারা পুরোনো আদব কায়দাই বজায় রেখে চলেছে।

মাকিন্দুতেও যে মাঝে মাঝে ঝঞ্ঝাটে পড়তে হয় না এমন অবশ্য নয়, কিন্তু সে এমন ধরনের ঝঞ্ঝাট, যা আমি বুঝি বা যা সামলানো আমার পক্ষে সম্ভব।

মুলুম্বে 'ছাড়াও আমার আর-একজন খুব অভিজ্ঞ লোক আছে, তার নাম মাচোকা। এই দু-জনের মধ্যে সর্বদাই প্রচুর রেষারেষি, যদিও তা কখনো পুরোদস্তুর শত্রুতা হয়ে ফুটে ওঠে না। একদিন আমি বাড়ি ফিরছি, মাচোকার ছেলে এসে খবর দিল আমার অনুপস্থিতিতে তার বাবা মারা গেছে। সে কোন ডাক্তার দেখিয়েছিল কি না জিজ্ঞাসা করতে সে বললে, 'না বাওয়ানা! মুলুম্বে বাবাকে হিংসে করত; সে-ই ডাইনি ডাক্তারকে দিয়ে বাবার উপর ফেতিনা মন্ত্র চালিয়েছে!' কান্নায় ভেঙে পড়ে বললে ছেলেটা, 'কোন শ্বেতাঙ্গ ডাক্তারের সাধ্য ছিল না বাবাকে বাঁচাতে পারে।'

ওয়াকাম্বারা যুগ যুগান্তর ধরে শিকার করে আসছে, তাতে বাধা দেওয়া গভর্মেন্টের পক্ষে উচিত নয় এ কথা মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু তবুও তার কয়েকটা কারণ ছিল বৈকি। ওয়াকাম্বাদের সংখ্যা এখন আগের দশগুণ হয়ে গেছে, সুতরাং ওদের সবাইকেই যদি শিকার করার অধিকার দেওয়া হয় তাহলে তো কিছুদিনের মধ্যেই আর শিকারের প্রাণী বলে কিছুই থাকবে না। তা ছাড়া স্থানীয় বাসিন্দারা ইতিমধ্যে শিকারকে জীবীকা হিসেবে গ্রহণ করেছিল। বাধ্য হয়েই তাই এইসব বিধিনিষেধের প্রয়োজন হয়।

মাকিন্দুতে আসার কয়েক দিনের মধ্যেই চোরা শিকারের প্রমাণ মিলল। টহল দিতে দিতে হঠাৎ একটা মরা বেবুন চোখে পড়ল, তাকে তীর দিয়ে মারা হয়েছে। আশ্চর্য, বেবুনটার ছালও ছাড়িয়ে নেওয়া হয়েছে, কারণ এ দিয়ে কোন কাজই হয় না। তারপর দেখলাম নদীর তীরে কিংবা কোন জলাশয়ের ধারে কয়েকটা লুকোনোর জায়গা, চমৎকারভাবে চোখের আড়ালে রাখা। এগুলোকে একরকম পাখির বাসার সামিল বলা যেতে পারে। এগুলো সাধারণত কাঁটাগাছের উপরে তৈরি করা,—একজন মানুষ কোন রকমে বসতে পারে তাতে। এই বাসা গাছের ডালের উপর তৈরি করা হয় বলে খুঁজে পাওয়া খুব শক্ত। চোরা শিকারী এই বাসায় বসে প্রতীক্ষায় থাকে কখন কোন জন্তু জল খেতে আসে; তারপর শুধু একটা বিষাক্ত তীর ঠিকভাবে ছোড়া, ব্যস।

একদিন বিকেলে আমি স্কাউটদের সঙ্গে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরছি, এমন সময় একটা ছোট বোমা আমাদের চোখে পড়ল,—এইরকম বোমা তৈরি করে চোরা শিকারীরা তাতে শিকারের সন্ধানে লুকিয়ে থাকে। ভিতর থেকে স্থানীয় বাসিন্দাদের কথা শোনা যাচ্ছে। আমরা কাছে আসতে তারাও আমাদের সাড়া পেল। সঙ্গে সঙ্গে তারা সবাই তীর ধনুক বাগিয়ে দাঁড়িয়ে

উঠল। আমার একজন স্কাউট চিৎকার করে বললে, 'এ ভদ্রলোক চোরাই শিকারী,—হস্তিদন্ত নিয়ে এঁর কারবার—বন-সংরক্ষক নয়।' তার এই উপস্থিত বুদ্ধির দৌলতেই হয়ত আমি সে যাত্রা প্রাণে বেঁচে গেলাম, কারণ ওয়াকাম্বারা তীরের ব্যবহারে অত্যন্ত সিদ্ধহস্ত, এবং তাদের বিষের তীরের সামান্য আঁচড়েও মৃত্যুর সম্ভাবনা।

এর পর থেকে চোরা শিকারীরা খানিকটা বন্ধুভাবাপন্ন হয়ে পড়ল। কথা কইতে কইতে লক্ষ্য করলাম, সবারই মাথায় বেবুনের চামড়ার টুপি; এ থেকে বোঝা গেল কেন বেবুনটার ছাল ছাড়ানো হয়েছিল। গণ্ডার শিকারের সময় আমি মোটামুটি ভালভাবেই ওয়াকাম্বা ভাষা শিখেছিলাম, তাই কথা কইতে কোন অসুবিধে হচ্ছিল না। একজন বয়স্ক লোকের ব্যাপারেই আমার বিশেষ উৎসাহ ছিল—সে ছিল ওদের সর্দার। মাত্র কয়েক মিনিট তার সঙ্গে কথা কয়েই আমি বুঝলাম যে ঝোপে জঙ্গলে চলাফেরার ব্যাপারে সে অত্যন্ত নিপুণ। খুব মুরুব্বির মত সে কথা কইছিল এবং মনে হল সে যা বলছে সত্যই বলছে।

কেবল যে খাদ্য সংগ্রহের তাগিদেই এরা বনে এসেছে তা নয়; দাঁত আর খড়্গের লোভে তারা হাতি আর গণ্ডার শিকার করতে চায়। তারা জানে কয়েকজন দুর্বৃত্ত ভারতবাসী এইসব বহুমূল্য বস্তু এক পাউণ্ড এক শিলিং, বা ঐ রকম দরে কিনে নেবে, তারপর সেগুলো লুকিয়ে চুরিয়ে মোম্বাসায় পাঠাবে, আর সেখান থেকে সেগুলো প্রচুর লাভে আরবে পাঠানো হবে।

দলের সর্দার বললে তারা অ্যান্টেলোপ শিকার করবে, আমায় তারা সঙ্গে নিতে চায়। চললাম সঙ্গে। জঙ্গলের মধ্যে খানিকটা ফাঁকা জায়গা পড়েছিল, সেটা পার হতে গিয়ে একটা গণ্ডার আমাদের চোখে পড়ল। বললে সে, 'দেখবেন কেমন এটাকে মারি?' বলতে বলতেই সে তার তূণ থেকে একটা বিষাক্ত তীর বের করে নিয়েছে। তাড়াতাড়ি বললাম, 'না, না!' তখন সে বললে, 'আচ্ছা, তাহলে দেখুন কেমন একে ভয় পাইয়ে দিই।' সঙ্গে সঙ্গে বিষাক্ত তীরটা তূণে ফিরে গেল, তার বদলে একটা সাধারণ তীর সে তুলে নিলে। তাড়াতাড়ি আমি বললাম, 'দেখো, ওকে আঘাত কোরো না যেন।' আমাকে আশ্বাস দিয়ে ও বললে, না না, আমি কেবল ওকে ভয় খাইয়ে দিচ্ছি।' অনেক দিনের পুরোনো অভ্যাসের বশে সে তীরটা ধনুকের ছিলায় লাগিয়ে ছুড়ে দিল, ভাল করে লক্ষ্যও স্থির করল কি না সন্দেহ। তীরটা গিয়ে

গণ্ডারটার খড়্গের গোড়ায় লাগল। খুব জোরে লাগল বটে, কিন্তু তাতে তার কোন ক্ষতি হল না।' একটা শব্দ করেই গণ্ডারটা সবেগে জঙ্গলের ভিতরে প্রবেশ করল।

দেখলাম, সত্যিই এরা জঙ্গলে চলাফেরায় অত্যন্ত নিপুণ। কেবলমাত্র তীর ধনুক আর আগুন জালাবার জন্যে চকমকি নিয়েই তারা অনির্দিষ্ট কাল জঙ্গলে কাটাতে পারে। গ্রীষ্মের দিনে তারা বাওবাব গাছ থেকে জল পায়। এই প্রকাণ্ড গাছগুলোব ফাঁপা গুঁড়িতে বৃষ্টিব জল জমে থাকে, তাকে গাছের স্বাভাবিক জলাধার বলা যেতে পারে। অত্যন্ত নিপুণভাবে এরা স্ত্রী-গণ্ডারের ডাক নকল করে পুরুষ-গণ্ডারকে আকৃষ্ট করে তাদের ধনুকের পাল্লার মধ্যে এনে ফেলে। গাছের লুকোনো বাসায় থেকে তারা সিংহ পর্যন্ত বধ করে থাকে। ওদের বিষ এতই তীব্র যে সেই তীর পেটে লাগলে হাতি পর্যন্ত চারশো গজ যেতে না যেতেই মারা পডতে বাধ্য।

'কখনো কখনো আমরা হাতির কাঁধে বা পায়ে তীর মারি,' বললে বৃদ্ধ, 'সেক্ষেত্রে তারা মাইলের পর মাইল অতিক্রম করার পর বিষ কার্যকরী হয়। কিন্তু তাতে আমাদের কোন অসুবিধে নেই। দু-একদিন অপেক্ষা করে তারপর একটা বড় গাছে গিয়ে উঠি। লক্ষ্য রাখি কোথায় শকুনের দল ঘুরে ঘুরে উড়ছে। তাদের অনুসরণ করেই আমরা মরা হাতিটার সন্ধান পেয়ে থাকি।'

ওয়াকাম্বাদের ধনুকে এত জোর যে মাসাইদের মোষের চামড়ার ঢাল ভেদ করেও এ তীর সেই ঢালের আড়ালের মানুষকে মেরে ফেলতে পারে।

পিগ্‌মিদের বিষের চেয়ে ওয়াকাম্বাদের বিষ অনেক বেশি কার্যকরী। সর্দার বললে, 'এ বিষ মুচু গাছের আঠা থেকে তৈরি। এ গাছ চিনতে আমাদের অসুবিধে হয় না, কারণ এর চারিদিকে মরা মৌমাছি আর ছোট-ছোট পাখি দেখা যায়; এর সুন্দর লাল ফুল থেকে মধু খেতে গিয়েই ওদের এই অবস্থা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাবার পর যখন এই আঠা কালো মত হয়ে ওঠে তখন এর সঙ্গে আরো অনেক কিছু মিশিয়ে নেওয়া হয়—এই যেমন সাপের বিষ বা বিষাক্ত মাকড়সা, আর কোন-কোন মারাত্মক আগাছার শেকড়। একটা জ্যান্ত শ্রুও (ইঁদুরের মত প্রাণী) কখনো কখনো এর সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়ে থাকে।

বিষের শক্তি পরীক্ষায় এক বেশ মজার উপায় ওদের আছে। শিকারে বেরোবার আগে ওরা কনুইয়ের উপরে একটু কেটে রক্ত বের করে। সেই

রক্ত গড়িয়ে গড়িয়ে কব্জির কাছে নেমে আসতে থাকে। সেই রক্তে তারা বিষাক্ত তীরের অগ্রভাগ স্পর্শ করিয়ে দিলে সেই বিষ রক্ত বেয়ে উপরে উঠতে থাকে। ক্ষত পর্যন্ত পৌঁছবার ঠিক আগেকার মুহূর্তে রক্তটা মুছে ফেলা হয়। বিষটা যে রকম গতিতে উপরে উঠতে থাকে তা থেকে ওরা তার শক্তি সম্বন্ধে ধারণা করে নেয়।

ওদের সঙ্গে বন্ধুভাব স্থাপিত হবার পর আমি ওদের জানালাম যে আমি একজন শিকার-সংরক্ষক। সঙ্গে সঙ্গে ওরা খুব ঘাবড়ে গেল, বুঝল যে ওদের ফাঁস করে দেওয়া হয়েছে। আমার কিন্তু এদের ধরিয়ে দিতে মন সরল না। কিছু না হোক, ইউরোপীয়দের এদেশে আসার বহু শতাব্দী আগে থেকেই এরা শিকার করে আসছে,—শিকারে অত্যন্ত নিপুণ এরা। আর শিকারীতে শিকারীতে একটা সৌভ্রাত্রবোধ তো থাকবেই, তার মধ্যে বর্ণ বৈষম্যের স্থান নেই। ওদের বুঝিয়ে বললাম যে গণ্ডার আর হাতি মারা আর তাদের খড়্গ আর দাঁত নেওয়া,—এ আর চলবে না। মন দিয়ে আমার কথা শুনে সর্দার বললে, 'ও, বুঝেছি। হাতি আর গণ্ডার হল সরকারের, বাকি জন্তুগুলো আমাদের।'

ঠিক যে তাই আমি ওদের বোঝাতে চেয়েছিলাম তা নয়, কারণ যেকোন জন্তুর উপরেই সরকারের অধিকার। তাই, খাওয়ার জন্যে এক-আধটা অ্যাণ্টেলোপ শিকার করা আর নির্বিচারে পশুহত্যার মধ্যে যে পার্থক্য, সেটা ওদের বোঝাতে চেষ্টা করলাম। মনে হয় আমার বক্তব্য ওদের বোধগম্য হয়েছে, কারণ বন্ধুভাবেই আমরা পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করলাম। এর পরে আর কখনো আমি এদের শিকার চুরি করতে দেখিনি, সুতরাং মনে হয় পরস্পরকে বুঝতে আমাদের অসুবিধে হয়নি।

অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে আমি বিষের তীরের ব্যবহার সমর্থন করছি। আমার বক্তব্য হল এই যে আদিম অধিবাসিদের উপর কোন আইন আরোপ করার সময় খানিকটা সাধারণ বিচার-বুদ্ধির প্রয়োগ অবশ্যই প্রয়োজন। গভর্মেণ্টের উদ্দেশ্য হল, স্থানীয় বাসিন্দারা যাতে বনের পশুর উপর নির্ভর না করে তাদের গৃহপালিত পশু আর খেত খামার থেকেই তাদের খাদ্য উৎপাদন করতে পারে সেজন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করা, কারণ তা না হলে কলোনির লোকেরা রাইফেল নিয়ে একধার থেকে সমস্ত পশু মেরে শেষ করবে। অথচ এমন আইন যদি করা হয় যে কেবলমাত্র তীর ধনুকের ব্যবহারই চলবে, তাহলেও

কলোনির বাসিন্দারা এই ধুয়া তুলবে যে তাতে করে ওয়াকাম্বার মত জঙ্গলের বাসিন্দাদের সুবিধে দেওয়া হচ্ছে। সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে অতি সূক্ষ্ম রাজনীতি প্রবেশ করছে, এর কোন স্পষ্ট সমাধান সম্ভব নয়। আমার মতলব হল গণ্ডার আর হাতি শিকার একেবারেই নিষিদ্ধ করে দেওয়া; তারপর যখন দেখা যাবে যে আমি ওদের বিশ্বাসের পাত্র হয়েছি, তখন আস্তে আস্তে মাংসের জন্যে শিকারও বন্ধ করে দেওয়া। তবে, একথা আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে মাঝে মাঝে যখন চাষ ভাল না হওয়ায় দেশে দুর্ভিক্ষের অবস্থা আসে, মানুষ জন যখন অনাহারের সম্মুখীন হয়, তখন আমার মনে হয় এ আইনের উপর ততটা জোর দেওয়া উচিত নয়।

আমার মনে হয়, যে স্থানীয় বাসিন্দা কচিৎ কখনো ফাঁদ পেতে আর ক্ষেতের কাছে আসা কোন অ্যাণ্টেলোপকে ধরে তার সঙ্গে যে চোরা-শিকারকে বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছে তার অনেক পার্থক্য। এই দ্বিতীয়োক্তের উপর আমার কোন সহানুভূতি নেই। এরা যে কী ক্ষতি করতে পারে তা বলে শেষ করা যায় না। মাত্র বারো বর্গমাইল জায়গার মধ্যে একবার আমি কুড়িটা গণ্ডারের কঙ্কাল দেখেছিলাম—এক বছরের মধ্যে এতগুলো প্রাণী চোরা শিকারীর হাতে প্রাণ দিয়েছে। এর চেয়েও মারাত্মক হল ওদের হাতে আহত হয়ে বেঁচে থাকা জন্তুগুলোর অবস্থা। বিষ যদি পুরোনো হয়, কিংবা যথেষ্ট কার্যকরী না হয়, জন্তু বেঁচে যায় অনেক সময়। সেই জন্তু তখন শয়তান হয়ে ওঠে। মানুষের উপর তার জাতক্রোধের সৃষ্টি হয়—যাকে দেখে তাকেই আক্রমণ করে বসে। এসব জন্তু প্রায়ই মারা পড়ার আগে অনেক মানুষকেই আহত করে থাকে।

তবে, একথা স্বীকার করতেই হবে যে সবচেয়ে যে দুর্ধর্ষ শিকারী সেও ঝোপ জঙ্গলের খুঁটিনাটি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল এবং শিকারী হিসেবে অপূর্ব। এদের পুলিশের হাতে দেওয়া উচিত সন্দেহ নেই, কিন্তু তবুও এদের উপর ঘৃণার ভাব পোষণ করতে মন সরে না। আমি ঘৃণা করি সেইসব ভারতীয় ব্যবসায়ীদের যাদের উৎসাহে ও প্ররোচনায় এরা অবৈধ উপায়ে হাতি আর গণ্ডার শিকার করে। যত ঝুঁকি সব এই শিকারিদের নিতে হয়, আর লাভ করে এই ব্যবসায়ীরা। অথচ এদের প্রতি শাস্তিবিধানও একরকম অসম্ভব।

একবার আমি অনেক সময় নষ্ট করে, অনেক ঝঞ্ঝাট সহ্য করে এমনি কয়েকজন ব্যবসায়ীকে নাইরোবিতে বিচারের জন্যে হাজির করেছিলাম। আমার ওয়াকাম্বাদের দিয়ে তারা লুকিয়ে শিকার করাচ্ছিল। ব্যবসায়িদের সর্দার

লোকটি অত্যন্ত চতুর, কলোনির সেরা উকিলদের সে নিযুক্ত করে এবং আইনের অনেক কচকচির পর শেষ পর্যন্ত সে মুক্তি পায়, কিন্তু তার প্ররোচনায় যারা কাজ করেছিল সবাই ধরা পড়ে তারা। অগত্যা তখন আমি মাকিন্দুতে ফিরে গিয়ে আবার চোরাই শিকারিদের সন্ধানে ঘুরতে শুরু করলাম।

যেসব শ্বেতাঙ্গ শিকারী আইন অমান্য করে শিকার করে তারা কেউ অচেনা নয়। যদি সে নাইরোবির কোন সাফারি দপ্তরের সঙ্গে যুক্ত থাকে তাহলে তার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকা চলে, কারণ তার সঙ্গে এমন কোন প্রখ্যাত শিকারী থাকবে যে কোনমতেই আইন অমান্য করতে দেবে না। যদি কোন শিকারী কোন কারণে কোন পশুকে আহত করে, তার কাজ হল আহত জন্তুটার পিছু নিয়ে তাকে শেষ করে ফেলা। কিন্তু আবার এমন অনেক শ্বেতাঙ্গ শিকারীও আছে যারা নিজে থেকেই শিকারী জোগাড় করে, কোন বিখ্যাত শিকার-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত না থেকেও। এদের মধ্যেও অবশ্য অনেক শিকারী আছে যারা যেকোন বিখ্যাত শিকারীর সমতুল্য, কিন্তু আবার এমন অনেক শিকারীও তাদের মধ্যে আছে যারা মোটেই নির্ভরযোগ্য নয়, কোন সাফারি প্রতিষ্ঠানই এই দুর্নামের জন্যে এদের কাজে নিয়োগ করবে না।

এমন অসৎ শিকারীরও অভাব নেই যারা তাদের যতটুকু লাইসেন্স, ইচ্ছে করেই তার চেয়ে বেশি পশু বধ করে থাকে,—এই অছিলায় যে, এই যে বেশি পশু তারা মেরেছে এ কেবল বাধ্য হয়ে, আত্মরক্ষার তাগিদে ; লাইসেন্স-মত পশু শিকার করে আসলে তারা নাইরোবিতে ফেরার জন্যেই প্রস্তুত হচ্ছিল। একজন শিকারী আবার তিনটে চিতা * পর্যন্ত শিকার করেছিল, এই অজুহাতে যে, চিতাগুলো তাকে আক্রমণ করেছিল। চিতা হল অত্যন্ত শান্ত স্বভাবের পশু, লম্বা লম্বা তার পা। ভারতের রাজা-রাজড়াদের কাছে তাদের খুব কদর, তাঁরা তাদের পোষ মানিয়ে অ্যান্টেলোপ শিকারে তাদের সাহায্য গ্রহণ করেন—খরগোস শিকারে যেমন গ্রে-হাউণ্ডের ব্যবহার হয়। চিতার স্বভাব এতই শান্ত যে বয়স্ক চিতা পর্যন্ত সহজেই পোষ মেনে থাকে। আমি তো বিশ্বাসই করতে পারি না যে আফ্রিকার ইতিহাসে কখনো কোন চিতা কোন মানুষকে আক্রমণ করেছে। অথচ এই নির্লজ্জ লোকটা দাবি করেছে যে এই তিন-তিনটে চিতা তাকে তাড়া করেছিল বলে বাধ্য হয়ে তাকে তাদের মারতে হয়েছে। বলা বাহুল্য, তার উপর কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা হয়েছিল।

* চিতাবাঘ ও চিতা সম্পূর্ণ আলাদা জন্তু।

যে জন্তু সাঙ্ঘাতিক তার আক্রমণের ফলে আত্মরক্ষার তাগিদে গুলি করতে হয়েছে—এ যুক্তি অনেক সময়ে কাটানো শক্ত হয়ে ওঠে। একজন স্থানীয় বাসিন্দাকে নিয়ে আমায় বড ঝঞ্ঝাটে পডতে হয়েছিল। সে বলে, যতবার সে জঙ্গলে যায় ততবারই একটা গণ্ডার তাকে আক্রমণ করে আর আত্মরক্ষার তাগিদে প্রতিবাবই তাকে একটা করে গণ্ডার মারতে হয়। বলা বাহুল্য মরা গণ্ডারের চামডা বা খড়্গ তাকে নিতে দেওয়া হয় না; কিন্তু আমার খুব সন্দেহ হয়, তার আনন্দই হল গণ্ডার শিকারে,—যেখানে পারে সে গণ্ডার শিকার করে। ভাবলাম এ রকম ক্ষেত্রে হয়ত স্থানীয় বাসিন্দাদের সাক্ষ্য গ্রাহ্য হবে না, সে আত্মরক্ষার অজুহাত দেখিয়ে বেরিয়ে পডবে, তাই আমারই একজন স্কাউটকে জঙ্গলের বাসিন্দা সাজিয়ে সেই শিকারীর সাফারির দলে ভিডিয়ে দিলাম।

কিছুকালের মধ্যেই স্কাউট আমায় খবর দিল, লোকটা একটা গণ্ডার মেরেছে। আমি তার নামে রিপোর্ট করলাম। অত্যন্ত খেপে গেল সে, বললে জঙ্গলের একটা 'নিগ্রোর' কথা কখনও শ্বেতাঙ্গের বিরুদ্ধে আইনে গ্রাহ্য হতে পারে না। কিন্তু এমন প্রমাণ আমাব কাছে ছিল যা সে আন্দাজ করতেও পারে নি; সে জানত না যে এই শিকারের সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে আমি আমার স্কাউটেব সঙ্গে আলোচনা করেছিলাম, মরা গণ্ডাবটার সন্ধান করে তার শরীর থেকে গুলিটাও কেটে বের করে নিয়েছিলাম। আদালতে সাক্ষ্য দিয়ে প্রমাণ করতে পেরেছিলাম যে যে-মুহূর্তে গুলিটা ছোডা হয়েছিল, গুলির অবস্থান থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে নিশ্চয় গণ্ডারটা সে সময়ে আক্রমণ করে নি। এই যুক্তির প্রমাণ হিসেবে গণ্ডারটার খানিকটা চামডাও আমি কেটে এনেছিলাম। ফলে লোকটার অপবাধ প্রমাণিত হয় ও তাকে প্রচুর জরিমানা দিতে হয়।

জন্তুদের সংরক্ষণের ব্যাপারে একটা অসুবিধে এই হয় যে জন্তুরা তাদের রিজার্ভের সীমানা জানে না, প্রায়ই তাই তারা সীমানা ছাডিয়ে এসে অনিষ্ট করে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে তখন এই ধুয়া ওঠে যে রিজার্ভটা এ জেলার পক্ষে আতঙ্কস্বরূপ, সুতরাং সেখানকার সমস্ত হিংস্র পশুকে মেরে ফেলা হোক। রিজার্ভের জন্তুবা যদি বেরিয়ে এসে লোকালয়ের ক্ষতি করে তাহলে তাদের মারতেই হবে সন্দেহ নেই; তবে, প্রায়ই তাদের উপর মিথ্যা দোষারোপ করা হয়ে থাকে।

শিকার সংরক্ষকের এক প্রধান কর্তব্য হল অনিষ্টকর জন্তু বধ করা। আমার

মনে হয় এখন আফ্রিকার সবচেয়ে অনিষ্টকর জন্তু কোন হিংস্র পশু নয়, সে হল হায়েনা আর বেবুন। হিংস্র পশুর অত্যাচার তো সহজেই চোখে পড়ে, কিন্তু হায়েনা আর বেবুনের উপদ্রব খুব মারাত্মক না হওয়ায় তত সহজে চোখে পড়ে না বটে, কিন্তু সে উপদ্রব এক-আধবারে শেষ হয় না, বারবার চলতে থাকে।

শিকার সংরক্ষণ বিভাগের একজনকে সর্বদাই এদের মারবার জন্যে ব্যস্ত থাকতে হয়, কারণ কাছে-পিঠের কোন-না-কোন গ্রাম থেকে সাহায্যের জন্যে প্রায়ই আর্ত আহ্বান আসে। তেমনি একটা চিঠি তুলে দিচ্ছি :

মহামান্য হুজুর,

ইউরোপের যুদ্ধ শেষ হইবার জন্য ও আপনাদের জয়লাভের জন্য আমাদের অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

কিন্তু এখানে আমাদের খামারে হায়েনা ও গরুর মধ্যে লড়াই চলিয়াছে। গরুরা পরাজিত হইতেছে, প্রতি রাত্রে একটি কি দুইটি গরু মারা পড়িতেছে।

ইতিমধ্যে এ অঞ্চলে চারিটি গরু মারা পড়িয়াছে। আপনি স্বয়ং আসিয়া তাহা দেখিতে পারেন।

জনমানুষ অত্যন্ত ঘাবড়াইয়া গিয়াছে।

আমি আপনার সাহায্য ও কৃপা প্রার্থনা করিতেছি।

ভুল ইংরেজিতে লেখা এই ধরনের চিঠি পড়ে হাসি আসা স্বাভাবিক বটে, কিন্তু এর পেছনে যে আতঙ্কের ছবি ফুটে উঠেছে তা অত্যন্ত স্পষ্ট।

হায়েনাদের কেবলমাত্র বনের মুর্দাফরাস বললে মোটেই ঠিক বলা হয় না। স্বভাবত ভীতু হলেও তারা সুবিধে পেলে আক্রমণ করতেও পিছপা হয় না। এক ভদ্রমহিলার খামার থেকে ক্রমাগত এত বেশি গরু বাছুর হায়েনার হাতে মারা পড়ছিল যে তিনি অত্যন্ত অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। হায়েনাদের প্রিয় শিকার হল এখন গরু যে বাচ্চা প্রসব করছে, কারণ হায়েনা জানে যে সেই অবস্থায় সে একেবারেই নিরুপায় হয়ে পড়ে।

হায়েনারা অনেক সময় দল বেঁধেও চলে, তখন তারা কোন ছাড়া গরুকে পেলে আক্রমণ করতে ছাড়ে না। ওদের একগুঁয়েমির এক আশ্চর্য নজির আমার কাছে আছে। একদিন সন্ধ্যায় আমি আমার তাঁবুর সামনে বসে আছি, এমন সময় বাইরে জন্তুর খুরের খট্-খট্ আওয়াজ শোনা গেল। এক হাতে রাইফেল বাগিয়ে শব্দ অনুসরণ করে সেখানে টর্চ ফেললাম। একটা ভয়-পাওয়া ষাঁড় দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে আমার তাঁবু পার হয়ে ধেয়ে গেল, তার

পিঠে একটা হায়েনা। হায়েনাটার দাঁত ষাঁড়টার কুঁজের উপর গভীরভাবে বসানো, আর তাদের পেছনে দশ পনেরোটা হায়েনা দল বেঁধে ছুটে চলেছে।

আমার ধারণা ছিল একমাত্র সিংহই বুঝি ষাঁড়ের পিঠে অমনভাবে সওয়ার হতে পারে; তাই আমার পক্ষে নিজের চোখকেও বিশ্বাস করা শক্ত হয়ে উঠল। আমি গুলি করবার আগেই পালিয়ে গেল ষাঁড়টা।, একজনের হাতে টর্চটা দিয়ে তাকে সঙ্গে করে আমি ষাঁড়টার পিছু নিলাম। তাঁবু থেকে দুশো গজ মত তফাত থেকে একটা জোর চিৎকারের আওয়াজ শোনা গেল। ছেলেটা সেখানে টর্চের আলো ফেলতে দেখলাম ষাঁড়টা মরে পড়ে রয়েছে, আর কয়েকটা হায়েনা তাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়তে শুরু করেছে। অনেকগুলো গুলি করতে তবে হায়েনারা মরল।

হায়েনা চুপি-চুপি গিয়ে কোন ঘুমন্ত জন্তুর উপর লাফিয়ে পড়েছে, এমন ব্যাপারও আমি পরবর্তীকালে দেখেছি। এ ব্যাপার প্রত্যক্ষ করার আগে আমি হায়েনাদের এতটা দুঃসাহসী বলে ধারণা করতে পারি নি।

আফ্রিকার মুর্দাফরাস হিসেবে হায়েনাদের পরিচয়। ও অঞ্চলের বাসিন্দারা দেখে যে মৃতকে মাটির নিচে পুঁতে ফেলার চেয়ে জঙ্গলের মধ্যে ফেলে দেওয়া অনেক সহজ, এবং এই কারণে হায়েনারা গ্রামের প্রান্তদেশে ঘোরাফেরা করে। আমার বিশ্বাস, মৃতদেহ হায়েনার কবলে ফেলে দেবার এই অভ্যাস থেকেই তারা মানুষকে আক্রমণ করার উৎসাহ পায়। এহেন ঘটনার প্রচুর নজির আছে—বিশেষ করে ঘুমন্ত মানুষের উপর। আমি একটি ছেলেকে চিনি যে হায়েনার কবলে পড়ে সাঙ্ঘাতিকভাবে জখম হয়েছিল। একটা আগুন তৈরি করে সে কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে ঘুমিয়ে ছিল। ওরা সাধারণত আগুনের পরিধির ভিতরে গোল হয়ে শুয়ে থাকে, ওদের মাথা থাকে আগুনের দিকে আর পা বাইরের দিকে। এই ছেলেটি কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে ছিল, তার পরনে আর কিছু ছিল না। রাত্রে কখন একটা হায়েনা এসে তার অণ্ডকোষ ছিঁড়ে নিয়ে পালিয়ে যায়।

হায়েনার উৎপাত বন্ধ করতে হলে বিষই হল সবচেয়ে কার্যকরী। প্রথমটা তো খুবই কার্যকরী হয়, তবে, ক্রমশ সাবধান হয়ে যায় ওরা। যে পশুর মৃতদেহে ওরা মানুষের স্পর্শের গন্ধ পায় তাকে সন্দেহের চোখে দেখে। অনেকবার আমি অ্যান্টেলোপ মেরে তাতে বিষ দিয়ে দিয়েছি; রাত্রে হায়েনা এসেছে, টোপটা শুঁকে দেখেছে; কিন্তু খায়নি। আমি এর চেয়ে বোবা বন্দুকের

ব্যবহারই পছন্দ করি বেশি। বোবা বন্দুক হল কোন বিশেষ জায়গায় একটা বন্দুক বেঁধে রাখা,—তার ঘোড়ার সঙ্গে একটা দড়ি বাঁধা থাকে যে-পথ দিয়ে জন্তুরা চলাফেরা করে সেই পথের উপব দিয়ে। কাঁটা-ঝোপ দিয়ে একটা বোমা তৈরি করে তাতে যদি কয়েকটা খোপ করা হয় আর প্রতিটি খোপে একটা করে মরা অ্যান্টেলোপ রাখা যায় তাহলে প্রায়ই দেখা যাবে যে প্রতিটি খোপেই একটা করে হায়েনা ঐ বোবা বন্দুকের গুলিতে মরে পড়ে রয়েছে।

হায়েনার পরে আফ্রিকার সবচেয়ে ক্ষতিকর প্রাণী বোধহয় বেবুন। অনেক দিক দিয়েই তাকে মনে হয় যেন কোন নিকৃষ্ট স্তরের মানুষ। ওদের দুঃসাহস আর বুদ্ধিব হয়ত প্রশংসাই করা যেত যদি ওবা অমন অলস আর নিষ্ঠুর প্রকৃতিব না হত। প্রায়ই ওরা গ্রামবাসিদেব মুরগির ছানা ধরে ফেলে, তারপব জীবন্ত অবস্থাতেই তাদের একটু একটু কবে টুকরো টুকরো করে ফেলে নিছক তাদের চিৎকার আর ছটফটানি লক্ষ্য করবার উদ্দেশ্যে।

যখন ওবা ভুট্টাখেতের উপর গিয়ে পড়ে, প্রচুব বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয় তখন। একটা বেবুন একটা গাছে উঠে প্রহরীর কাজ করে। কোন মানুষকে কাছে আসতে দেখলে সে ছোট ছোট শব্দ করে সঙ্কেত জানায়, আর সঙ্গে সঙ্গে বাকি সকলে গিয়ে ঝোপের আড়ালে আত্মগোপন করে, কিন্তু তাও বগলে করে কিছু ভুট্টা না নিয়ে নয়।

এই সাবধানী ডাক তারা ডেকে ওঠে কেবলমাত্র যখন দেখে যে কোন পুরুষ মানুষ এগিয়ে আসছে তীরধনুক হাতে। কিন্তু স্ত্রীলোককে তারা গ্রাহ্য তো করেই না, বরং পরম ঘৃণার চোখে দেখে। কোন বয়স্ক বেবুন অনেক সময় স্ত্রীলোককে দেখলে রীতিমত বীরদর্পে তার দিকে অগ্রসর হয়, মাটি আঁচড়ায় আর ক্রুদ্ধ অঙ্গভঙ্গি করে। বেবুনরা ছোট ছেলেমেয়েদের ধরে নিয়ে গেছে এমন নজিরেরও অভাব নেই।

পুরুষ বেবুনরা অত্যন্ত দুঃসাহসী। বেবুনের দল যখন পালায়, পুরুষ বেবুনটাই সর্বদা দলের পেছনে থাকে,—এমন কোন কুকুর আছে বলে আমার মনে হয় না যে পুরুষ বেবুনের সঙ্গে লড়াই করে প্রাণে বেঁচেছে। ওরা কুকুরকে ধরে প্রথমেই তাদের সরু দাঁতগুলো তার শরীরে প্রবেশ করিয়ে দেয়, তারপর দু-হাত দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দেয় তাকে। পুরুষ বেবুনের দেহে অসম্ভব শক্তি, এইভাবেই সে এক খাবলা মাংস তুলে নিতে পারে। বেবুনের দাঁত সিংহের দাঁতের চেয়েও বড়, এবং অস্ত্র হিসেবে অত্যন্ত মারাত্মক।

বেবুনদের মারতে হলে সাধারণত বিষের ব্যবহার করা হয়। হায়েনাদের মত এদের উপরেও এই বিষ ততক্ষণই কার্যকরী হয় যতক্ষণ না এরা এই বিষের ফল প্রত্যক্ষ করছে। তাই কয়েকটা জন্তু মারা পড়ার পর ওরা সাবধান হয়ে যায়, তখন আর তারা বিষ-মাখানো টোপ স্পর্শ করে না। ঘ্রাণেন্দ্রিয় বিশেষ প্রবল না হলেও ওরা খুব সতর্ক হয়ে ওঠে, মাটিতে পড়ে থাকা কোন কিছুই স্পর্শ করে না। অত্যন্ত চালাক ওরা, জঙ্গলের মধ্যে বন্দুক পেতে ওদের মারা যায় না; এবং সতর্ক হয়ে পড়লে তখন ওদের গুলি করে মারাও অত্যন্ত কঠিন হয়ে ওঠে।

আর যে অনিষ্টকর জন্তুকে গভর্মেণ্টের শিকারীরা মাঝে মাঝে মারার জন্যে ব্যস্ত হয়ে ওঠে সে হল মানুষখেকো সিংহ। ভারতে মানুষখেকো বাঘ শিকারের অনেক চমকপ্রদ কাহিনী আমি প্রচুর কৌতূহলের সঙ্গে পড়েছি। যেভাবে ওদেশে বাঘ মারার ব্যবস্থা করা হয় তা জেনে অত্যন্ত আশ্চর্য হতে হয়। কোন মানুষখেকো বাঘ হয়ত চারশো কি পাঁচশো মানুষ মারার পর তবে কোন শিকারী তাকে মারবার জন্যে তৈরি হয়। কেনিয়ায় কিন্তু মানুষখেকোকে অত্যন্ত বিপদজনক বলে ধরে নেওয়া হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে তাকে হত্যা করার ব্যবস্থা হয়ে থাকে। এই শিকারের মধ্যে খেলোয়াড়ি মনোবৃত্তির কোন স্থান নেই। কোন মানুষখেকোর খবর এলেই শিকার বিভাগ অন্য সব কাজ ছেড়ে প্রথমেই তাকে মারবার ব্যবস্থা করে। সঙ্গে সঙ্গে কোন শিকারীকে তাকে মারবার জন্যে পাঠানো হয়, শিকারীর উপর নির্দেশ থাকে যে যেভাবে সে ভাল মনে করে সেভাবেই তাকে মারা চলতে পারে। ফাঁদ পাতা, বিষ প্রয়োগ, বন্দুক পাতা, সমস্ত রকম উপায়েই তাকে মারবার চেষ্টা করা হয়। মানুষখেকোর আর দ্বিতীয়বার কোন মানুষকে মারবার সুযোগ মেলে কি না সন্দেহ।

যেসব সিংহ নরখাদকে পরিণত হয় তাদের অধিকাংশই হয় বার্ধক্যের জন্যে কিংবা আহত হয়ে বন্য পশু শিকারের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে; হয়ত কোন স্থানীয় শিকারীর তীরে কিংবা কোন অ্যাণ্টেলোপের শিঙের ঘায়ে সে আহত হয়ে পড়েছে। কিন্তু পূর্ণবয়স্ক ও সম্পূর্ণ সুস্থদেহ সিংহকেও কখনো কখনো মানুষ মারতে দেখা গেছে। এ ব্যাপার সাধারণত ঘটনাচক্রেই ঘটে থাকে। সেই মানুষের মাংস যদি তার ভাল লেগে যায়, তখন সে পরিণত হয় নরখাদকে। এহেন ঘটনা সেই অঞ্চলেই ঘটে যেখানে গ্রামবাসিদের গোচারণ-ভূমি জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করার ফলে সিংহের স্বাভাবিক খাদ্য দূরে সরে যায়। গরু ছাগল

ধরতে গিয়ে হয়ত কখনো কোন রাখালকে হত্যা করে বসল, শিকারের বাধা হিসেবে। তারপর যদি সেই পশু কোনমতে তার কবল এড়িয়ে পালাতে পারে তখন হয়ত সে মরা রাখালটার কাছে গিয়ে তাকে খেতে শুরু করে। অবশ্য এহেন ঘটনা সচরাচর ঘটে না, কিন্তু যখন তা ঘটে, সেই সিংহ প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই নরখাদকে পরিণত হয়। মানুষ মারা অত্যন্ত সহজ এ তথ্য আবিষ্কারের পরেই যে সে প্রথম নরখাদকে পরিণত হয় তা নয়, তবে, একবার যদি তার নরমাংসের উপর লোভ জন্মায় তাহলে সে বাসনা চরিতার্থ করবার জন্যে সে অনেক দূর পর্যন্ত যেতেও পরাঙ্মুখ হয় না। একদল গরু ছাগলের পালকে অতিক্রম করে যেতে গিয়ে রাখালকে হত্যা করার নজিরও সুদুর্লভ নয়।

কোন-কোন সিংহের মধ্যে আবার নবমাংস ভোজনের প্রবণতা দেখা যায়। এ এক বিশেষ ধরনের উত্তরাধিকার, এর কোন সঠিক কারণ নির্ণয় করা যায় না। নরমাংসাশী সিংহের পক্ষে অবশ্য তার শাবকদেব নরমাংসের প্রতি প্রবণতা জাগানো স্বাভাবিক। সিংহশাবক স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বশে হত্যা করে না, মা তাদের যা দেখিয়ে দেয় তাই তারা শেখে। নরমাংসের প্রতি এই আশক্তি মনে হয় কেবলমাত্র বংশের তৃতীয় বা চতুর্থ পুরুষের মধ্যে জাগ্রত হয়ে থাকে। বিশেষ করে সাভো জেলাতেই এর পরিচয় বিশেষ করে পাওয়া যায়,—মানুষখেকো সিংহের জন্যে এব খ্যাতি ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দ থেকে।

নরখাদক সিংহের উৎপাত উৎখাত করতে হলে বোবা বন্দুকের চেয়ে ভাল একটা মাত্র উপায় আমার জানা আছে। সেটা হল বিষপ্রয়োগ। স্ট্রিকনাইন বিষের কার্য সিংহের উপর অত্যন্ত মারাত্মক, মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই তা কার্যকরী হয়ে ওঠে। আমার মত সেকেলে শিকারীর পক্ষে বিষপ্রয়োগ ব্যাপারটা কখনই প্রীতিকর হতে পারে না, কারণ এতে শিকারীর খেলোয়াড়ি মনোবৃত্তির সামান্যতম পরিচয়ও নেই। কিন্তু তাহলেও এর কার্যকরিতা সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ এবং কোন-কোন ক্ষেত্রে আমাকে বাধ্য হয়েই এ প্রয়োগ করতে হয়েছে।

নরখাদক সিংহ কোন মানুষ মেরে তার শরীরের খানিকটা অভুক্ত রেখে চলে গেলে, প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই সে আবার সেটার জন্যে ফিরে আসে, বন্য জন্তুর মাংস খেতে যেমন আসে তেমনি। ইতিমধ্যে যদি কোন শিকারী সেই দেহে বিষ প্রয়োগ করে থাকে তাহলে নির্ঘাত মারা পড়বে সিংহ। ব্যাপারটা যত বিশ্রীই মনে হোক না কেন, অবস্থা-বিপাকে এ না করে উপায়

নেই। এ ব্যাপারে যে স্থানীয় বাসিন্দাদের মনে কোন রকম দ্বিধা নেই, নিম্নের কাহিনী থেকে তার পরিচয় মিলবে।

আমার বন্ধু ক্যাপ্টেন টম স্যামন মাকিন্দুব নিকটবর্তী কোন এক জেলার বনরক্ষক। একদিন সে খবর পায় যে এক স্থানীয় সর্দারের মা সিংহের কবলে মারা পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সে সেই গ্রামে গেল। সর্দারের সঙ্গে সে সিংহের চিহ্ন অনুসরণ করে অগ্রসর হয়ে প্রথমে স্ত্রীলোকটির একটি হাত এবং পরে তার অর্ধভুক্ত শরীরের সন্ধান পেল। টম দেখল আশেপাশে কোন গাছ নেই যেখানে মাচান বাঁধা যেতে পারে বা কোন ঝোপ জঙ্গলও নেই যেখানে বোমা তৈরি করা সম্ভব, আর সেখানকার মাটিও রোদে পুড়ে এমনই শক্ত, যে স্প্রিং ফাঁদও পাতা সম্ভব নয়'। অনেক ইতস্তত করাব পর ক্যাপ্টেন মৃতদেহে বিষপ্রয়োগের অনুমতি প্রার্থনা কবল। বুঝিয়ে দিল, নতুবা আরও অনেক মানুষকে এই সিংহের হাতে প্রাণ দিতে হবে।

সর্দার এ প্রস্তাবে রাজি হতে টম মৃতদেহেব অনেক জায়গায় কেটে কেটে প্রতিটি জায়গায় একটা কবে ছোট ছোট স্ট্রিকনাইনের ক্যাপসুল দিয়ে দিল। তারপর চলে এল সেখান থেকে।

পরদিন সকালে তারা গিয়ে দেখে, সিংহটা সেখানেই মরে পড়ে আছে। বাঁ পাছায় লাগানো একটা ক্যাপসুল পেটে যেতে সঙ্গে সঙ্গে মারা পড়েছে সে। তখন টম সর্দারের দিকে ফিরে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল। বললে, 'গভর্মেণ্ট এবার তোমার মায়ের অন্ত্যেষ্টির জন্যে যা কিছু করবার তাই করবে, খরচের ব্যাপারে কোনরকম কার্পণ্য করবে না; তুমি যা দরকার মনে করবে পরম যত্নের সঙ্গে তাই করা হবে।'

এ কথা শুনে সর্দার মাথা চুলকোতে লাগল। শেষ পর্যন্ত সে বললে, 'তা, বুড়িমার সৎকার করে দেহটা নষ্ট করে কী লাভ? হায়েনারা ইদানীং বড উৎপাত করছে। কয়েক রাত মাকে এভাবে ফেলে রেখে দেখলে তো হয়, কিছু হায়েনা মারা পড়ে কি না!' এর ফলে কী হয়েছিল তা আর আমি শুনি নি।

বনরক্ষণের কাজে মাকিন্দুতে ব্যস্ত থাকতে হলেও প্রায়ই আমায় শিকার-বিভাগের আহ্বানে বন্য পশু দমনে এদিকে ওদিকে যেতে হত। হাতির অত্যাচাবের খবরই আসত বেশি করে। কখনো কখনো স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছ থেকে ভুল ইংরেজিতে লেখা এ ধরনের চিঠিও আসত:

শিকার সংরক্ষক সমীপেষু

হুজুর, আমাদের তুসো গ্রামে যে ভয়াবহ অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে তা আপনাকে জানাইতে বাধ্য হইতেছি। গ্রামবাসিরা বহুবার আমার কাছে আসিয়া আপনাকে লিখিতে বলিয়াছে, যাহাতে আপনি আসিয়া আমাদের চাষের ফসলকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করেন। প্রথমটা আমি তাহাদের কথায় বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করি নাই, ভাবিয়াছিলাম দুয়েক দিনের মধ্যেই এ অত্যাচার বন্ধ হইয়া যাইবে। কিন্তু দিনের পর দিন যেভাবে তা বাড়িয়াই চলিয়াছে তাহাতে গ্রামবাসিদের এমনও আশঙ্কার কারণ হইয়াছে যে তাদের কুটিরগুলিও বুঝি এবার ধূলিসাৎ হইয়া যাইবে। রাত্রিকালে হাতির পাল গ্রামের মধ্যে যথেচ্ছ ঘোরাফেরা করিতে থাকে। গ্রামবাসিগণ অত্যন্ত হতাশ হইয়া পড়িয়াছে, দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিতেছে, হায়, এ বছর আমরা কী খাইয়া বাঁচিব? বাধ্য হইয়াই আমাদের গ্রাম ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে! আমি নিজে যে হাতির ভয়ে বিশেষ ব্যাকুল তাহা নহে; আমার ভয় হইল, এরপর হয়ত গ্রামবাসিরা বাধ্য হইয়াই ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিবে। আশা করি হুজুর এমন একটা ব্যবস্থা করিবেন যাহাতে এই অবস্থার দ্রুত অবসান হয়।

ইতি

আপনার একান্ত

এক মিশন বালক।

আশ্চর্য বুদ্ধি হাতির। ওরা ঠিক জানে কোথায় থাকলে ওরা শিকারীর আওতার বাইরে থাকতে পারবে। টাঙ্গানাইকার সীমান্ত অঞ্চলে অবস্থিত লুঙ্গা—লুঙ্গার নারকেল খেতে একপাল হাতি ধ্বংসলীলা শুরু করেছিল, শিকার-বিভাগ থেকে আমায় পাঠানো হয়েছিল সেখানে। দিনের বেলাটা টাঙ্গানাইকায় কাটিয়ে তারা পরে কেনিয়া এলাকায় প্রবেশ করে খেতের ফসল নষ্ট করত। সাধারণভাবে দেখলে মনে হবে যে এই হাতিদের হত্যা করা এক মামুলি ব্যাপার ছাড়া কিছু নয়, কিন্তু একটা সূক্ষ্ম আইনের ফাঁক এক্ষেত্রে রয়ে গেছে। কেনিয়া শিকার বিভাগের ক্ষমতা নেই শিকারীকে টাঙ্গানাইকা এলাকায় গিয়ে হাতি শিকারের অনুমতি দিতে, তা করতে গেলে অনেক আইনের জালে জড়িয়ে পড়তে হবে এবং সেই গ্রন্থি ছাড়িয়ে বেরিয়ে আসতে যে সময় লাগবে তার মধ্যে সমস্ত খেত ধ্বংস হয়ে যাবে। আমার কাজ তাই

হয়েছিল কেনিয়া এলাকাতেই হাতিগুলোকে হত্যা করা। অর্থাৎ আমায় কাজ করতে হবে রাত্রে; কারণ টাঙ্গানাইকায় যে হাতিরা নিরাপদ, এ কথা হাতিরা জানে বলেই মনে হয়, কারণ ভোরের আগেই তারা ঠিক টাঙ্গানাইকায় ফিরে আসে।

এখন, রাত্রে হাতি-শিকার বলতে গেলে একরকম অসম্ভব। অথচ এই কাজের দায়িত্বই শিকার বিভাগ আমার উপর দিয়েছে, আর বলেছে আমি যেন আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করি।

মুলুম্বেকে নিয়ে আমি দক্ষিণমুখো হয়ে লুঙ্গা-লুঙ্গায় গিয়ে পৌঁছলাম। গ্রামটা হল ভারত মহাসাগরের কাছে, মোম্বাসা থেকে মাইল পঞ্চাশ দক্ষিণে। একটা ছোট নদী গ্রামটার পাশ দিয়ে এঁকে বেঁকে বয়ে গেছে—নদীটার নাম উম্বা। নারকেল খেতের একদিকে এই নদী। নদীর তীরের উপর ঝুঁকে-পড়া নারকেল গাছগুলো অপূর্ব শোভা ধারণ করেছিল। কিন্তু আমি যখন গিয়ে পৌঁছলাম, অনেকগুলো গাছই হাতির কবলে নষ্ট হয়ে গেছে; খেতের চরম দুর্দশা। যেসব গাছ বহু বছর ধরে একটু একটু করে বড হয়ে উঠেছিল, সামান্য আগাছার মতই সেগুলো ছিন্ন হয়েছে, ভাঙা নারকেলের গুঁড়িতে আর পাতায় সমস্ত খেতটা সমাচ্ছন্ন।

হাতিদের পদচিহ্ন অনুসরণ করে আর তাদের অভ্যাস লক্ষ্য করে কিছুটা সময় কাটল। হাতিগুলো নওজোয়ান পুরুষ-হাতি, হস্তিনীদের প্রতি তাদের আকর্ষণ লক্ষ্য করে বড-বড হাতিরা তাদের দল থেকে তাডিয়ে দিয়েছে। এই বিতাড়িত হাতিরা একটা ক্লাব-মত করে একসঙ্গে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘোরে ফেরে, যতদিন না তারা মূল দলের বড়-বড় হাতিদের হারিয়ে দিয়ে হস্তিনীদের লাভ করার মত শক্তি সঞ্চয় করছে।

আমি জানতাম রাত্রে এই হাতিদের শিকার করার চেষ্টা ব্যর্থ হবে। তাই যতক্ষণ না আলো হচ্ছে ততক্ষণ ওদের খেতের মধ্যে আটকে রাখা দরকার। কাজটা শক্ত, কারণ সামান্যতম সাড়া পেলেই সমস্ত দলটা সবেগে গিয়ে টাঙ্গানাইকা সীমান্তের নিরাপত্তার মধ্যে পৌঁছে যাবে। অনেক ভেবে শেষ পর্যন্ত একটা মতলব ঠিক করলাম। যে খেতটা ওরা নষ্ট করছে, তার আয়তন লম্বায় পাঁচশো গজ আর চওড়ায় দুশো গজের বেশি হবে না। সঙ্গীদের বললাম খেতটার যেদিকে টাঙ্গানাইকা সেদিকটায় রাশি-রাশি শুকনো কাঠ এনে জড়ো করতে। খেতে আসবার সময় হাতিরা এই শুকনো কাঠ ডিঙিয়ে

আসবে, কিন্তু তারা ফেরবার আগে সেই শুকনো কাঠে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হবে। মনে হয় না তা আর তাহলে সেই জ্বলন্ত আগুনের বেড়া ডিঙিয়ে হাতিরা টাঙ্গানাইকায় ফিরে যেতে সাহস করবে। ভোর পর্যন্ত যদি ওদের আটকে রাখা সম্ভব হয়, তখন গুলি করে মারা কঠিন হবে না।

সন্ধ্যায় আমার কুটিরের দরজার সামনে বসে সান্ধ্য বাতাসে নারকেল গাছগুলোর দোল-খাওয়া লক্ষ্য করছি। মন চলে গেছে স্কটল্যাণ্ডে আমার ছেলেবেলার দিনে। কত নৈশ অভিযানের পরিকল্পনা তখন করতাম, হয়ত ফাঁদ পেতে খরগোস ধরব, কিংবা জালে পাখি আটকাব। আর এখন যা করছি সেও তো সেই একই ব্যাপার, তফাত কেবল এই যে এখন যা শিকার করছি তা আয়তনে অনেক বড। মশার অবিরাম গুন্-গুন্ শব্দ সহ্য করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত ঘরে ঢুকতে হল।

রাত প্রায় তিনটে নাগাত একজন স্থানীয় বাসিন্দার উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শুনলাম, আমার বন্দুক-বাহককে সে ডাকছে। সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে পড়লাম বিছানা থেকে। হাতিরা খেতে এসেছে, ধ্বংসলীলা শুরু করেছে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তৈরি হয়ে মুলুম্বে আর আমি লোকটির পিছু-পিছু চললাম। নিকষ কালো রাত, কিন্তু তবুও লোকটি এমন সহজে অগ্রসর হচ্ছিল, যেন দিনের আলোর মধ্যেই সে চলেছে। মুলুম্বে সহজেই তার পিছু পিছু চলল, কিন্তু আমি কেবলই হোঁচট খেতে খেতে চললাম, কেবলই ভয় হতে লাগল, এই বুঝি পা মচকে গেল।

হাতির পালটা রয়েছে উম্বা নদীর অপর পারে। নদীর গর্ভ বালিতে ভরা, তার উপর দিয়ে আমরা চলেছি। উম্বা নদীতে অসংখ্য কুমির, কিন্তু উত্তেজনার মাথায় সে কথা আমাদের মনে হল না। অপর পারে পৌঁছতে হাতির গাছপালা নষ্ট করার শব্দ স্পষ্টই কানে এল। এই সমস্ত শব্দ রাত্রে আরও বেশি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অন্ধকারের মধ্য থেকে স্থানীয় বাসিন্দাদের দল বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে, শিকারে যাবার জন্যে খুব ব্যস্ত তারা। কাঠের স্তূপ বরাবর ওদের ভাল করে সাজিয়ে দিলাম, তারপর যখন প্রস্তুত হল, সেই কাঠে ওদের আগুন দিতে নির্দেশ দিলাম।

শুকনো কাঠ পেট্রলের মত দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠল এবং মুহূর্তমধ্যে আগুনের একটা দেয়াল যেন খেতের দক্ষিণ দিক জুড়ে দু-দিকে যতদূর চোখ যায় সমস্ত লাইনটা ছেয়ে ফেলল! সে এক অপরূপ দৃশ্য! প্রায় কুড়িটা

হাতির একটা পাল আমাদের সামনে,—হঠাৎ এই আগুনের আবির্ভাবে তারা পাথরের মূর্তির মত স্থির দাঁড়িয়ে রয়েছে। অনেকের শুঁড় তখনও নারকেলের গুঁড়ি ভাঙবার ভঙ্গিতে উদ্যত। এই জ্বলন্ত অগ্নি-প্রাচীরের ধারে ধারে উলঙ্গ নিগ্রোরা নাচছে আর চেঁচাচ্ছে, আর জ্বলন্ত মশাল হাতে করে হাতিদের লক্ষ্য করে বলছে যে এবার তাদের প্রতিশোধ নেবার সময় হয়েছে। হাতিরা কোনরকম শব্দ করছে না ; হয়ত তারা ভাবছে কিভাবে এই আগুনের প্রাচীর অতিক্রম করে যেতে পারে।

হাতির দল অবশ্য ইচ্ছে করলে কেনিয়ার দিকে ফিরে গিয়ে তারপর অনেকটা ঘুর পথে আগুন এড়িয়ে টাঙ্গানাইকায় ফিরে যেতে পারত, কিন্তু আমার হিসেব এই ছিল যে সরাসরি তারা টাঙ্গানাইকায় ফেরার চেষ্টা করবে। দেখা গেল আমার হিসেব ভুল হয় নি। কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করার পর তারা আগুনের বেড়া ভেঙেই টাঙ্গানাইকায় ফিরে যেতে বদ্ধপরিকর হল। আমাদের আক্রমণ করল তারা।

সমস্ত শিকারটার চরম মুহূর্ত হল এই। কোন রকমে যদি ওরা আমাদেব পেরিয়ে ফিরে যেতে পারে, আর তাহলে কিছুই করা যাবে না। গুলি করতে সাহস হল না, কারণ এমনি আতঙ্কের মধ্যে আবার যদি ওরা গুলির শব্দ শোনে তো বিহ্বল হয়ে পড়ে এলোমেলো ছুটোছুটি করে আবার নতুন কোন পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে। মহৎ, মহৎ মুলুম্বে! একজনের হাত থেকে মশালটা ছিনিয়ে নিয়ে সে চিৎকার করে মশালধারীদের তার অনুসরণ করতে আদেশ দিল। বিপদকে কিছুমাত্র গ্রাহ্য না করে সে মশাল আস্ফালন করতে করতে আর তীক্ষ্ণস্বরে চিৎকার করতে করতে হাতির পালের দিকে ছুটতে শুরু করল। প্রথমটা একটু ইতস্তত করল, তারপর হাতিরা পিছু ফিরে খেতের দিকে চলল।

কী রুদ্ধশ্বাসেই না ভোরের প্রতীক্ষায় রইলাম! সময় যেন আর কাটতেই চায় না—এমন অবস্থা আমার আর কখনো হয়েছে কি না সন্দেহ। কেবলই সমুদ্রের দিকে তাকাচ্ছি, লক্ষ্য করছি কখন ভোরের আগের ধূসরতার আভাস পাই। শেষ পর্যন্ত ঘুঘুর ডাক শোনা গেল, তা থেকে বুঝলাম আর ভোর হতে দেরি নেই। এদিকে লোকজনেরা ক্লান্ত হয়ে পড়ছিল, তাদের উৎসাহ দিতে চেষ্টা করলাম। তখন তারা আগুনের উপর আরও কাঠ চাপালো, আবার তেমনি চিৎকার আর মশাল আস্ফালন শুরু করল।

সাড়ে পাঁচটা নাগাদ হাতিরা আবার একবার আগুনের প্রাচীর আক্রমণ করল। এবার তারা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে ছুটে গেল দু-দিক থেকে আগুনের দিকে। যন্ত্রণা উপেক্ষা করে নিগ্রোরা জ্বলন্ত আগুন থেকে জ্বলন্ত কাঠ তুলে তুলে এগিয়ে-আসা হাতিদের লক্ষ্য করে ছুড়তে শুরু করল। আবার ফিরল হাতিরা। একটা দলের উম্বার জলে ঝাঁপিয়ে পড়ার শব্দ শুনলাম, বোঝা গেল তারা নদীর উজান বেয়ে গিয়ে আগুন এড়াতে চায়। এ পরিস্থিতিও আমার অনুকূল বলতে হবে, কারণ জলের শব্দে তাদের অবস্থিতি আন্দাজ করা কঠিন হবে না।

ইতিমধ্যে আলো হয়েছে, পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। কয়েকটা ধূসর মূর্তি দেখলাম ধীরে ধীরে আমাদের বাঁদিকে চলেছে আর অপর দলটা অনেকটা দূর দিয়ে আগুন এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছে। নিশ্চয় ওরা এই ভেবেছে যে এভাবে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে আগুন-দেয়ালের দুই প্রান্ত আক্রমণ করলে একটা দল অন্তত এই দেয়াল পার হতে পারবে।

এবার হল আক্রমণের সময়। মুলুম্বেকে পাঠালাম ডান দিক দিয়ে গিয়ে উম্বার উপরের হাতিগুলোকে আক্রমণ করতে, আর আমি নিজে এক লাফে আগুনের দেয়াল ডিঙিয়ে দ্বিতীয় দলটাকে বাধা দিতে অগ্রসর হলাম। হাঁটতে কোন অসুবিধে হচ্ছিল না, কারণ গত রাত্রে হাতির পায়ের চাপে বন জঙ্গল সব সমান হয়ে গেছে। নিজেকে যথাসম্ভব আড়াল করে করে ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে চললাম। দেখলাম, সামনেই পাঁচটা হাতি—প্রায় চল্লিশ গজ দূরে। দুই নলের দুই গুলিতে সঙ্গে সঙ্গে দুটো হাতি পড়ে গেল। বন্দুকে আবার গুলি ভরছি, এমন সময় বাকি তিনটে হাতির একটা আমাকে দেখেই সঙ্গীদের ফেলে সঙ্গে সঙ্গে তেড়ে এল। দু-নলা বন্দুকের এইটেই মহা অসুবিধে। পুরোনো গুলি ফেলে নতুন গুলি ভরতে যেটুকু সময় লাগে তারই মধ্যে নির্ভর করে জীবন ও মৃত্যু। হাতিটার মাথাটা বড্ড বেশি কাছে এগিয়ে আসছে,—গুলি ভরে বন্দুকটা সমান করেই গুলি করলাম। সঙ্গে সঙ্গে পড়ে গেল হাতিটা, একটুও নড়ল না পর্যন্ত।

বাকি দুটো হাতি শুঁড় উচিয়ে দাঁড়িয়ে আমার ঘ্রাণ নেবার চেষ্টা করল, তারপর হঠাৎ ঘুরে উত্তর দিকে ধেয়ে চলল। আমি তাদের পিছু নিলাম। সামনে থেকে স্থানীয় বাসিন্দাদের চিৎকার শোনা যাচ্ছে। তারপর মুলুম্বের ম্যাগাজিন রাইফেলের শব্দ এল, আর তারপরই গুলি যথাস্থানে লাগার 'ক্লাপ'

করে শব্দ। বুঝলাম মুলুম্বেও অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে কাজে লেগে গেছে।

এদিকে স্থানীয় বাসিন্দাদের চিৎকার ক্রমেই বেড়ে চলেছে। হঠাৎ মনে হল, উত্তেজনার তো নয়, এ চিৎকার মহা আতঙ্কের চিৎকার। ছুটলাম শব্দ লক্ষ্য করে। গিয়ে যখন পৌঁছলাম, দেখলাম একটা হাতি একটা খুব বড় নিচু ছাদওয়ালা কুটিরে ধাক্কা দিয়ে চলেছে। হাতির পেছনদিকটা ছিল আমার দিকে ফেরানো, মাথা নিচু করে সে সমানে কুটিরে ধাক্কা মারছে। যে গাছের ছাল দিয়ে কুটির বোনা, আমার চোখের সামনে তা ছিঁড়ে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে ইঁদুরের মত মানুষজন ঘরের ফাটাফুটো দিয়ে বেরিয়ে পড়তে শুরু করল। চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল তারা। আমার গুলি হাতিটার কাঁধ ভেদ করে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সে ফিরে খেতের দিকে ছুটতে শুরু করল। তার শুঁড় বেয়ে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত পড়ছে। অর্ধেকটা পর্যন্ত যেতে না যেতেই সে আর্ত শব্দ করে পড়ে গেল। আমি তার কাছে গিয়ে পৌঁছবার আগেই তার মৃত্যু হয়েছে।

শেষবার যেখান থেকে মুলুম্বের গুলির আওয়াজ পেয়েছিলাম, গেলাম সেখানে। পথে চারটে মরা হাতি আমার চোখে পড়ল,—মুলুম্বের হাতে এরা মারা পড়েছে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই আমি মুলুম্বের কাছে গিয়ে পৌঁছলাম। আমায় দেখে সে দাঁত বার করে হেসে চারটে আঙুল তুলে দেখালো। অবশিষ্ট হাতিগুলো ইতিমধ্যে নারকেল-কুঞ্জের মধ্যে এসে জমায়েত হয়েছে। সন্তর্পণে আমরা অগ্রসর হলাম সেদিকে।

যে যেখানে ছিল সবাই চিৎকার করতে শুরু করেছে। হঠাৎ মুলুম্বে থেমে পড়ে ইঙ্গিতে জানিয়ে দিল যে হাতির দল আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। আমরা দাঁড়িয়ে থেকে তাদের অপেক্ষায় রইলাম।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই একপাল হাতি গাছপালার মধ্যে এসে উপস্থিত হল। দলে হাতি মাত্র চারটে। আমরা গুলি করতে শুরু করলাম। হাতিদের অগ্রগতি ব্যাহত হল, এলোমেলোভাবে তারা ঘুরতে ফিরতে লাগল। তিনটে হাতি আমরা মারলাম, আর বাকি হাতিটা কোনরকমে পালিয়ে নদীতে গিয়ে নামল। পরে বুঝেছিলাম সে নদীর তীরটা উঁচু হওয়ায় সে আমাদের এড়িয়ে টাঙ্গানাইকা এলাকায় পালিয়ে গেছে। আর সে কখনো এখানে উৎপাত করতে আসে নি।

সবশুদ্ধ মোট এগারোটা হাতি আমরা মেরেছিলাম। চমৎকার এদের দাঁত,—কোন দাগ বা কোনরকম কিছু দোষ তাতে ছিল না। হাতিগুলো

পূর্ণবয়স্ক না হওয়ায় তাদের দাঁত তেমন বড় ছিল না; প্রায় ত্রিশ পাউণ্ড করে ওজন এক-একটার।

ক্বচিৎ কখনো যখন কোন পুরুষ-হাতি পাগল হয়ে যায় তখন তাকে দুষ্ট আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে, দুষ্ট হাতি সম্বন্ধে যেসব কথা শোনা যায় তাতে কিন্তু আমার আপত্তি আছে, কারণ যেকোন হাতিই বছরের মধ্যে কিছুদিনের জন্যে পাগল হয়ে থাকে। তখন তাদের বলা হয়, মদমত্ত হাতি। সেই সময়ে সে অত্যন্ত নার্ভাস আর খিটখিটে হয়ে থাকে। তার মাথার দু-দিকে কানের কাছে দুটো ছোট-ছোট ছিদ্র থাকে, তা থেকে এই সময়ে কস্তুরির মত ঘন তরল পদার্থ নিঃসৃত হয়।

মদমত্ত হাতির তাড়া খেলে স্থানীয় লোকেরা তাকে দুষ্ট বলে থাকে। এ কিন্তু সত্যি নয়, কারণ এ অবস্থা কেটে যায়, আবার সে স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। সত্যিকার যে দুষ্ট হাতি সে চিরকালের জন্যেই দুষ্ট, সুতরাং এমন হাতির দেখা পেলে তক্ষুনি তাকে মেরে ফেলা উচিত।

আমার যা অভিজ্ঞতা তাতে বলতে পারি যে কোন কারণে আহত হলে তবেই হাতি দুষ্ট হয়,—সাধারণত কোন শিকারীর গুলিতে বা তীরে। এর মাত্র একটা ব্যতিক্রম আমার নজিরে আছে, সেক্ষেত্রে হাতিটা ছিল কোন স্বাভাবিক কারণে বিকলাঙ্গ।

১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দে আমি ওযাকাম্বাদের অনুরোধে একটা পুরুষ-হাতিকে মারতে গিয়েছিলাম। হাতিটা অনেক মানুষকে তাড়া করেছে, অনেক শস্যখেত ধ্বংস করেছে। সবাই তাকে এতই ভয় করত যে স্বয়ং শয়তান বলে তাকে অভিহিত করত; তাদের বিশ্বাস, নিশ্চয় কোন অপদেবতা তাকে ভর করেছে। এর প্রমাণস্বরূপ তারা বলত যে এর পায়ের ছাপ অতি অদ্ভুত, যে-কোন সাধারণ হাতির পায়ের ছাপের সঙ্গে প্রচুর এর পার্থক্য।

নাইরোবি থেকে ১৩০ মাইল দক্ষিণে চুনিয়া নদীর ধারে আমি হাতিটাকে মারতে গেলাম। খুব বোকার মত একাই গেলাম আমি, স্কাউটদের মুলুম্বের তত্ত্বাবধানে মাকিন্দু রিজার্ভে রেখে। ভেবেছিলাম এই শয়তান হাতি সাধারণ হাতির মতই হবে, তাকে মারতে বিশেষ অসুবিধে হবে না।

যে গ্রামে হাতিটা শেষবার অত্যাচার চালিয়েছিল সেখানে পৌঁছতে উদ্বিগ্ন গ্রামবাসিরা আমায় তার পায়ের ছাপ দেখিয়ে দিল। সত্যি, অদ্ভুত সে ছাপ। হাতি-শিকারের অভিজ্ঞতায় এমন অদ্ভুত ছাপ আর কখনো আমার চোখে

পড়েনি। এই অঙ্গবিকলনের জন্যেই হয়ত তাকে দল থেকে বিতাড়িত হয়ে বাধ্য হয়েই একা ঘুরতে হচ্ছিল।

হাতিটা একটা তরমুজের খেত নষ্ট করছিল। পিচ্ছিল তরমুজগুলো ধরবার একটা সহজ উপায় সে উদ্ভাবন করেছিল। শুঁড় দিয়ে ধরতে অসুবিধে হওয়ায় সে প্রথমে তার উপর পা দিয়ে সামান্য একটু চাপ দিত, ফলে তরমুজটা চ্যাপটা হয়ে যেতেই তখন আর তা শুঁড়ে করে তুলতে অসুবিধে হত না।

হাতি সাধারণত কোন একটা গ্রামে পর-পর দু-বার অত্যাচার চালায় না, কিন্তু অদ্ভুত আক্রোশ এই হাতিটার। সমস্ত খেত একেবারে ধ্বংস না করে সে গ্রাম ছেড়ে যায় না। গ্রামবাসিরা বললে, শয়তানটা অতি অবশ্যই রাত্রে আবার আসবে। ঠিক করলাম, আজই ওর সঙ্গে বোঝাপড়া করব।

আগেই বলেছি, রাত্রে গুলি চালানো বলতে গেলে একরকম অসম্ভব। কিন্তু বাধ্য হয়েই এক্ষেত্রে সে নিয়মের ব্যতিক্রম করতে হচ্ছে, কারণ যদি তাকে রাত্রে শেষ করতে পারি তাহলে আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওর পায়ের ছাপ অনুসরণ করে ঘুরতে হবে না, সকালবেলাতেই আবার মাকিন্দুর পথ ধরতে পারব। তাই ঠিক করে ফেললাম, রাত্রেই চেষ্টা করে দেখব।

আমার একটা পাঁচ ব্যাটারির টর্চ ছিল, একজন স্থানীয় বাসিন্দাকে সেটার ব্যবহার শিখিয়ে দিলাম। বলে দিলাম আমার ইঙ্গিত পেলেই হাতিটার উপর টর্চের আলো ফেলবে, আর আমি গুলি করব। এই বলে আমি বিশ্রামের জন্যে শুতে গেলাম, আর সারাদিনের ক্লান্তিতে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

ভাল করে ঘুমিয়েছি কি না সন্দেহ, হঠাৎ একজন গ্রামবাসী চেঁচাতে চেঁচাতে এসে খবর দিল, শয়তানটা ভুট্টাখেতে এসে পড়েছে। রাইফেলটা বাগিয়ে ধরে আমি চললাম, সঙ্গে চলল সেই অনুচর যার উপর টর্চ জ্বালাবার ভার। চারিদিকের কুটিরগুলো থেকে গ্রামবাসিদের উত্তেজিত কিচির মিচির কথাবার্তা কানে আসছে। তাদের কুটিরের দরজা বন্ধ করার আওয়াজ আমার কানে এল, যদিও সত্যি যদি হাতি তাদের কুটিরে হানা দেয় তো সেই পল্‌কা কুটির তাকে কিছুমাত্র বাধা দিতে পারবে না।

আতঙ্কিত বাসিন্দাদের গোলমাল ছাপিয়ে আর একটা শব্দ আমার কানে এল, এ হল হাতির চিবিয়ে খাওয়ার কচ-মচ শব্দ। রাইফেলের সেফটি ক্যাচটা সরিয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হলাম। নিবিড় অন্ধকার চারিদিক থেকে

আমাদের উপর চেপে বসছে বটে, কিন্তু আমি চলেছি চোখে না দেখে সামনের ভুট্টাখেতে হাতিটার খাওয়ার আওয়াজ অনুসরণ করে।

মাঠের শেষ প্রান্তে পৌঁছে আমরা এবার লম্বা লম্বা গাছগুলোর ভিতর দিয়ে এগিয়ে চললাম। সেগুলো এত ঘনসন্নিবদ্ধ যে জোর করে ঠেলে আমাদের পথ করে অগ্রসর হতে হচ্ছিল। কিছুক্ষণ চলার পর অন্ধকার আকাশের বুকে প্রকাণ্ড একটা বস্তুর আবছায়া আমার চোখে পড়ল। যথাসম্ভব নিঃশব্দে আমি সেদিক লক্ষ্য করে অগ্রসর হলাম।

হঠাৎ হাতিটার খাওয়ার শব্দ থেমে গেল। আমাদের চলার শব্দ তার কানে গিয়েছে, তাই সে শুনছে কান পেতে। বেশ আন্দাজ করতে পারছি হাতিটা নিস্তব্ধ দাঁড়িয়ে আছে, একটা ভুট্টার শিষ হয়ত তার মুখে। দু-কান বাইরের দিকে প্রসারিত, সামান্যতম শব্দও যাতে তার কান এড়িয়ে যেতে না পারে। ওর থেকে আমরা এখন মাত্র পনেরো গজ তফাতে। ছেলেটাকে ইঙ্গিত করলাম তার উপর টর্চের আলো ফেলতে।

কিন্তু বিকেলবেলার যা কিছু নির্দেশ সমস্তই দেখলাম সে ভুলে বসে আছে। নার্ভাস ছেলেটা টর্চটা একবার জ্বালতে লাগল আর একবার নিবোতে লাগল। আমাদের সঠিক অবস্থিতি সম্বন্ধে হাতিটার ধারণা ছিল না, কিন্তু এই হঠাৎ-আলোর ঝলকে আমরা তার কাছে ধরা পড়ে গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে সে ভুট্টাখেতের মধ্যে তুফান তুলে আমাদের আক্রমণ করে বসল। আতঙ্কে চিৎকার করতে করতে আমার লোকজন কে কোথায় দৌড় লাগালো। এক মুহূর্ত ইতস্তত করলাম আমি। চোখে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না, কেবল শুনতে পাচ্ছি হাতিটার সবেগে আমার দিকে ধেয়ে আসার আওয়াজ। পালানো ছাড়া আর কোন উপায় নেই, তাই প্রাণপণে দৌড় লাগালাম।

ভুট্টাখেতের ভিতর দিয়ে ছুটে চলেছি, প্রতি মুহূর্তে ভয় হচ্ছে এই বুঝি হাতিটা আমায় ধরে ফেলল। রাত্রিবেলা হাতির তাড়া খাওয়া অত্যন্ত অস্বস্তিকর, কারণ আমি তাকে দেখতে না পেলেও সে ঠিক আমার গন্ধ পাচ্ছে। ভুট্টাখেতের শেষ প্রান্তে পৌঁছে আমি একটু থেমে দাঁড়িয়ে কান পাতলাম। কোথাও কোন শব্দ নেই। চোরের মত তখন আমি আমার কুটিরে ফিরে গেলাম। এই লড়াইয়ের প্রথম রাউণ্ডের সম্মান হাতিটাকে দিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করলাম না।

হাতিটার মধ্যে যে সত্যি অলৌকিক ক্ষমতা আছে এবং যে ক্ষমতার কাছে

শ্বেতাঙ্গদের ওষুধ-রাইফেলও যে ব্যর্থ হতে পারে এ বিষয়ে যদিবা কারুর কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল, এই ঘটনার পরে তাও দূর হল। তবে, আশা করছি যে দিনের বেলায় যদি কখনো এ হাতির মুখোমুখি হতে পারি তো ওদের আমার ক্ষমতা দেখিয়ে দিতে পারব। হিল্‌ডার কাছে খবর পাঠালাম পত্রপাঠ মুলুম্বেকে পাঠিয়ে দিতে। সে এসে পৌছতেই আমরা হাতিটার অদ্ভুত পায়ের চিহ্ন লক্ষ্য করে অগ্রসর হলাম।

সারারাত ভরপেট ভুট্টা খাওয়ার পর হাতিটা আর খাওয়ার জন্যে থামেনি, সোজা খেত ভেঙে চলে গেছে। বুঝলাম বেশ খানিকটা পথ তার পিছু পিছু চলতে হবে। প্রথমটা তাকে অনুসরণ করে এগোতে অসুবিধে হয়নি, কারণ নরম মাটির উপর তার ভারি পায়ের ছাপ দেখা যাচ্ছিল স্পষ্ট। তা ছাড়া খানিকটা তফাতে তফাতে সে প্রচুর পরিমাণে মলত্যাগ করতে করতে গিয়েছিল। সেই মলের তাপ থেকে আন্দাজ করা যায় কতক্ষণ আগে সে এ স্থান ত্যাগ করেছে, আর মল নরম হলে বুঝতে হবে যে সে ভয় পেযে সাবধানে অগ্রসর হচ্ছে। যদি কোথাও খুব বেশি মল দেখা যায, তার অর্থ এই যে সেখানে সে অনেকক্ষণ বিশ্রামের জন্যে থেমেছিল, সুতরাং তার নাগাল পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। মলটায় কী বস্তু আছে তাও জানা থাকা দরকার, কারণ জীর্ণ হয়নি এমন খাদ্য যদি প্রচুর পরিমাণে সেই মলে থাকে তাহলে বুঝতে হবে সে নার্ভাস, সুতরাং শিকারীর এবার বিশেষ সাবধান হওয়া দরকার।

চিহ্ন ধরে অগ্রসর হবার সময় আমি কখনো অত্যন্ত বেশি আশা পোষণ করি, আবার কখনো বা চরম হতাশা বরণ করতে বাধ্য হই। এক্ষেত্রে আমার আশা হল যে যে-কোন মুহূর্তে হাতিটার খাওয়ার শব্দ শুনতে পাব বা ঝোপ ঝাড়ের ফাঁক দিয়ে তার বিরাট দেহের দেখা পাব, তখন তাকে গুলি করা কঠিন হবে না। তাই মনে হল, সেদিনই বিকেলে আমি মাকিন্দুতে ফিরতে পারব।

হঠাৎ একটা পাথরে ভরা শৈলশিরায় পৌছেই মুলুম্বে থমকে দাঁড়ালো, শিকারের গন্ধ ধরে এগিয়ে-যাওয়া কুকুর গন্ধের খেই হারিয়ে ফেললে যেভাবে থমকে থামে। শৈলশিরাটা জঙ্গল ছাড়িয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, কয়েকটা পাথর আর পাথরের নুড়ি বাদ দিলে কিছুই নেই সেখানে। এক-আধটা পাথরের নুড়ি হাতির পায়ে লেগে স্থানচ্যুত হয়েছে দেখলাম। আশ্চর্য মনে হয়

হাতির এই পাথরের নুড়ি মোটেও না নড়িয়ে তার উপর দিয়ে চলে যাওয়ার ব্যাপারে। শেষ পর্যন্ত আমরা শৈলশিরা পেরিয়ে গেলাম। অপর পারের আগাছার মধ্যে খানিকক্ষণ এদিক ওদিক করবার পর আবার হাতিটার পায়ের দাগ মিলল। কিন্তু এখানেও আমাদের অত্যন্ত ধীরে ধীরে চলতে হল, বুকে যেন আর তেমন আশা জাগছে না। পায়ের নিচে কাঁকরে ছাওয়া শক্ত মাটি, কোন চিহ্নই সেখানে ফুটে ওঠে না। সাপের মত পেটে ভর করে মুলুম্বে হয়ত কোথাও কোন ঝোপের মধ্যে একটা কোন চিহ্ন দেখতে পেল যা কখনোই আমার চোখে পড়ত না। হাতি ঝোপ ঠেলে চলে যেতেই আগাছাগুলো আবার ফিরে এসে যথাস্থানে দাঁড়িয়ে পড়ে, তা দেখে তখন কার সাধ্য বলে যে কোন জন্তু তার ভিতর দিয়ে চলে গেছে, বিশেষ করে এমন একটা জন্তু, প্রকাণ্ড একটা মোটর লরির মত যার আকৃতি!

কিছুক্ষণ আগে আমার মধ্যে যেমন প্রচুর আশা দেখা দিয়েছিল, তার জায়গায় এখন জাগল চরম হতাশা। আফ্রিকার জঙ্গলে হারিয়ে-যাওয়া কোন হাতিকে খুঁজে পাওয়ার আশা মনে হল দুরাশা মাত্র। মুলুম্বের পিছু-পিছু যন্ত্রের মত এগিয়ে চললাম, মনে হল, অতীতে তো কতবার হতাশ হতে হয়েছে, এই নিয়ে হয়ত সেই হতাশার সংখ্যা একটু বর্ধিত হল।

সানসেভিয়েরিয়ার একটা ঝোপের ভিতর দিয়ে অতি কষ্টে আমরা এগিয়ে চললাম। সাজ্ঘাতিক এই চারাগাছ, এর পাতার আগায় অত্যন্ত তীক্ষ্ণ কাঁটা থাকে, তা এমন শক্ত আর ধারালো যে তা দিয়ে গ্রামোফোনের পিনের কাজ পর্যন্ত চলে। চাষীরা অনেক সময় তাদের জমির সীমানায় এই গাছের বেড়া দিয়ে থাকে। এ ভেদ করে গরু ছাগল প্রবেশ করতে পারে না। অনেক গরু দেখলাম যার একটা চোখ কানা; এই ঝোপের অত্যন্ত বেশি কাছে চরতে গিয়ে এর কাঁটায় তাদের চোখ খোয়াতে হয়েছে। সুতরাং সেই গাছের ঝোপ ভেদ করে যেতে মানুষের যে কী কষ্ট হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। এখানে ওখানে কতকগুলো সাদা ছিবড়ে পড়ে রয়েছে দেখলাম, তা থেকে বুঝলাম যে আমাদের সামনে যে খেতটা রয়েছে হাতিটা সেটা অতিক্রম করে চলে গেছে।

তেমনি এগিয়ে চলতে চলতে খানিক পরে বন্য জন্তুর পায়ে-চলা একটা পথের মত আমাদের সামনে পড়ল। সেটা ধরে আমরা জঙ্গলে প্রবেশ করলাম। মুলুম্বে থেমে পড়ল, আর তার ইঙ্গিতে অনুসরণ করে সেই পরিচিত পায়ের ছাপ আবার আমার চোখে পড়ল।

'এবার ওকে পেয়েছি। চিহ্ন ধরে ধরে মুলুম্বে চলল আগে আগে, আর আমি সন্তর্পণে চারিদিকে তাকাতে তাকাতে চললাম, পাছে আচমকা তার সামনে গিয়ে পড়ি। কিছুক্ষণ পরে হাতিটার খেয়ে চলার পরিচিত শব্দ আমাদের কানে এল। ছোট-ছোট ডালপালা দিব্যি আরাম করে খেতে খেতে সে ঘুরছে ফিরছে, আর অপেক্ষা করছে কখন অন্ধকার হলে আবার সে সেই খেতে ফিরে যেতে পারবে। হাতির পেটের ভিতরের হজম হওয়ার শব্দও আমার কানে এল, ওর সজোরে প্রস্রাবের শব্দও শুনতে পেলাম স্পষ্ট।

চিহ্ন ধরে চলতে চলতে জঙ্গলের মধ্যে একটা অপেক্ষাকৃত ফাঁকা জায়গায় আমরা এসে পড়লাম। জঙ্গলের ওপারে আছে হাতিটা, তার দূরত্ব পঞ্চাশ গজের বেশি হবে না। উৎসাহের আতিশয্যে মুলুম্বেকে সরিয়ে প্রায় দৌড়তে দৌড়তে সেদিকে অগ্রসর হলাম।

হঠাৎ মুলুম্বে পেছন থেকে আমার জামা ধরে টানল। সঙ্গে সঙ্গে থেমে দাড়ালাম। কিন্তু কিছুই দেখতে বা শুনতে পেলাম না। একটা কান মাটির দিকে করে মুলুম্বে শব্দ গ্রহণের চেষ্টা করছে। বাতাসের চেয়ে মাটির তলা দিয়ে শব্দ ভাল চলে, তাই যদি সামান্য কোন শব্দও পেতে পারে এই আশায় মুলুম্বু এভাবে উৎকর্ণ হয়ে ছিল। খুব ঘন ঘন সে তার জিভ বার করছিল,—জঙ্গলের মধ্যে বিপদের সঙ্কেত এভাবেই জানানো হয়।

তারপরেই সামনের জঙ্গলের ফাঁকা জায়গাটার উপর একটা প্রকাণ্ড স্ত্রী-গণ্ডার দেখা গেল। কাদায় গড়াগড়ি খাওয়ার ফলে তার সারা শরীর কদমাক্ত, তার ভিজে খড়্গাদুটো অস্তসূর্যের অন্তিম আভায় ঝলমল করছে। সোজা সে এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে, কিন্তু আমাদের দেখতে পায়নি। হাতিটার খাওয়ার শব্দ শুনছিল সে, তার একটা কান সেদিকে ফেরানো ছিল। সে যে ভয় পেয়েছে তা নয়, হাতিটার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে এই পর্যন্ত।

মুলুম্বে না থাকলে আমি একেবারে সিধে গণ্ডারটার উপর গিয়ে পড়তাম। তা থেকে বেঁচে গেলাম বটে, কিন্তু ইতিমধ্যে আবার এক নতুন সমস্যা। যেখানে আমরা দাঁড়িয়ে আছি সেদিকে আসছে গণ্ডারটা, সুতরাং যদি তাকে গুলি করি তো সে আওয়াজে হাতিটা অতি অবশ্যই পালিয়ে যাবে, অথচ এও আমি চাই না যে গণ্ডারটা আমার খুব কাছে এসে পড়ুক। নাঃ, সত্যিই দেখছি কোন বনদেবতা শয়তানটার রক্ষার ভার নিয়েছে!

ক্রমেই এগিয়ে আসছে গণ্ডারটা, সেইভাবে হাতিটার খাওয়ার শব্দ শুনতে

শুনতে। শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম নিস্পন্দ। গণ্ডারটা এত কাছে এসে পড়েছে যে খুব সামান্য নড়াচড়া করলেও হয়ত সে আক্রমণ করে বসবে।

ঠিক করলাম, ও যদি আমার পাঁচ গজের মধ্যে এসে পড়ে তখন গুলি করব,—খানিকটা শুকনো ঘাস দেখে সে-জায়গাটার নিশানা ঠিক করলাম। তেমনি এগিয়ে আসছে গণ্ডারটা। এবার থামল একটু, কান পেতে শোনবার চেষ্টা করল যদি সে হাতিটার কোন সাড়া পায়। তারপর আবার তেমনি এগোতে লাগল।

স্কুলে পড়বার সময় একটা ভারি মজার ছেলেমানুষি খেলা আমরা খেলতাম। খেলাটা হল, পেছনের বেঞ্চে বসে কয়েকটা লাইন সামনের বেঞ্চের কোন ছেলের মাথার পেছনদিকটার উপর চিন্তাতরঙ্গ নিক্ষেপ করে তার মনোযোগ আকর্ষণ করে তাকে আমাদের দিকে ফেরানো। এবার আমার চেষ্টা হল, যদি গণ্ডারটার উপর চিন্তাতরঙ্গ নিক্ষেপ করে তাকে আমার দিক থেকে ফেরাতে পারি। কিন্তু মনে হল না আমার চিন্তাতরঙ্গ তার মধ্যে কিছুমাত্র রেখাপাত করতে পেরেছে। পাঁচ গজের নিশানা-করা জায়গাটা যখন আর মাত্র এক গজ বাকি, হঠাৎ সে মুখ ফিরিয়ে আমাদের ডান দিকের জঙ্গলে গিয়ে ঢুকল। মুলুস্বে একটা লম্বা স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করল।

এখন আর শয়তানটার আর আমাদের মধ্যে কোন বাধা নেই। ঝোপের দিকে এগিয়ে চললাম আমরা। ঐ দেখা যাচ্ছে হাতিটা, আমাদের থেকে প্রায় ত্রিশ গজ তফাতে; মাঝখানে কেবল একটা ঝোপের ব্যবধান। ঝোপটা ঘুরে অগ্রসর হলাম আমি। মাঝামাঝি পর্যন্ত যেতে হাতিটার খাওয়ার শব্দ বন্ধ হল; আমার সাড়া পেয়েছে সে। এহেন অবস্থায় বুদ্ধিমানের কাজ হল নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকা, কিন্তু তা আর আমার পক্ষে সম্ভব হল না। এ উত্তেজনা আর সহ্য করতে পারলাম না। তাড়াতাড়ি ঝোপটা পেরিয়ে গিয়ে দেখি, হাতিটা দাঁড়িয়ে আছে,—তার কান খাড়া, শুঁড় উদ্যত; চেষ্টা করছে যদি কোন রকমে আমার সাড়া পেতে পারে। গুলি করবার পক্ষে অত্যন্ত লোভনীয় সেই ভঙ্গি। আমি রাইফেলটা তুলে নিতেই সে পালাবার মতলব করল। মুহূর্তের মধ্যে তারদু-কান পেছিয়ে গিয়ে শরীরের সঙ্গে লেপ্টে গেল, এবং ফলে তার হৃৎপিণ্ডে গুলি করার সুবিধে হল, কারণ হাতির হৃৎপিণ্ডের অবস্থিতি হল তার কানের প্রান্ত যেখানে তার শরীর স্পর্শ করে তার চার ইঞ্চি নিচে। সঙ্গে সঙ্গে আমি রাইফেলের দুটো নলই খালি করে দিলাম।

গুলি করতেই হাতিটা এমনভাবে জঙ্গলের মধ্যে পালিয়ে গেল, যেন গুলি তার গায়ে লাগেই নি। সেইভাবে দাঁড়িয়ে আমি অপেক্ষা করে রইলাম, কারণ আমি জানি এবার কী হবে। পঞ্চাশ গজ যেতে-না-যেতেই হাতিটা হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল। বন্দুকে গুলি ভরে আমি সন্তর্পণে তার দিকে এগিয়ে গেলাম, কিন্তু আর গুলি করার দরকার হল না। মারা গেছে শয়তানটা।

হাতিটার দাঁতদুটো কিন্তু দেখা গেল কিছুই নয় বলতে গেলে। আধ মণের মত ওজন হবে এক একটার। তবে, তার অদ্ভুত পা-টা আমি রেখে দিয়েছিলাম, গ্রামবাসিরা যাতে বিশ্বাস করে যে সত্যিই তাদের শয়তানের মৃত্যু হয়েছে।

॥ ১৪ বন্দুক—মানুষ—আতঙ্ক

আমার ধারণা, হাতি বা মোষ বা গণ্ডার শিকারের সময় ৪৫০ নম্বরের চেয়ে হালকা বন্দুক ব্যবহার করা উচিত নয়। হালকা রাইফেল দিয়ে তেড়ে আসা জন্তুকে প্রতিহত করা যায় না। দক্ষিণ টাঙ্গানাইকায় শিকারের সময় একবার আমার এক হল্যাণ্ডদেশীয় শিকারীর সঙ্গে দেখা হয়, তাঁর নাম লেডিবুর। তাঁর খুব ইচ্ছে একটা আফ্রিকার হাতি শিকার করেন। ভদ্রলোক এসেছেন জাভা থেকে, এবং ভারতে থাকতে তিনি অনেক হাতি মেরেছিলেন। প্রচুর গর্বের সঙ্গে ভদ্রলোক তাঁর বন্দুকটা দেখালেন—৪০৫নং বন্দুক, এতে করে তিনি সিংহলে প্রচুর সাফল্য লাভ করেছেন।

আমি সরাসরি ভদ্রলোককে বললাম যে এ বন্দুক আফ্রিকার বড় জন্তু শিকারের যোগ্য নয়, এ বন্দুক নেহাত হালকা। সমস্ত আফ্রিকার জন্তুরই, এমনকি অ্যাণ্টেলোপের পর্যন্ত, জীবনীশক্তি অত্যন্ত বেশি। এমন অনেক মার তারা সহ্য করে থাকে, এশিয়া, ইউরোপ বা আমেরিকার জন্তু হলে যাতে সহজেই মারা মরত। কিন্তু কোন শিকারীকে শিকারের বিষয়ে কিছু বলে তার মত পালটানো একরকম অসম্ভব বললেই চলে। ভদ্রভাবেই সে উপদেশ শুনবে বটে, কিন্তু তবুও সে তার পুরোনো অভ্যাস অনুযায়ীই কাজ করে চলবে। তার স্থির ধারণা, ভারতে যখন সে তার ৪০৫নং বন্দুকে হাতিটা শিকার করেছে, তখন আফ্রিকার হাতিও সে ঐ বন্দুকেই শিকার করতে পারবে।

এর কয়েক সপ্তাহ পরে একদিন কিলোসা জেলায় ৎসেৎসে মাছি গবেষণা বিভাগের মিঃ মিলার আমার তাঁবুর কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর কাছে শুনলাম যে প্রথম যে হাতি তিনি শিকার করতে গিয়েছিলেন, তার হাতেই লেডিবুরের মৃত্যু হয়েছে। একপাল হাতি দেখে তিনি ভাল করে গুলি করবার জন্যে একটা উঁচু গাছে গিয়ে ওঠেন। একটা হাতি গুলি খেয়ে পড়ে যেতেই তিনি মহা আনন্দে তাড়াতাড়ি এগিয়ে যান তার দিকে। হাতিটা মরে নি, কেবল বেহুঁস হয়ে গিয়েছিল, কাছে আসতেই সে তাঁকে আক্রমণ করে। এর পর শুধু এইটুকুই মিঃ মিলার বলতে পারেন যে লেডিবুরের দেহাবশেষের যে অবস্থা তিনি দেখেছিলেন তাতে তাঁর মনে হয় না যে মরতে তাঁর কোন কষ্ট হয়েছে।

হাতির মানুষ মারার অনেক রকম উপায় আছে। কখনো পায়ে দলে মারে, কখনো বা শুঁড়ে করে তুলে একটা দাঁতের উপর গেঁথে মারে। কখনো বা শুঁড়ের এক আঘাতে তার মাথার ঘিলু উড়িয়ে দেয়। কোন হাতি একবার যে উপায়ে কোন মানুষকে মেরেছে, অন্য মানুষকেও সে সাধারণত সেই একই উপায়ে মেরে থাকে।

জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে সমস্ত রকম বিপদ সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বন করা সম্ভব নয় সত্যি, তাহলেও আমি বলব যে, উপযুক্ত অস্ত্র ব্যবহার করলে লেডিবুরের মত একজন অভিজ্ঞ শিকারী হয়ত আজ পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারতেন। প্রায়ই শিকারীদের বিবরণীতে পড়ি যে শক্তিশালী এক্সপ্রেস রাইফেলের দু-নলের গুলি খেয়েও তেড়ে আসা হাতি ক্ষান্ত হয় নি। এর উত্তরে আমি বলব যে হয় শিকারীর অস্ত্র অত্যন্ত হালকা, নয় তো গুলি ঠিক জায়গায় লাগে নি।

হাতি এতই বৃহদাকার যে তার শরীরে কয়েকটা মাত্র জায়গা আছে যেখানে খুব ভারি বন্দুকের গুলিতে সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু ঘটা সম্ভব। পুরোনো দিনের শিকারীরা হাতির কানের গর্তে কিংবা তার ঠিক উপরে গুলি করতেন। একপাল হাতি যখন নিঃশঙ্কভাবে খেয়ে চলেছে তখন এই কানের লক্ষ্যই সবচেয়ে সুবিধে, সন্দেহ নেই। এবং এর পরেই হল হৃৎপিণ্ড। হৃৎপিণ্ডে গুলি লাগলে কানে গুলি লাগার মত সঙ্গে সঙ্গে পড়ে না গেলেও সাধারণত একশো গজের মধ্যেই পড়ে যায় হাতিটা।

আমার প্রিয় জায়গা হল হাতির মাথার সামনের দিকের খুলি। সেখানে

গুলি গেলে হাতি হাঁটু গেড়ে পড়ে যায়। এই লক্ষ্য হয়ত এই কারণে আমার প্রিয় যে এভাবে আমি যথেষ্ট সাফল্যের সঙ্গে অনেক হাতি মেরেছি। হাতি যখন প্রায় দশ গজের মধ্যে এসে পড়ে, এ আঘাত তখন অত্যন্ত কার্যকরী, কারণ মাথার খুলি ভেঙে গুলিটা মগজে প্রবেশ করে সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু ঘটিয়ে থাকে। কিন্তু হাতি যখন দশ গজেরও কম তফাতে, মানুষ আর হাতির উচ্চতার বিরাট পার্থক্যের ফলে তখন মাথার খুলিতে গুলি করা কঠিন, এমনকি অনেক সময়ে অসম্ভব হয়ে ওঠে। বাধ্য হয়েই তখন শিকারীকে উপর দিকে গুলি করতে হয়। এবং গুলি কাত হয়ে মাথায় ঢোকার ফলে অনেক সময় মগজে প্রবেশ করে না। এহেন ক্ষেত্রে আর দ্বিতীয়বার গুলি করার সুযোগ পারতপক্ষে আসে না, কারণ হয় সে বিদ্যুৎগতিতে মুখ ফিরিয়ে দৌড়ে পালায়, কিংবা তার উল্টোটাও করে বসে, যখন যেমন তার মেজাজ।

একবার আমি একপাল হাতি শিকারের ভার নিয়েছিলাম। তখন অনাবৃষ্টি, হাতিরা গ্রামবাসিদের একটা জলাশয়ের কাছে এগোতে দিচ্ছিল না। ছুটো হাতির পিছু নিয়ে সন্তর্পণে অগ্রসর হচ্ছি, এমন সময় হঠাৎ কোথা থেকে আর একটা হাতি এসে হাজির—আমার থেকে মাত্র পাঁচ গজ তফাতে। যেন মাটি ফুঁড়ে উঠল হাতিটা। কটমট করে হাতিটা তাকিয়ে রইল আমার দিকে। এত কাছে থেকে মাথার খুলিতে গুলি করা সম্ভব নয়, অথচ কানে বা হৃৎপিণ্ডে গুলি করারও অবস্থা আর নেই। একমাত্র একটা উপায় তখন ছিল, তাই করলাম। ওর দু-চোখের মাঝামাঝি জায়গাটার ফুট-খানেক নিচে লক্ষ্য করে গুলি করলাম, গুলিটা শুঁড় ভেদ করে ওর মগজে গিয়ে ঢুকল। সঙ্গে সঙ্গে হাতিটা মারা পড়ল, আর এক পাও অগ্রসর হতে পারল না। এ আঘাতও অত্যন্ত মারাত্মক সন্দেহ নেই, কিন্তু পারতপক্ষে আমি এ চেষ্টা থেকে বিরত থাকতে পারলেই খুশি হব।

আর একবারের কথা মনে পড়ছে যখন আমি শুঁড়ে গুলি করে তেমন অমোঘ ফল পাই নি; নিতান্ত ভাগ্যক্রমেই আমি এ শিকার থেকে ফিরে আসতে পেরেছিলাম। কয়েকটা পুরুষ হাতি আলুর খেত নষ্ট করছিল, মুলুম্বে আর আমি তাদের চিহ্ন অনুসরণ করে চলেছিলাম। জঙ্গল ভেঙে এগিয়ে চলেছি, হঠাৎ সামনে থেকে একটা চাবুকের ঘায়ের মত শব্দ শোনা গেল। এ হল হাতির ডাল ভেঙে খাওয়ার শব্দ। অগ্রসর হলাম সেই শব্দ লক্ষ্য করে। কয়েক পা মাত্র এগিয়েছি, এমন সময় মুলুম্বে আমায় থামিয়ে ঠোঁট ফাঁক করে

ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিল। তার ইঙ্গিত অনুসরণ করে দেখলাম, মাত্র বারো ফুট দূরে একটা হাতি মড়ার মত পড়ে রয়েছে।

গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ছিল হাতিটা। অনেকে বলে হাতি কখনো শুয়ে ঘুমোয় না, এ কিন্তু ঠিক নয়। অনেকবার আমি হাতির পালের দেখা পেয়েছি, তারা পাশ ফিরে শুয়ে দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। তবে, এও জানি যে ঘুমন্ত হাতি চমকে গেলে অদ্ভুত তৎপরতার সঙ্গে লাফিয়ে উঠে পড়ে। আমি যেখানে ছিলাম সেখান থেকে কেবল তার পেছন দিকটা দেখা যায়, সুতরাং ভাল করে গুলি করতে হলে সেই ঘন জঙ্গল ভেঙে অনেকটা ঘুরে যেতে হবে। চললাম ধীরে ধীরে। সামনেই একটা ঘন ঝোপ। যত নিঃশব্দে সম্ভব এগোতে লাগলাম।

কিছুই শুনতে বা দেখতে পেলাম না। তারপরেই হঠাৎ যেন সমস্ত জঙ্গলের দেয়ালটা আমার উপর ভেঙে পড়ছে মনে হয়। সঙ্গে সঙ্গে মুখ তুলে তাকাতেই একটা গাছের ডাল আমার ডান চোখে এসে লাগল। প্রায় অন্ধ হয়ে গেছি, অসহ্য যন্ত্রণা,—সেই অবস্থায় দেখলাম একটা সরু, বাদামি রঙের বন্য ডালপালার ভিতর দিয়ে কিলবিল করতে করতে প্রকাণ্ড একটা সাপের মত এগিয়ে আসছে। শুঁড়ের মুখটা আমার থেকে আর এক ফুট তফাতেও নেই। অর্থাৎ লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠেই এত দ্রুত আর এমন নিঃশব্দে সে আমায় তাড়া করে এসেছিল যে আমি আভাসমাত্র পাবার আগেই কখন সে একেবারে আমার উপর এসে পড়েছে।

বন্দুক তোলার সময়টুকু পর্যন্ত আর তখন নেই। বন্দুকের মুখটা সেই শুঁড়ের দিকে ফিরিয়েই ঘোড়া টিপে দিলাম। ৫০০ নং গুলির ধাক্কায় আমার বুড়ো আঙুলের হাড় প্রায় সরে যাবার জোগাড়। তবে, গুলির আওয়াজে হাতিটা মুখ ঘোরালো, মহা শব্দে বনজঙ্গল ভেঙে দৌড় লাগালো সে।

আমার গুলি ব্যর্থ হয় নি। হাতির শুঁড়ের রক্ত ফিনকি দিয়ে এসে আমার বন্দুক আর জামা ভিজিয়ে দিয়েছে। গুলি করতে আর সামান্য দেরি হলেই নিঘাত সে আমায় ধরে ফেলত।

কিছুক্ষণ আর কিছুই করতে পারলাম না। চোখে অসম্ভব যন্ত্রণা হচ্ছিল, বসে পড়ে সেই চোখের সেবায় ব্যস্ত হলাম। যন্ত্রণা খানিকটা কমে এলে তখন ঠিক করলাম হাতিটার পিছু নেব, কারণ এভাবে নিশ্চিত মৃত্যুর কবল থেকে ফিরে আসার পর শিকারীর উচিত সে প্রাণীকে মেরে ফেলা, নতুবা হয়ত

শিকারীর নার্ভ একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে, আর তার শিকারে বেরোতে সাহস হবে না।

রক্তের দাগ লক্ষ্য করতে করতে আমি আর মুলুম্বে অগ্রসর হলাম। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আর তা দেখা গেল না। বুঝলাম অতি সামান্য আঘাতই সে পেয়েছে। জঙ্গলের সবচেয়ে নিবিড় অঞ্চল লক্ষ্য করে সমস্ত বাধা অতিক্রম করে চলেছে হাতিটা, যে গতিতে সে চলেছে সেভাবে চলা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। সন্ধ্যা হতে বাধ্য হয়েই আমাদের হাল ছেড়ে দিয়ে গ্রামে ফিরতে হল। পরদিন আবার গিয়ে তাকে গুলি করি।

কোন-কোন সার্থকনামা শিকারী সম্বন্ধে বলতে শুনেছি, ভয় কাকে বলে সে নাকি জানে না। এ কথা কিন্তু আমার সম্বন্ধে একেবারেই খাটে না, এবং আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে, কোন মানুষের সম্বন্ধেই খাটে কি না। কোন পেশাদার শিকারীর পক্ষে হিংস্র পশু শিকার অনুসরণ করা ব্যাপারটাই অত্যন্ত জটিল। গোটা বারো জিনিস তাকে সব সময়েই খেয়াল করতে হবে, যথা,—বাতাসের গতি, জঙ্গলের স্বরূপ, যে জন্তুর পিছু নেওয়া হচ্ছে তার বৈশিষ্ট্য, অ[illegible] তার নিজের ক্ষমতার পরিসীমা। সব সময়ে তার খেয়াল রাখা দরকার যে কোনরকম শব্দ না করে চলতে হবে, অর্থাৎ দেখে দেখে পা ফেলতে হবে, আবার সেইসঙ্গে জঙ্গলের দিকেও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে, নতুবা অতর্কিতে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা। সব সময়ে তাকে সেফটি ক্যাচ খুলে রাইফেল উদ্যত রাখতে হবে এবং সব সময়ে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে এমন অবস্থার উদ্ভব কখনো না হয় যখন বন্দুক পর্যন্ত তোলবার সুযোগ মিলল না। সত্যিকারের যে শিকারী, এই বুদ্ধির খেলা তার অত্যন্ত প্রিয়, তার জীবনের স্পন্দনই বলতে গেলে। কাজে যখন তার মন ডুবে যায়, ভয়ের কোন জায়গা আর তখন সেখানে থাকে না। শিকারে বেরোবার আগে যেসব হাজার রকমের খুঁটিনাটির ভাবনায় আর আলোচনায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটেছিল, তা এখন কাজে লাগাতে হবে, এবং বিভিন্ন ধরনের শিকারেও প্রতিবারই অবস্থা অনুযায়ী বিভিন্ন রকমের উপায় উদ্ভাবন করতে হবে। এইসব নতুন নতুন উদ্ভাবনার কার্যকরিতা পরীক্ষার উৎসাহে ভয়ের চিন্তা আর তার মনে স্থান পায় না।

হিংস্র প্রাণীর আক্রমণে পড়ে কখনো ভয় পেয়েছি বলে মনে পড়ে না। ব্যাপারটা এতই দ্রুত ঘটে যায় আর এতই সাঙ্ঘাতিক হয়ে ওঠে যে ভয় করার মত সময়ই আর তখন থাকে না। আমার মতে শিকারের সবচেয়ে ভয়ের

ব্যাপাব তখনই, যখন কোন হিংস্র প্রাণী আহত হয়ে জঙ্গলের আড়ালে লুকিয়ে পড়েছে। তখনই সেই প্রাণীর পিছু নেওয়া দরকার। চিহ্ন ধরে অগ্রসর হওয়া কঠিন নয়, অনেক সময় রক্তের দাগ ধরেও অগ্রসর হওয়া যায়। অগ্রসর হতে হতে হয়ত একটা দুর্ভেদ্য জঙ্গলের সম্মুখীন হতে হল। শিকাবী জানে যে এই জঙ্গলেব মধ্যেই কোথাও সেই আহত জন্তু তার অপেক্ষায় ওত পেতে বযেছে। অত্যন্ত অসুবিধে সেখানে, কখনো হযতো গুঁড়ি মেরেই অগ্রসর হতে হবে। এমনও হতে পাবে যে রাইফেল তুলে নেবার আগেই সে অতর্কিতে আক্রমণ কবে বসল। শিকারী তখন ইতস্তত কববে এক মুহূর্ত, তার মনে হবে, এব চেযে বর জন্তুব পিছু না নিযে ফিরে গেলেই ভাল হত। এইটিই হল চবম মুহূর্ত। জোব কবেই তখন শিকাবীকে এগিয়ে যেতে হবে। একবার জঙ্গলেব ভিতবে প্রবেশ করলেই আব তখন এ দ্বিধা থাকে না। শিকারী প্রস্তুত কবে নেয় নিজেকে, নতুন নতুন সমস্যার সমাধানে ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

মনে পড়ে একবার দক্ষিণ কেনিয়ায় দুটো হাতিব অত্যাচাব দমন কবতে যেতে হযেছিল। হাতিদুটো খেত খামাব ধ্বংস কবছিল। একটা হাতি বৃদ্ধ, অপবটা অল্পবযস্ক। প্রায়ই দেখা যায়, এক অভিজ্ঞ বয়স্ক পুরুষ-হাতির সঙ্গে এক অল্পবযস্ক পুরুষ হাতিব বন্ধুত্ব হযেছে। দল ছেড়ে এরা পৃথকভাবে ঘোরে ফেরে,—অল্পবয়স্ক হাতিব শক্তি আর সাহসের সঙ্গে বয়স্ক হাতির অভিজ্ঞতার মিশ্রণ ঘটে।

আগেকাব দিনেব বাসিন্দারা হাতিব এই অভ্যাসের কথা জানত। একসঙ্গে দুটো হাতিব পায়েব ছাপ দেখলেই তারা একটা লাঠি দিয়ে মাটিতে দাগ কাটতে কাটতে দৌড়ে গ্রামে ফিবে যেত, তাবপব ছুটত কোন শ্বেতাঙ্গ শিকারীকে খববটা দিতে। শিকারীও তাডাতডি সেই দাগ অনুসরণ করে অগ্রসর হত,—এই আশায় যে, বড হাতিটা, যার বয়স হবে প্রায় একশো বছবেব কাছাকাছি, নিশ্চয় একজোড়া অপূর্ব দাঁতের মালিক।

মুলুম্বেকে সঙ্গে কবে আমি গেলাম হাতিদুটো যেখানে চাষেব ক্ষতি করছিল সেই গ্রামে। গ্রামবাসিদের সঙ্গে কথা কয়ে আর আমার সন্দেহ রইল না যে হাতিদুটো অত্যন্ত চতুর। খেতে প্রবেশ কবাব আগে তারা বাতাসের গতি পরীক্ষা কবে, যেদিকে বাতাস বয়ে যাচ্ছে সেদিক দিয়ে অগ্রসর হয়। ভোর হবার খানিকটা আগেই তাবা চলে যায় খেত থেকে, আব দিনের বেলাটা কাটায় খুব ঘনসন্নিবদ্ধ কোন ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে। চিহ্ন ধরে অগ্রসর

হতে হতে বুঝলাম যে দিনের বেলার আশ্রয়ে যাবার সময়ও এরা আগে বাতাস পরীক্ষা করে দেখে, যেদিকে বাতাস বয়ে যায় সেদিক দিয়ে ঘুরে অতি সন্তর্পণে অগ্রসর হয়। এত সাবধানতার উদ্দেশ্য হল, অতর্কিত আক্রমণ এড়িয়ে চলা। এক বিস্তীর্ণ জলাভূমির মধ্যে ওদের আশ্রয়স্থল, প্রচুর কাঁটাঝোপ আর ঘন জঙ্গলের মধ্যে এবং ওখান থেকে খেতে যাবার সময়ও রোজ ঠিক একই পথে যায় না। এইসব সাবধানতা নিশ্চয় বৃদ্ধ হাতিটির মাথা থেকে আসে। অল্পবয়স্ক হাতিটি তার অনুগত ভৃত্য ছাড়া কিছু নয়।

দু-জন মানুষ স্বেচ্ছায় আমাদের পথপ্রদর্শক হয়ে চলল,—তাদের পেশা মধু সংগ্রহ করা। বনের প্রতিটি আনাচ কানাচ তাদের নখদর্পণে, সর্বত্রই তাদের স্বচ্ছন্দ গতি। কিন্তু আমার মুস্কিল হল এই যে আমি আনাড়ি গ্রামবাসিদের সঙ্গে শিকারে যাওয়া পছন্দ করি না। একটা ধারণা বদ্ধমূল আছে যে প্রত্যেক গ্রামবাসীই বনে চলাফেরার ব্যাপারে অত্যন্ত নিপুণ; এর থেকে ভুল ধারণা আর কিছু হতে পারে না। তাই সম্ভব হলে কেবলমাত্র আমার বন্দুক-বাহকের সঙ্গে শিকারে যাওয়াই আমার পছন্দ। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমায় বাধ্য হয়েই এই দুই মধু-সংগ্রাহককে সঙ্গে নিতে হল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই পায়ে-চলা গাছপালার মধ্যে হাতির পায়ের চিহ্ন দেখা গেল। নতুন পায়ের ছাপের মধ্যে একটা উত্তেজনা আছেই; শিকারী যতই পুরোনো হোক না কেন। এই বড়-বড় পায়ের ছাপ দেখলেই চোয়ালের মাংসপেশীগুলো শক্ত হয়ে ওঠে, পা বেয়ে শিহরণ উঠতে থাকে। ক্রমেই কাজে নামার সময় ঘনিয়ে আসে, উত্তেজনার আতিশয্যে চঞ্চল হয়ে উঠতে হয়।

ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর কাঁটা-ঝোপ অতিক্রম করে তবে আমাদের জলা অঞ্চলে পৌঁছনো সম্ভব হল। শিকারের উত্তেজনায় তখন আর এই কাঁটার কথা মনে হল না বটে,—কিন্তু এর বিষক্রিয়া শুরু হয় অনেক পরে। তখনকার মত জ্বর-জ্বর ভাব হয়, শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে। জলার কাছাকাছি আবার অসংখ্য মাছি,—নিঃশব্দে তারা মানুষের উপর এসে বসে, তারপরই তাদের রক্তচোষা লম্বা লম্বা শুঁড় ফুটিয়ে দেয়। মাছির নিরবচ্ছিন্ন উৎপাত আর কাঁটার জ্বর-জ্বর ভাবে অনেক সময় শিকারী অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে; হিসেব না করেই অগ্রসর হয়ে থাকে এবং অনেক সময় ওৎ পেতে থাকা জন্তুর আওতার মধ্যে পড়ে যায়। এক্ষেত্রে আমায় অনেকবার অতি কষ্টে নিজেকে সংযত রাখতে হয়েছিল।

এমন সময় সামনে থেকে একটা গাছের ডাল ভাঙার শব্দে আমরা গেলাম

সেদিকে। তাড়াতাড়ি রাইফেলগুলো পরীক্ষা করে নেওয়া হল। মুলুম্বের আর আমার হাতে ৫৭৫ দু-নম্বরের রাইফেল। এতে করে আর গুলি ওলট-পালট হবার সম্ভাবনা রইল না। বাকি সকলে আমাদের পেছনে রয়ে গেল। একজনের হাতে আমার হ্যাটটা দিয়ে দিলাম, কারণ আমি দেখলাম যে গাছের ডালে পাতায় ঘসা লেগে একটু শব্দ হচ্ছে। মুলুম্বে পরীক্ষা করে দেখল, বাতাস এলোমেলো। ঠিক করলাম খানিকটা ঘুরে আঁকাবাঁকাভাবে অগ্রসর হব।

হঠাৎ হাতিটার খাওয়ার শব্দ বন্ধ হয়ে গেল। সমস্ত বন একেবারে স্তব্ধ। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে চললাম মুলুম্বের পিছু পিছু। খানিকটা যাবার পর আমাদের ডান দিকে একটা প্রকাণ্ড বাদামি রঙের আকৃতি চোখে পড়ল। মুলুম্বের পিছু পিছু গেলাম, যেখান থেকে তার কানে গুলি করা যেতে পারে। কানের কয়েক ইঞ্চি সামনের দিকে লক্ষ্য করে গুলি করলাম। সঙ্গে সঙ্গে হাতিটা কাঠের মত পড়ে গেল। এটাই হল বুড়ো হাতিটা। ওর দাঁত আমি দেখতে পাইনি, আর তক্ষুনি যে গিয়ে দেখব তাও সম্ভব নয়; এখন আমায় প্রতীক্ষা করতে হবে কখন ছোট হাতিটাও নড়াচড়া করে তার উপস্থিতি প্রকাশ করে দেয়।

মুলুম্বে আমার পাশে নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে। কয়েক মিনিট কোথাও কোন শব্দই নেই। তারপর কানে এল ছোট হাতিটার এগিয়ে আসার আওয়াজ। গুলির শব্দ সে শুনেছিল, কিন্তু তার অর্থ বুঝতে পারেনি। সে আসছে তার সঙ্গীর খোঁজ করতে।

অনেক চেষ্টা করেও এগিয়ে আসা হাতিটার শরীরের এমন কোন জায়গা দেখতে পেলাম না যেখানে গুলি করলেই ও মরতে পারে; তাই অপেক্ষা করে রইলাম কখন সে আরও কাছে আসে। এমন সময় আমার পিছু-পিছু এগিয়ে-আসা সেই দু-জন মধু ব্যবসায়ী হঠাৎ হাতিটাকে দেখতে পেয়ে আনন্দে চিৎকার করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ছোট হাতিটা মুখ ফিরিয়ে দৌড়ে পালালো। যে মুহূর্তে হাতিটা মুখ ফিরিয়েছিল তৎক্ষণাৎ ওর কানে গুলি করব বলে রাইফেলটা তুলে নিয়েছিলাম, এবং এরই মধ্যে কোন রকমে গুলি ছুড়ে দিয়েছিলাম বটে, কিন্তু ঘোড়াটা টিপতেই সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হল যে গুলিটা একটু বেশি উঁচুতে হয়ে গেছে। গুলিটা লেগেছিল পলায়মান হাতিটার মাথার উপরের দিকে।

বলেছি বটে যে কোন ভাল শিকারী কখনো আহত জন্তুকে না মেরে ফেরে

না যদি তাকে মারবার সামান্যতম সুযোগও তার থাকে, কিন্তু ব্যাপারটা বলা যত সহজ কাজে পরিণত করা মোটেই তেমন সহজ নয়। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে গুঁড়ি মেরে যেতে যেতে যে চরম হতাশা শিকারীর উপর চেপে বসে তার সঙ্গে তুলনা করা চলে কেবলমাত্র বুকচাপা দুঃস্বপ্নের সেই বিভীষিকার, যখন মনে হয় কোন ভয়ঙ্করের সামনে থেকে এক্ষুনি পালিয়ে যাওয়া দরকার অথচ কিছুতেই তা সম্ভব হচ্ছে না। জামাকাপড় কাঁটায় আটকে যাচ্ছে, প্রতিটি কাঁটা আলাদা আলাদা করে ছড়িয়ে তবে আবার অগ্রসর হওয়া সম্ভব। পায়ে লতা জড়িয়ে যাচ্ছে, সেই অবস্থায় তাড়াতাড়ি করতে গেলেই মুখ থুবড়ে পড়ে যাবার সম্ভাবনা। চটচটে কাদায় পা বসে যাচ্ছে, একটা পা তুলতে না তুলতেই দেখা গেল অপর পা-টা আরো বেশি আটকে গেছে। মাছির পাল জ্যোতির্মণ্ডলের মত মাথার চারিদিকে ঘুরতে থাকে,—মুখে হুল ফোটায়, খাকির পোশাক ভেদ করে পর্যন্ত তার হুল চামড়া স্পর্শ করে। এক ঘণ্টা আগেও যে কাঁটা গায়ে ফুটছিল তার যন্ত্রণা এতক্ষণে অনুভূত হতে শুরু করেছে,—তার বিষে গা-বমি-বমি করে, মাথা ঘুরতে থাকে।

এ সমস্তর উপরে আছে আতঙ্ক,—আসন্ন মৃত্যুর পূর্বাভাস। জঙ্গলের মধ্যেই কোথাও লুকিয়ে আছে আহত হাতিটা। নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে আছে সে, শুঁড় তুলে বাতাস পরীক্ষা করছে,—উৎকর্ণ হয়ে আছে, খুব সামান্য কোন শব্দও যদি কোনরকমে পেতে পারে। বাতাস এড়িয়ে যে ঘুর পথে তার দিকে এগোবো তারও উপায় নেই, কারণ তারই চিহ্ন ধরে শিকারীকে অগ্রসর হতে হচ্ছে। নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকা জন্তুর একটা মস্ত সুবিধে এই যে শিকারীকেই আসতে হবে তার কাছে এগিয়ে।

নিশ্চল দাঁড়িয়ে সে প্রতীক্ষা করে, আর নিজেকে তৈরি করে রাখে। নিজে সে কোন শব্দ করে না, অথচ এগিয়ে আসা শিকারীর শব্দ সহজেই তার কানে আসে। শিকারীর সঠিক অবস্থিতিও সে জানে, অথচ শিকারী জানে না কোথায় সে।. তার পিছু নিয়ে যদি শিকারীর পাঁচ মাইল পথ অতিক্রম করতে হয়, তাহলে প্রতি পদক্ষেপের সঙ্গেই প্রচুর উৎকণ্ঠা সহ্য করতে হবে, কারণ জানে না সে অতর্কিত আক্রমণটা কখন কোন্ দিক থেকে তার উপর এসে পড়বে। সে তার সুবিধে বুঝে আক্রমণ করবে ; এইটুকুই শুধু শিকারীর জানা আছে যে আক্রমণটা আসবে এমনই সময়ে. যখন শিকারীর সে সম্বন্ধে কোনই আভাস মিলবে না।

এহেন সময় সমস্ত জঙ্গলে মৃত্যুর স্তব্ধতা নেমে আসে। সাধারণত এ সময়ে প্রচুর পাখির দেখা মেলে, গাছে গাছে বানর দোল খায়, ছোট ছোট জন্তু ঝোপ-ঝাড়ের ভিতর ঘোরে ফেরে। কিন্তু যতই আহত প্রাণীর নিকটবর্তী হওয়া যায়, সমস্ত শব্দই কমে আসে ক্রমশ। সমস্ত বন যেন তার আক্রমণের প্রতীক্ষায় থাকে। ক্রমে আর নিজের নিশ্বাসপাতের শব্দ আর পায়ের নিচে কাদার শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না। কেবলমাত্র নিজের দেহের ঘামের গন্ধ, ও বন্দুক-বাহকের দেহের তীব্র গন্ধ মাত্র তখন পাওয়া যায়, ব্যস, এ ছাড়া আর কিছু নয়।

ক্রমে আমাদের এমন ঘন জঙ্গলে প্রবেশ করতে হল যে উবুড় হয়ে পেটের উপব ভর করে তবে এগোনো সম্ভব হল। এ এক মহা অস্বস্তিকর পরিস্থিতি। সামনেব দিকে এক গজ দুব পর্যন্ত দৃষ্টি চলে না, এবং আক্রান্ত হলে বন্দুক পর্যন্ত তুলে নেবাব মত জায়গাবও এখানে অভাব। সামনে মুলুম্বেব পায়ের তলাটা কেবল দেখতে পাচ্ছি, তার পিছু-পিছু বুকে হেটে এগিয়ে চলেছি আর প্রতি মুহূর্তে প্রার্থনা কবছি, মুলুম্বে যেন ফাঁকা জায়গায় পৌছয় যেখানে সিধে হয়ে দাঁড়ানো সম্ভব হবে। এভাবে এগোতে এগোতে পেটের ভিতরটা কেমন যেন করছে। কল্পনায় দেখছি জঙ্গলেব মধ্যে কোথাও দাঁড়িয়ে থেকে সে আমাদের এগিযে আসার শব্দ শুনছে, প্রতীক্ষা কবছে কখন অবলীলাক্রমে এই দুর্ভেদ্য বন ভেঙে আমার উপর এসে পডবে। শেষ পর্যন্ত মনে হল, সেও বরং ভাল, ও তেড়েই আসুক,—এ উৎকণ্ঠা আব সহ্য কবা যায না।

শেষ পর্যন্ত দেখলাম মুলুম্বের কোনবকমে হামাগুডি দেবার অবস্থা হয়েছে। খানিকটা গিয়ে থেমে পডল সে। গুঁডি মেরে আমি তার কাছে গেলাম। কোন কথা সে কইছে না, তাব দৃষ্টি সামনেব দিকে নিবদ্ধ। ঐ তো হাতিটা আমাদের লক্ষ্য করছে। ও বুঝতে পারেনি যে আমরা ওকে দেখতে পেয়েছি, তাই ও অপেক্ষা করে আছে যতক্ষণ না আমরা ওর আরও কাছে গিয়ে পৌছই।

অত্যন্ত নিবিড একটা জঙ্গলের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে হাতিটা। গুলি করবার উপযুক্ত ভাল জায়গা দেখা গেল না। ভেবে পেলাম না কী যে করি। তেড়ে আসার প্রলোভন দেখালেই যে ও তেড়ে আসবে এমন কোন কথা নেই, বরং হয়ত পিছু হঠে আর-একটু ভাল জায়গায় গিয়ে দাঁড়াবে। দু-জনে দাঁড়িয়ে পরস্পরকে লক্ষ্য করছি, দু-জনেই প্রতীক্ষা করছি কখন অপর পক্ষ প্রথম নড়াচড়া করে।

এ সমস্যার সমাধান ঘটালো একটা মাছি। আমার গালে বসে এমন জোরে কামড়ালো যে সে যন্ত্রণা আমি সহ্য করতে পারলাম না, মাছিটাকে ফেলে দেবার জন্যে মাথা ঝাড়া দিলাম। ফলে সঙ্গে সঙ্গে হাতিটা আমায় তেড়ে এল। শিল্পীরা হাতির আক্রমণের যে ছবি আঁকেন তাতে তার দু-কান প্রসারিত থাকে, শুঁড় সামনের দিকে এগোনো থাকে। এ কিন্তু ঠিক নয়। আক্রমণের সময় হাতি তার কান পেছন দিকে মাথার সঙ্গে একেবারে লেপ্টে রাখে যাতে জঙ্গল ভেদ করে অগ্রসর হতে কোন অসুবিধে না হয়, আর শুঁড়টা মুড়ে রাখে বুকের কাছে, কারণ এই অবস্থায় সেটাকে ইচ্ছেমত ডাইনে বাঁয়ে যেমন খুশি চালানো যেতে পারে। রক্তজমানো চিৎকার করতে করতে হাতিটা তেড়ে আসছে। তার অবস্থিতি যদি আমার না জানা থাকত তাহলে এই চিৎকারেই আমি কয়েক মুহূর্তের জন্যে একেবারে অসাড় হয়ে পড়তাম এবং সেই কয়েক মুহূর্তই হাতির আমায় শেষ করার পক্ষে যথেষ্ট হত।

তখন আর লক্ষ্য স্থির করার সময় নেই। রাইফেলটা তুলেই অন্ধের মত তার ছোট-ছোট রক্তরাঙা দু চোখের মাঝখানটায় গুলি করলাম। গুলির ধাক্কায় সঙ্গে সঙ্গে সে টলতে টলতে পেছনে পড়ে গেল, তারপর সে সামলে ওঠবার আগেই আমি এগিয়ে গিয়ে রাইফেলের দ্বিতীয় গুলিটা তার কানে ছুড়লাম। এত কাছ থেকে এই ভারি গুলির ধাক্কায় তার মাথার খুলি থর থর করে কেঁপে উঠল। ক্রমে তার শরীর শিথিল হয়ে এল, তার নড়াচড়া বন্ধ হল।

কণ্ট্রোলের কাজে এবং গজদন্ত শিকারের সময়ে সবশুদ্ধ আমি এক হাজারেরও বেশি হাতি শিকার করেছি, এবং অনেকবার সামান্য একটুর জন্যে প্রাণে বেঁচে গেছি। কিন্তু হাতি শিকার করতে গিয়ে সবচেয়ে আশ্চর্যভাবে বেঁচে যাওয়ার যে নজির আমার আছে, সে হাতির কবল থেকে নয়, নেট্‌ল্ কাঁটার কবল থেকে।

তখন আমি মেরু জেলায় হাতির অত্যাচার দমনে নিযুক্ত। অনেকখানি অঞ্চল জুড়ে হাতিরা ছড়িয়ে রয়েছে। চারিদিকেই বড় বড় নেট্‌ল্ কাঁটার ঝোপ। এই নেট্‌ল্ কাঁটা আমি আগেও অনেক দেখেছি, সাধারণ কাঁটাঝোপ ছাড়া একে আর কিছু মনে করিনি। কিন্তু নেট্‌লের এত ঘন জঙ্গল আর কখনও দেখিনি। দিনের পর দিন এই সাঙ্ঘাতিক কাঁটা-বনে শিকার করতে গিয়ে আমায় ভয়ঙ্কর কাঁটার ঘা খেতে হয়েছে। প্রচুর স্বস্তি পেতাম যখন এমন

কোন এলাকায় গিয়ে পৌঁছতাম যেখানে ঝোপগুলো ভয়-পাওয়া হাতির পায়ের তলায় পড়ে সমান হয়ে গেছে।

একদিন সন্ধ্যায় শিকার সেরে তাঁবুতে ফিরেছি। সেদিন আমার খুব বেশি ঘুরতে হয়েছিল। ক্যাম্পের চেয়ারে ধূমপান করতে বসেছি, কিন্তু আমার এত শখের পাইপেও আজ মন ভরছে না। আমি দেখেছি, এ অবস্থাটা আমার কাছে বিপদের পূর্বাভাস সূচিত করে। এমনকি খাবার পর্যন্ত খেতে পারলাম না। যতই সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে, ক্রমে কেমন জ্বর জ্বর বোধ হচ্ছে। এত দুর্বল হয়ে পড়েছি যে ক্যাম্প খাটে গিয়ে যে শুয়ে পড়ব সেটুকু শক্তিও যেন আর অবশিষ্ট নেই। সকালবেলা বুঝলাম যে নেট্‌লের বিষ আমার দেহে তাদের ক্রিয়া শুরু করেছে। আমার তখন প্রায় ভুল বকার মত অবস্থা। জ্বরও খুব বেড়েছে।

বুঝতে পারছি এখন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমার কোন ডাক্তারের কাছে যাওয়া দরকার। তাঁবু সরঞ্জাম আর হাতির দাঁতগুলো ওদের দিয়ে লরিতে তোলালাম। ওদের বললাম লরিটার পেছনে গিয়ে উঠতে, কিন্তু ওরা রাজি হল না, বললে তার চেয়ে বরং তারা হেঁটেই যাবে। ওরা সিধে বলে দিল যে আমার তখন যা অবস্থা তাতে লরি চালাতে হলে যেকোন মুহূর্তে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা। অগত্যা আমি একাই লরি নিয়ে চললাম।

খাড়াই পাহাড়ি পথ ডিঙিয়ে, কাদা-মাখা ছোট ছোট ঝরনা পার হয়ে, সাঙ্ঘাতিক চোরাবালির উপর দিয়ে আমার পথ। এই পথের আশ পাশ দিয়ে কখনো বা অন্য পথও এসে আমার মধ্যে ধাঁধার সৃষ্টি করেছিল। কীভাবে যে আমি লরি নিয়ে ঐ পথ অতিক্রম করেছিলাম, সে চিরদিন একটা রহস্যই থেকে যাবে। এইটুকু শুধু বলতে পারি যে ঈশ্বর আমার সহায় ছিলেন। শেষ পর্যন্ত মেরু শহরে এসে পৌঁছে সোজা গেলাম সেখানকার একমাত্র হোটেল, দি পিগ অ্যাণ্ড হুইস্‌ল্‌-এ।

কোনরকমে লরি থেকে নামতেই হোটেলের মালিক মিঃ ফ্রেড ডেভি শুধু একবার আমার দিকে তাকালেন। সঙ্গে-সঙ্গে তিনি লোকজনদের চিৎকার করে বলে দিলেন একটা বিছানা ঠিক করে রাখতে। আমায় ধরে ধরে তিনি হোটেলের ভিতরে নিয়ে গেলেন। বিছানা। আহা, সে কী স্বস্তি। সঙ্গে সঙ্গে ফ্রেড হিল্‌ডাকে টেলিগ্রাম করে দিলেন. তাড়াতাড়ি আসুন, স্বামী ভয়ানক অসুস্থ। আসুন বড় গাড়ি করে, নাইরোবিতে নার্সিং হোমের ব্যবস্থা করে।

নাইরোবি ওখান থেকে দুশো মাইল, রাস্তা-ঘাটের অবস্থা খারাপ বলতে যা বোঝায় তার চেয়েও সাঙ্ঘাতিক। ফ্রেড বা আমি আশা করি নি যে হিল্‌ডা পরের দিন বিকেলের আগে এসে পৌঁছতে পারবে, কিন্তু সেইদিনই রাত বারোটার একটু পরেই হিল্‌ডা এসে উপস্থিত। 'নাইরোবিতে মাইয়া কারবেরি নার্সিং হোমে সে আমার জন্যে একটা ঘরের ব্যবস্থা করে এসেছে, গাড়ির পেছনে করে খুব নরম বিছানা বালিশ এনেছে, আর অতিরিক্ত একজন ড্রাইভার সঙ্গে এনেছে লরিটা নাইরোবি পর্যন্ত চালিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে।

অবশ্য এসব কথা আমি পরে শুনেছিলাম, কারণ হিল্‌ডা যখন এসেছিল আমার তখন চেতনা ছিল কি না সন্দেহ। তার গলার স্বর শুনতে পাচ্ছিলাম, কিন্তু তাকে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না। ফ্রেড ডেভি একজন ডাক্তার ডেকেছিলেন। তিনি বললেন আমার অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে চলেছে, যদি বাঁচাতে হয় তাহলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমায় নাইবোবিতে নিয়ে যাওয়া দরকার। দিন হতে না হতেই বেরিয়ে পড়লাম আমবা।

মাইয়া কারবেরি হোমে আমায় ডাঃ জেরাল্ড অ্যাণ্ডারসনের তত্ত্বাবধানে রাখা হল। আমায় দেখে প্রথম যে মন্তব্য তিনি করলেন তা মোটেই আশানুরূপ নয়: আব যদি কয়েক ঘণ্টা পরে হত তাহলে আব আমায় কোন মতেই বাঁচানো যেত না। এখনও যা অবস্থা তাতেও ছ-টা ঘণ্টা না গেলে তিনি সঠিক বলতে পারবেন না আমি বাঁচব কি না। হিল্‌ডা আমার বিছানার ধারে বসে সর্বক্ষণ প্রার্থনা করে চলেছে। আমাকে একেবারে বরফে ছেয়ে ফেলা হয়েছে আর জ্বর নামানোর জন্যে এম্ অ্যাণ্ড বি ৬৯৩ ইঞ্জেকশন দেওযা হচ্ছে। অধিকাংশ সময়টাই আমার অর্ধসচেতন অবস্থার মধ্যে কাটল। অনেক দূর থেকে যেন একটা অস্পষ্ট, খুশির আওয়াজ আমার কানে আসছে। কোন যন্ত্রণা নেই, কোন দুঃখ নেই, কোন অনুশোচনা নেই। কুশনে শোয়ার আরামে আমি যেন বায়ুমণ্ডলে ভেসে বেড়াচ্ছি। জানি আমি নিশ্চয় মরতে চলেছি, অথচ আমার একটুও ভয় করছে না।

দুটো দিন গেলে তারপর ডাক্তার বললেন যে আমার বিপদ কেটে গেছে। কিন্তু তার পরেও আমি সেই নার্সিং হোমে বেশ কয়েক সপ্তাহ রয়ে গেলাম। হিল্‌ডা প্রায় সর্বক্ষণই আমার কাছে কাছে রইল। শেষ পর্যন্ত আমার নাইরোবির উপকণ্ঠে আমাদের বাড়িতে ফিরে যাওয়ার অবস্থা হল। কিন্তু সেই সাঙ্ঘাতিক অবস্থা সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে তার পরেও আমার বহু মাস সময় লেগেছিল।

ভয়ঙ্কর জন্তুর ফোটোগ্রাফি

আজকাল হিংস্র পশু শিকারের বদলে হিংস্র পশুর ছবি তোলার দিকেই মানুষের নজর গিয়েছে বেশি।

আমার যৌবনে দেখেছি, ছবি যা তোলা হত সে শুধু মৃত পশুর। তাতে জীবজন্তুর ছবি তোলার কোন অসুবিধে ছিল না। শিকারী হয়ত কিছু শিকার করেছে, সেই শিকারের সঙ্গে সে পোজ করে দাঁড়াতো, আমার কাজ হত শুধু ছবিটা তুলে দেওয়া। আজকাল মানুষ জীবন্ত পশুর ছবি তুলতে চায়, কিন্তু পশুরা তাতে কোনরকম সহায়তা করে না। শ্বেতাঙ্গ শিকারীর তাই শিকারীর থেকে ফোটোগ্রাফারকে নিয়েই বেশি সমস্যা।

প্রথম প্রথম ফোটোগ্রাফি আর গুলি করা দুটো কাজ একসঙ্গে চলত। হয় ক্যামেরা না-হয় বন্দুক—এর একটা ব্যবহার করা চলবে, দুটোই নয়। দুটোর জন্যে প্রস্তুতিও বিভিন্ন রকমের। শিকারী চায় শিকারের স্মারক—আকাশের অবস্থা বা জন্তুটার পোজ নিয়ে তার কোন মাথাব্যথা নেই। কিন্তু ফোটো-গ্রাফারকে দেখতে হবে রোদ ঠিক জায়গায় আছে কি না, আর জন্তুটা যেখানে আছে সে জায়গাটা যথেষ্ট ফাঁকা কি না, যাতে সে ভাল করে ছবি তুলতে পারে। প্রথম যুগে ভাল স্মারক সংগ্রহের সঙ্গে ছবি তোলারও কদর ছিল এবং এইভাবেই আমি শিকার করে এসেছি। কে তখন ভেবেছিল যে এমন দিনও আসবে যখন নাইরোবি থেকে যত সাফারি চলেছে, তার অন্তত অর্ধেকগুলোর সঙ্গেই ক্যামেরা, বন্দুক নয়।

জীবজন্তুর ফোটো তোলা অনেক ক্ষেত্রেই তাদের গুলি করার চেয়ে অনেক বেশি কঠিন। গুলি করাটা এক মুহূর্তের কাজ, কিন্তু মনের মত ছবি তুলতে সময় লাগে প্রচুর। ছবি তুলতে আর কত সময় লাগে, কী করে জন্তুদের ততক্ষণ এক জায়গায় আটকে রাখা যায়,—এই চিন্তায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমায় মাথা ঘামাতে হয়েছে।

শিকারীরা যেমন সকলে চায় সিংহ শিকার করতে, ফোটোগ্রাফাররাও তেমনি সকলে চায় সিংহের ছবি তুলতে। সিংহকে আমি সর্বদাই প্রচুর সম্মানের আসন দিয়ে থাকি, কারণ তাকে আমি অত্যন্ত সাঙ্ঘাতিক প্রাণী বলেই মনে করি। প্রথমটা ভেবেছিলাম হয়ত সিংহের ছবি তোলা একরকম অসম্ভবই হয়ে উঠবে। তবে, সিংহের স্বভাবের সম্বন্ধে আমার জ্ঞানের সুযোগ নিয়ে

কয়েকটা কৌশল অবলম্বন করার পর দেখলাম, বেশ সহজেই তাদের ছবি তোলা সম্ভব।

আমার প্রথম ফোটোগ্রাফি সাফারি হল সেরেঙ্গেতির অঞ্চলে সিংহের ছবি তোলার। ইতিমধ্যে মোটর সাফারির চল হয়েছে, পায়ে হাঁটা সাফারি আর নেই বললেই চলে এবং এতে করে দীর্ঘ পথশ্রমের ক্লান্তি ঘুচে গেছে। যখনই কোন কারণে পথ দুর্গম হয়ে উঠেছে, ধার দিয়ে দিয়ে গিয়ে দেখেছি কোথায় খানিকটা সুগম পথ মিলতে পারে, কারণ মোটর গাড়ির পক্ষে কয়েক মাইল ঘুরে যাওয়া কিছুই নয়।

অনেক অসাফল্যের পর শেষ পর্যন্ত আমরা সিংহের ফোটো তোলাটাকে একটা খুব মামুলি ব্যাপার করে ফেললাম। যেভাবে তা সম্ভব হল তাতে সিংহ মনস্তত্বের একটা অভিনব অভিব্যক্তির পরিচয় মেলে; এ নিয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করছি।

সেরেঙ্গেতিতে সিংহের কোন অভাব নেই, দিনে পঞ্চাশটা সিংহের দেখা পাওয়াও একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার নয় সেখানে। রাজকীয় গাম্ভীর্যপূর্ণ বিরাট বিরাট কেশরী সিংহ থেকে শুরু করে বেড়ালছানার মত মায়ের পায়ে পায়ে ঘুরঘুর-করা ফোঁটাকাটা সিংহশাবক—কিছুরই অভাব নেই। এক পরিবারে গোটা-বারো সিংহকেও কখনো কোন আকাশিয়া গাছের ছায়ায় বসে থাকতে দেখা গেছে,—অপূর্ব সে দৃশ্য! কিন্তু ছবি তোলার জন্যে সেইসব সিংহকে ভুলিয়ে ভালিয়ে উজ্জ্বল রোদে আনা দরকার,—আর কিছু না হোক দাঁড করানো দরকার, যাতে লম্বা লম্বা ঘাসের আড়ালে ঢাকা না পড়ে যায়। এবং তা করা দরকার ওদের ভয় না পাইয়ে। সে এক মহা সমস্যা হয়ে দাঁড়াতো।

যে কৌশল আমরা অবলম্বন করতাম সে হচ্ছে এই। লরি করে যেতে যেতে হয়ত কোন ঝোপের পাশে একপাল সিংহের দেখা মিলল। তাদের পাশ দিয়ে লরি চালানো হবে,—পাশ দিয়ে, সোজা তাদের দিকে নয়, কারণ তাহলে হয়ত তারা ভয় পেয়ে যেতে পারে। ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে লরিটা সিংহের পাল আর জঙ্গলের মাঝামাঝি কোথাও থামানো হবে। এ না হলে সিংহেরা অস্বস্তি বোধ করবে, গা-ঢাকাই দেবে হয়ত। এভাবে ওদের পালানোর পথ বন্ধ হয়ে গেলে ওরা সেখানেই থেকে যাবে, অবশ্য যতক্ষণ না ওরা কোন কারণে ভয় পেয়ে যাচ্ছে।

তখনও কিন্তু আমরা ছবি তুলতে শুরু করব না। এসব-যা করা হচ্ছে এ কেবল ওদের বিশ্বাসভাজন হওয়ার উদ্দেশ্যে। কয়েক মিনিট ওরা একমনে আমাদের লক্ষ্য করবে এবং ওদের দেখে মনে হবে যেন খুব চিন্তা করছে। শেষ পর্যন্ত যখন দেখবে যে ভয়ের কিছু নেই, তখন ওরা নিরুৎসুকভাবে অন্য দিকে মুখ ফেরাবে। এই প্রথম রাউণ্ডের খেলায় আমাদের জয় হল। এবার আমরা সিংহদের ছেড়ে এগিয়ে গিয়ে হয়ত টোপ হিসেবে কোন অ্যান্টেলোপ মেরে আনব। লম্বা দড়িতে বেঁধে অ্যান্টেলোপটাকে লরির পেছনে হিঁচড়ে টেনে আনা হবে। তখন আমরা সিংহদের কাছে ফিরে যাব, লক্ষ্য রাখব যাতে আমাদের গন্ধ সিংহের কাছে পৌছয়। যথাসময়ে একজন গিয়ে টোপটা খুলে রেখে দেবে, আর আমরা চলে যাব সিংহেরা যেখানে আছে তার উল্টো দিকে ; সেখানে গিয়ে আমরা থেমে পড়ে ওদের প্রতীক্ষায় থাকব।

কয়েক মিনিট পরেই সিংহেরা টোপের গন্ধ পাবে। একে-একে উঠে আসবে তারা, নাক ফুলিয়ে বাতাসে গন্ধ নেবে। শেষ পর্যন্ত একটা সিংহ টোপটার দিকে এগিয়ে যাবে আর বাকি সকলে চলবে তার পিছু পিছু। প্রথম সিংহটা প্রথমে একটু চেখে দেখবে, বাকি সকলে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করবে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সমস্ত দলটা এসে টোপটার উপর পড়বে।

এই হল দ্বিতীয় রাউণ্ড। এবার একটু সাহস করা যেতে পারে। সিংহেরা যেখানে খেয়ে চলেছে, লরি নিয়ে আমরা ছবি তুলতে তুলতে ধীরে ধীরে সেদিকে অগ্রসর হব, আর যতই দেখব তারা আমাদের উপস্থিতিতে অভ্যস্ত হয়ে উঠছে ততই আরও ওদের কাছে এগিযে যাব।

সিংহ ফোটোগ্রাফির প্রথম দিকটায় মনে করা হত যে হাত বা পা লরির বাইরে রাখা নিরাপদ নয়। কথা কওয়া পর্যন্ত বারণ ছিল, কারণ নতুবা তৎক্ষণাৎ সিংহ পালিয়ে যাবে। মনে হয় লরির সঙ্গে যে মানুষের সম্বন্ধ থাকতে পারে এ তারা আন্দাজ করতে পারত না, লরিকে হয়ত একটা জন্তু বলেই মনে করত। লরি ওদের কাছে অভ্যস্ত হয়ে যেতে তখন আর এই সাবধানতারও দরকার হত না।

পরবর্তীকালে এও লক্ষ্য করেছি যে লরির পেছনে কোন দড়ি ঝুলতে দেখলে সিংহেরা লরির পিছু পিছু ছুটে এসে সেই দড়িটা নিয়ে খেলা করছে, বাড়ির বেড়াল যেমন দড়ি নিয়ে খেলা করে তেমনি। এতে করেও প্রায়ই ভারি মজার ব্যাপার হত।

এক-একটা সিংহের আবার এক-এক রকম ব্যবহার। একবার একপাল সিংহের ছবি তোলার সময় সেই পালের একটা কালো-কেশর সিংহের বদ মেজাজের পরিচয় পেয়েছিলাম। এই বৃদ্ধ সিংহ কেবলই তার সঙ্গীদের প্রচুর প্রহার করছিল আর ধমকাচ্ছিল। যেই আমরা তার ছবি তুলতে গেছি অমনি সে পাক খেয়ে লরির কাছে এসে ক্রুদ্ধ স্বরে এমনভাবে 'উফ' করে উঠল যে বাধ্য হয়েই আমাকে রাইফেলটা তুলে নিতে হল। তার একটা বৌই শেষ পর্যন্ত সামলে নিল তাকে। নারীসুলভ প্রবৃত্তিবশেই হয়ত সে বুঝতে পেরেছিল যে আমরা তাদের কোন ক্ষতি করতে আসিনি।

পাছে ওদের খাওয়ার ব্যাঘাত হয় তাই আর কোন গোলমাল না করে সে অ্যান্টেলোপটাকে ছেড়ে বুড়ো সিংহটার কাছে গিয়ে কি সব বলতে লাগল আর তার গায়ে গা ঘষতে লাগল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই বৃদ্ধ শান্ত হল, এবং সে যে খুশি হয়েছে, তা প্রকাশ করল প্রস্রাব করে। সিংহীও খুশি হয়ে তখন তাকে ছেড়ে আবার টোপটার কাছে ফিরে গেল।

সেই প্রথম পর্যায়ে খানিকটা মুস্কিল আর বিপদ এতে ছিল, আজ যদিও ব্যাপারটা ছেলেখেলায় পরিণত হয়েছে। গভর্মেন্ট যখন দেখলেন যে কেনিয়ায় সিংহের সংখ্যা কমে আসছে, কোন-কোন বিস্তীর্ণ এলাকায় তখন শিকার নিষিদ্ধ করে দিলেন। এইসব রিজার্ভের সিংহেরা আর মানুষকে দেখে কিছুমাত্র বিচলিত হয় না বা ভয় পায় না, কারণ তারা জানে এখানে তারা নিশ্চিন্ত। সিংহেরা অবস্থার সঙ্গে নিজেদের চমৎকার খাপ খাইয়ে নিতে পারে। যখন তারা দেখল যে মানুষেরা মাত্র কয়েকটা ছবির বিনিময়ে তাদের খাওয়াতে পর্যন্ত প্রস্তুত, তখন তারা ভরণ পোষণের জন্যে একরকম মানুষের উপরই নির্ভর করতে শুরু করল। কোন-কোন এলাকায় তো তারা ফোটোগ্রাফারদের উপরেই তাদের খাওয়ানোর ভার সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত।

কোন-কোন রিজার্ভে আবার তারা মানুষ দেখে দেখে এমনই অভ্যস্ত হয়ে পড়ে যে রাইফেলের শব্দে বরং আরো আকৃষ্ট হয়ে আসে, কারণ তারা জানে যে এই শব্দের অর্থই হল এই যে কোন ফোটোগ্রাফার তাদের জন্যে অ্যান্টেলোপ শিকার করেছে। লরি দেখলেই এরা খাবারের আশায় বড়-বড় কুকুরের মত সেই লরির পিছু-পিছু চলতে থাকে, আবার লরি থামলে লরির ছায়ায় এসে বসে। কাছাকাছি কোন জঙ্গলের আড়ালে যে চলে যাবে, সেটুকু কষ্টও তারা করতে রাজি নয়।

এতে করে ছবি তোলার কাজটা খুব সহজ হয়ে আসে। একবার এক ভদ্রলোকের কাছ থেকে কেবলগ্রাম পেলাম, তাঁর নিজের এরোপ্লেনে করে তিনি কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে কেনিয়ায় আসছেন,—সিংহের ছবি তোলাই তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য: আমার কাজ হল খানিকটা জায়গা পরিষ্কার করিয়ে ওদের নামবার ব্যবস্থা করে রাখা আর তাড়াতাড়ি যাতে সাফারিতে বেরোনো যেতে পারে সে ব্যবস্থা করা। কয়েকজন লোক সঙ্গে করে একটা লরি নিয়ে যথাস্থানে উপস্থিত হলাম, তারপর শুরু হল জঙ্গল পরিষ্কার করার কাজ। কাজ চলছে, হঠাৎ দেখি আটটা সিংহী আর চমৎকার একটা সিংহ আমাদের পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলে যাচ্ছে। এরোপ্লেন আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই এসে পড়বে, তাই ঠিক করলাম এমন একটা জিনিস করে রাখব যাতে ওঁদের চমকে উঠতে হবে। লরি নিয়ে কয়েকশো গজ গিয়ে একটা জন্তু মেরে সেটাকে লরিতে বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে এলাম পরিষ্কার-করা জায়গাটার কাছে। সঙ্গে সঙ্গে সিংহেরা এসে সেটা দখল করে বসল। এরোপ্লেনটা যখন এসে নামল, সিংহদের ভোজ তখন সবে শেষ হয়েছে। এরোপ্লেন দেখে ভয় পাওয়া তো দূরের কথা, আস্তে আস্তে সিংহেরা সেটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো, যেন জিজ্ঞাসা করতে চায়, 'আমাদের জন্যে আরও মাংস এনেছ তো?' আগন্তুকরা ভেবেছিলেন অনেক কষ্ট করে তবে সিংহের দেখা মিলবে, তাই এরোপ্লেনের প্রবেশ-পথের কাছে দাঁড়িয়ে সিংহদের দিকে এমনভাবে তাকিয়ে রইলেন, যেন নিজেদের চোখকেও ঠিক বিশ্বাস করতে পারছেন না। ব্যাপারটা দেখে আমার ভারি মজা লাগছিল, কারণ আমি জানি এই ঘটনাটা ওঁদের বহু বছর ধরেই ডিনারের কাহিনীর খোরাক জোগাবে।

স্থানীয় বাসিন্দারা সিংহকে এতই ভয় করে যে সে যে এমন পোষ মানতে পারে একথা বিশ্বাস করাই তাদের পক্ষে শক্ত হয়ে ওঠে। এমনও পর্যন্ত দেখা গেছে যে ছবি তোলার জন্যে টোপ সাজাচ্ছি আর এমন সময়ে একপাল সিংহ হাজির হয়েছে; যত বন্ধুভাবেই তারা আসুক না কেন তাদের দেখামাত্র যত কুলি সবাই লরি থেকে খরগোসের মত ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় লাগিয়েছে। কোন প্রাণীকে দৌড়োতে দেখলেই যেকোন মাংসাশী জন্তু তার পশ্চাদ্ধাবন করে থাকে, এমনকি পোষা কুকুর পর্যন্ত কাউকে দৌড়তে দেখলে তার পিছু ধাওয়া করে। কিন্তু এই সিংহগুলো তাদের আহার ছাড়া আর কিছু বোঝে না। স্থানীয় লোকদের বলতে শুনেছি যে সিংহেরা খায় কেবল কালো মানুষকে;

সাদা মানুষকে তারা খায় না। সিংহদের এই আশ্চর্য ব্যবহারের এই অর্থই তারা করে থাকে।

অনেকে আবার কেবলমাত্র ছবি তুলেই সন্তুষ্ট হন না, বড় বড় জন্তুদের আওয়াজও তাঁরা রেকর্ড করতে আসেন। একবার আমি এক দম্পতিকে নিয়ে গিয়েছিলাম,—সিংহের আওয়াজ রেকর্ড করার ব্যাপারে তাঁদের প্রচুর উৎসাহ। অধুনাতম সাজসরঞ্জাম সঙ্গে করে তাঁরা এসেছেন। একটা জেব্রা মেরে আমি টোপ হিসেবে রেখে দিলাম আর ভদ্রলোক তাঁর মাইক্রোফোনটা সেই টোপের কাছে রেখে এলেন। আমাদের আশা হল, খাবার সময় সিংহ যেসব শব্দ করে নিশ্চয় সে সমস্তই এই যন্ত্রে ধরা পড়বে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই অপূর্ব একপাল সিংহ এসে হাজির। এসেই ওরা খাওয়া শুরু করল। আমাদের মধ্যে প্রচুর আশা জন্মালো। এক বয়স্ক সিংহী সেই দলে ছিল, দেখলাম দলের সকলেই তাকে ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছে। বৃদ্ধা মহিলা খেপে গেল শেষ পর্যন্ত। চারিদিকে তাকাতে তাকাতে মাইক্রোফোনটা তার চোখে পড়ল, ভাবল সে, নিশ্চয় এ কোন খাসা খাদ্যই হবে। তাই সেখানে গিয়ে সে মাইকটা মুখে নিয়ে দিব্যি চিবোতে শুরু করল। ভদ্রলোক তো রেগে টং! তাঁর সমস্ত ব্যবস্থা এভাবে পণ্ড হতে বসেছে! খুব লম্ফঝম্ফ করে হাত পা ছুড়ে তিনি চেষ্টা করলেন যাতে সিংহী চলে যায়। এই করতে গিয়ে আবার কখন তাঁর টুপিটাই গেল পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে সিংহী মাইক ছেড়ে এক লাফে এসে টুপিটা পাকড়াও করল। এই একটিমাত্র টুপিই ভদ্রলোক সঙ্গে এনেছিলেন, তাই যখন দেখলেন তাঁর চোখের সামনেই সিংহী সেটাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলছে, তখন তাঁর যা মুখের ভাব হল সে এক দেখবার জিনিস। আমি আর থাকতে পারলাম না, হাসিতে ফেটে পড়লাম। তারপর ভদ্রলোক যে একপ্রস্থ গালাগাল শুরু করলেন তা শুনে তাঁর গৃহিণী বেচারী তো মহা অপ্রস্তুত।

একদিক দিয়ে ফোটোগ্রাফারের সঙ্গে শিকারীর প্রচুর মিল আছে। যত ভাল স্মারক-চিহ্নই মিলুক, শিকারী যেমন তার চেয়েও ভাল একটা সংগ্রহ করতে চায়, ফোটোগ্রাফারেরও সেই একই অবস্থা। যত ভাল ছবিই সে তুলুক, তার চেয়েও রোমহর্ষক কোন ছবি না তুলতে পারলে তার শান্তি নেই। এবং এজন্যে সে যে-কোন কষ্ট সহ্য করতে প্রস্তুত। একটা দল নিয়ে আমি একবার গিয়েছিলাম, তাদের ঝোঁক হল যত রকম ভঙ্গিতে সম্ভব সিংহের ছবি তুলবে।

সপ্তাহের পর সপ্তাহ তারা এই ব্যাপারে মেতে রইল। সিংহের টোপ খাওয়ার, কাঁটাগাছের নিচে বিশ্রাম করার আর লরির পিছু পিছু চলার ছবি তোলার পরও ওদের তৃপ্তি হল না। আরও অনেক ভঙ্গিতে ওদের ছবি তোলবার ইচ্ছে। আমার যত কৌশল ছিল সমস্ত প্রয়োগ করলাম। একটা অ্যাণ্টেলোপ মেরে একটা গাছের ডালে ঝুলিয়ে দিলাম যাতে তা থেকে খেতে গিয়ে সিংহকে লাফাতে হয়। একটা মরা জন্তু লরিতে বেঁধে টেনে নিয়ে যাবার ব্যবস্থাও হল, যাতে সিংহ গন্ধ পেয়ে ক্যামেরার পাশাপাশি চলে ফোটোগ্রাফারকে বিভিন্ন ভঙ্গিতে ছবি তোলার সুযোগ দেয়। কিন্তু এ সমস্ত তো আগেই হয়ে গেছে, আমার ফোটোগ্রাফাররা এমন কিছু করতে চায় যা আগে কেউ কখনো করেনি। শেষ পর্যন্ত একটা চমৎকার মতলব একজনের মাথায় খেলে গেল।

'আচ্ছা, সিংহ আর মানুষ একসঙ্গে খেতে বসেছে এমন ছবি তোলা যায় না? চমৎকার হয় কিন্তু! কেউ সে চেষ্টা করে দেখেনি।' বললে সে।

ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা হয়ে গেল। একটা টেবিলে কাপড় বিছিয়ে ফুলে সাজানো হল, চেয়ারও সাজানো হল। খাদ্য হল নিরামিষ সালাড, ফল আর বিয়ার। একটা জেব্রা মেরে সেটাকে টেবিলের কাছে রাখা হল। এমনভাবে টোপটাকে বেঁধে রাখার ব্যবস্থা হল যাতে সেটাকে টেনে ক্যামেরার ফোকাসের বাইরে নিয়ে যেতে না পারে। তিনজন ক্যামেরাম্যান তৈরি হয়ে রইল, বাকি সকলে খেতে বসল টেবিলে।

সিংহদের মনোযোগ আকর্ষণ করবার জন্যে কয়েকবার বন্দুকের আওয়াজ করলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই একপাল সিংহ তাড়াতাড়ি এসে হাজির। সঙ্গে সঙ্গে তারা জেব্রাটার উপর পড়ল। এদিকে ক্যামেরাগুলো তাদের কাজ শুরু করেছে,—তাদের শব্দ শোনা যাচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দারা সাদা পোশাক পরে কাঁপতে কাঁপতে খাবার পরিবেশন করছে, প্রচুর বকশিসের লোভ দেখাতে তবে তারা সাহসে বুক বেঁধে এ কাজে রাজি হয়েছে। মাত্র কয়েক গজের ব্যবধানে এই দুই প্রকারের খানাপিনা চলতে লাগল। সিংহেরা আমাদের কোন তোয়াক্কাই করল না,—খাওয়ায় যখন কোন বাধা পড়ছে না তখন আর কী!

আফ্রিকার সিংহের ছবি তোলা আজকাল এই পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। অতীতে একদিন ছিল যখন সিংহশিকারের জন্যে প্রয়োজন ছিল স্থির মস্তিষ্ক; নির্ভুল নিশানা; নতুবা শিকারীকে আর জঙ্গল থেকে জীবন্ত ফিরে আসতে হত না।

অন্যান্য বড় জন্তুর ছবি তোলাও যে তাই বলে খুব সহজ তা কিন্তু নয়, কারণ ফোটোগ্রাফারদের চাহিদা কেবলই জীবজন্তুর স্বাভাবিক চলাফেরার ছবি তোলা। অনেক ফোটোগ্রাফারকে আমি সঙ্গে নিয়ে গেছি,—মুখে তারা যাই বলুক না কেন, ইচ্ছে তাদের প্রায় সকলেরই জন্তুর আক্রমণের ছবি তোলা। আমায় ভাড়া করবার সময় হয়ত খুব গম্ভীরভাবে বললে, 'শোন হাণ্টার, একটা কথা তোমায় পরিষ্কার করে বলছি। বনের পশুকে মারা আমার ইচ্ছে নয়। আমি চাই ছবি তুলতে। উঁহু! এ সাফরিতে গুলিগোলা ছোড়া একেবারেই নয়।'

কিছুক্ষণ দিব্যি চলে। ওর প্রথম গণ্ডাবের, প্রথম মোষের, প্রথম হাতির দেখা মেলে, সিনেমা ক্যামেরায় হাজার হাজার ফুট ছবি তোলা হয়। কিন্তু তারপরই আবার ও অস্থির হয়ে ওঠে। একটু নাটকীয় ছবি না হলে যেন জুত হচ্ছে না। একটু ইতস্তত কবে শেষ পর্যন্ত সে বলে, 'আচ্ছা হাণ্টার, গণ্ডারটা তেড়ে আসছে এমন একটা ছবি তোলা যায় না?'

আমি বলি, 'তা কেন যাবে না, সহজেই সে ব্যবস্থা করা যায়। কিন্তু সেক্ষেত্রে আমায় তাকে গুলি কবে মারতে হবে।'

ওর মুখে ইতস্তত ভাব ফুটে ওঠে। ওর জীবজন্তু প্রীতির মধ্যে কোন প্রতারণা নেই। কিন্তু ওর কল্পনার পর্দায় ছবিটা ফুটে উঠেছে—একটা গণ্ডার একেবারে ক্যামেবাব কাছ লক্ষ্য করে ছুটে আসছে! ওঃ সে কী উত্তেজনা! বন্ধুরা কী আশ্চর্যই না হবে, বলবে কী সাঙ্ঘাতিক তার নার্ভ, বন্য গণ্ডাবের আক্রমণের ছবি সামনে দাঁড়িয়ে তুলেছে! শেষ পর্যন্ত আর সে ঠিক থাকতে পারে না। বলে ওঠে, একবাব, মাত্র একবারের জন্যে, তার ছবির প্রয়োজনে একটা গণ্ডাবকে না হয় মাবাই হোক!

আক্রমণের ছবির মধ্যে সবচেয়ে বেশি চাহিদা গণ্ডারের আক্রমণের। হাতিদের মেজাজ বেজায় অনিশ্চিত, আর মোষের আক্রমণ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। গণ্ডারের বেলায় কিন্তু সুবিধে এই, যে তার আক্রমণও মারাত্মক হলেও ছবি ওঠে চমৎকার, আর তা সামলানোও মোটামুটি সহজ। কিভাবে গণ্ডারের ছবি তোলা হয় বলছি।

লরি নিয়ে ঘুরতে ঘুবতে হয়ত কোথাও একটা গণ্ডারের দেখা মিলল। গণ্ডারটা খেয়ে চলেছে। ফোটোগ্রাফার ক্যামেরা বার করে আলোটা দেখে নেয়, ফিলটার ঠিক করে, আর আমি বন্দুক বাগিয়ে তৈরি হয়ে থাকি।

এবার কাজ হল গণ্ডার আর জঙ্গলের মাঝামাঝি গিয়ে দাঁড়ানো, কারণ

ভয় পেলেই সে জঙ্গলে ঢুকতে চাইবে। ব্যবস্থা-মত কাজ হলে ফোটোগ্রাফার ক্যামেরা ফোকাস করে। গণ্ডার খাওয়া ছেড়ে মুখ তুলে তাকায়, দেখে ব্যাপারটা কী হচ্ছে। সাধারণত সে এগিয়ে আসে ভাল করে দেখার জন্যে। এ সময়ে চিৎকার করে বা হাত-পা ছুড়ে তাকে ভয় পাইয়ে দেওয়া সহজ, কিন্তু আমরা চাই তার আক্রমণের ছবি তুলতে। অপেক্ষা করি যতক্ষণ না সে থেমে পড়ে আমাদের দিকে তাকাচ্ছে। তারপর আমি আমার শরীরটা আস্তে আস্তে দোলাই ডাইনে বাঁয়ে। কী অজ্ঞাত কারণে জানি না, গণ্ডাররা কোন হঠাৎ-নড়াচড়া বা জোরে চিৎকার শুনলে ভয়ে পালায়, কিন্তু সামান্য নড়াচড়া দেখলেই আর তাড়া না করে থাকতে পারে না।

সঙ্গে সঙ্গে তার মাথা নিচু হয়ে যায়, সবেগে সে আমাদের লক্ষ্য করে তেড়ে আসে, আর ক্যামেরার কাছাকাছি হতেই শেষ পর্যন্ত আমার গুলিতে মারা পড়ে। জোরালো ৫০০নং জেফ্রি রাইফেলের গুলিতে আমার তাকে থামাতে কোন অসুবিধে হয় না। পরে ফোটোগ্রাফার আমায় বলেছে, 'বন্য জন্তু মারা আমার স্বভাব-বিরুদ্ধ, কিন্তু এক্ষেত্রে সে যেভাবে তেড়ে এসেছিল তাতে তাকে না মেরে আর উপায় কী বল!'

গণ্ডারের কী মতলব তা নির্ভুলভাবে আন্দাজ করা যায় তার ল্যাজের অবস্থান থেকে। ল্যাজ যদি সিধে উঁচু হয়ে থাকে তাহলে বুঝতে হবে সে ভয় পেয়েছে, পালাবার চেষ্টায় আছে। আক্রমণ করার সময় তার ল্যাজ নেমে আসে। যদি দেখি তার ল্যাজ উঁচু হচ্ছে, ফিস্-ফিস্ করে ফোটোগ্রাফারকে বলে দিই যেন সে কোন রকম নড়াচড়া না করে, যতক্ষণ না গণ্ডারটাকে মারমুখো করে তোলা যাচ্ছে।

অবশ্য এ সমস্তই যে গণ্ডারের প্রতি অবিচার, তাতে সন্দেহ নেই। তাই যখনই কোন ফোটোগ্রাফার বলে গণ্ডারের আক্রমণের ছবি তুলব, আমি বলি, তাহলে আগে থাকতে গুলি করার লাইসেন্স করে নিতে হবে। তাহলেই তার যেমন ভাবে ইচ্ছে দুটো গণ্ডার মারার অধিকার হবে।

এক বছর আমি ওয়াল্টার সাইক্স্ নামে এক অল্পবয়স্ক আমেরিকানকে গণ্ডারের ছবি তোলার জন্যে নিয়ে যাই। মাত্র ষোল বছর তার বয়স, ফোটো তোলার ব্যাপারে অফুরন্ত তার উৎসাহ। গণ্ডারের আক্রমণের যত ছবি তোলা হয়েছে তাদের মধ্যে আমার মনে হয় তার ছবিগুলোই সবার সেরা। সেরা হওয়ার কারণ, মাত্র একটি দিনের মধ্যে ছ-ছ-বার আমরা গণ্ডারের তাড়া

খেয়েছিলাম, এবং প্রতিবারেই গণ্ডার নিজে থেকেই তাড়া করেছিল, কোন প্ররোচনার প্রয়োজন হয়নি। ওয়াল্টারের সাহসের কথা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। একান্ত চরম মুহূর্তেও আমি আর কাউকে দেখিনি ওর মত শান্ত ভাব বজায় রাখতে।

যে দিনের কথা বলছি—একটা স্মরণীয় দিন সেটা—আমরা ইয়াইদায় তাঁবু ফেলেছি। ইতিমধ্যেই ওয়াল্টারের অনেকগুলো গণ্ডারের ফোটো তোলা হয়ে গেছে, কিন্তু আরও অনেক চাই তার। এই কথা হল যে কোন গণ্ডারকে প্ররোচনা করা হবে না, এবং তা সত্ত্বেও যদি কোন গণ্ডার আমাদের তেড়ে আসে তো আমি গুলি না করে চেষ্টা করব যাতে সে পাশ কাটিয়ে চলে যায়।

কাঁটা গাছে ভরা একটা সমতল ভূমির উপর দিয়ে লরি চালিয়ে চলেছি, এমন সময় একটা পুরুষ-গণ্ডার চোখে পড়ল,—চরে বেড়াচ্ছিল সে। গাড়ি থামিয়ে আমরা সন্তর্পণে তার দিকে অগ্রসর হলাম, লক্ষ্য রাখলাম যাতে বাতাসে আমাদের গন্ধ ওঠে কাছে না যায়। গণ্ডারটা তেমনি খেয়ে চলেছে, তার চিবোনোর শব্দ শোনা যাচ্ছে সুস্পষ্ট। ওয়াল্টার কামেরা তুলে যেই ছবি তুলতে শুরু করেছে, সঙ্গে সঙ্গে গণ্ডারটা তাকে আক্রমণ করল।

যখন গণ্ডারটা প্রায় আমাদের কুড়ি গজের মধ্যে এসে পড়েছে, আমি চিৎকার করে উঠলাম যাতে সে অন্যদিকে ফিরে যায়। আমি পারতপক্ষে চাই না কোন ভয়ঙ্কর জন্তু আমার কুড়ি গজের মধ্যে এসে পড়ে, কারণ তার থেকেও কাছে এসে পড়লে সে গুলি খেলেও চলার গতিতেই একেবারে শিকারীর উপর এসে পড়ে, যদি না গুলি সম্পূর্ণ নির্ভুল হয়। চিৎকার শুনে গণ্ডারটা রাগবি খেলার নিপুণ ফরোয়ার্ডের মত শরীরটা বেঁকিয়ে আমাদের ডান পাশ কাটিয়ে চলে গেল। এ দেখে ওয়াল্টার মন্তব্য করল, 'আমি তো বিশ্বাসই করতে পারতাম না যে গণ্ডাররা এত তাড়াতাড়ি ফিরতে পারে!' যেসব লোকেরা বলে যে গণ্ডার তেড়ে এলে তার পথ ছেড়ে লাফিয়ে সরে গেলেই হল, তারা এ দৃশ্য দেখলে ভাল করত।

আমি জানি না ইয়াইদার গণ্ডারদের এত আক্রোশের কারণ কী, কারণ এর পরেও আরও পাঁচবার আমাদের এমনি গণ্ডারের তাড়া খেতে হয়েছিল। একবার তো আমার গুলি এক গণ্ডারের মুখের এপাশ থেকে ঢুকে ওপাশ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল—আমার বন্দুকবাহক আর আমার মাঝখান দিয়ে তীরের মত বেরিয়ে যাচ্ছিল সে। এই অভিজ্ঞতার পর আমি ক্ষান্ত হতে চাইলাম, কিন্তু ওয়াল্টারের

এখনও তৃপ্তি হয় নি, আরও একটা ছবি তার চাই। তাই, অনেক বেলা হয়ে গেলেও আমরা আবার গণ্ডারের খোঁজে বেরোলাম।

এবার আমরা একটা উপত্যকার দিকে চললাম যেটাকে বলা যেতে পারে গণ্ডারের আড্ডা, কারণ অসংখ্য গণ্ডার সেখানে। একটা স্ত্রী-গণ্ডার দেখা গেল একটা আকাশিয়া গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে ওয়াণ্টার তার ছবি তুলতে শুরু করল। দেখলাম গণ্ডারটা ছটফট করতে শুরু করেছে, যেকোন মুহূর্তে সে আক্রমণ করে বসবে। বন্দুক-বাহক ঠোঁটের ইঙ্গিতে ডাইনে আর বাঁয়ে আরও দুটো গণ্ডার আমায় দেখিয়ে দিল। বিপরীত দিক থেকে আরও দুটো গণ্ডার আমাদের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

একসঙ্গে তিন দিক দিয়ে গণ্ডার আক্রমণ করবে—এজন্যে আমি মোটেই প্রস্তুত নই। আমি ওয়াণ্টারের কাঁধে হাত দিয়ে ইসারা করতেই আমরা যত দ্রুত সম্ভব সামনের দিকে মুখ রেখে পিছু হঠতে শুরু করলাম। হঠাৎ বৃদ্ধা স্ত্রী-গণ্ডারটা আমাদের তেড়ে এল।

যেখান থেকে সে আমাদের তাড়া করেছিল তার দূরত্ব আমাদের থেকে সাতচল্লিশ গজ—আমি পরে মেপে দেখেছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে ক্যামেরা তুলে নিয়ে ওয়াণ্টার ছবি তুলতে শুরু করল, আর আমি বন্দুক বাগিয়ে তার জন্যে প্রস্তুত হয়ে রইলাম। চিৎকার করে উঠলাম, তবুও সে তেমনি এগিয়ে আসছে। বন্দুক-বাহকও চিৎকার করে উঠল, তবুও গণ্ডারটা ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করে তেমনি ছুটে আসতে লাগল। ক্যামেরা থেকে চোখ না সরিয়েই ওয়াণ্টার আস্তে আস্তে বললে, 'গুলি করবেন, যখন আমি বলব, 'গুলি করুন'।

এহেন সময়ে শ্বেতাঙ্গ শিকারীর অবশ্য কর্তব্য মক্কেলের তার প্রতি যে বিশ্বাস আছে নিজেকে সেই বিশ্বাসের উপযুক্ত করে তোলা। আমি যে আমার প্রথম গুলিতেই গণ্ডারটাকে মেরে ফেলতে পারব এতে ওয়াণ্টারের কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না। গণ্ডারটা এগিয়ে আসছে, আমিও তার জন্যে প্রস্তুত হয়ে রয়েছি। এহেন পরিস্থিতিতে মুহূর্তের পর মুহূর্ত যেন বিদ্যুৎ-চমকের মত চলে যেতে থাকে। গণ্ডারের খুরের শব্দ ক্রমেই জোর হয়ে উঠছে। তার মাথা নিচু হয়ে রয়েছে, ঢুঁ মেরে শূন্যে ছিটকে ফেলার পক্ষে নিখুঁত সে ভঙ্গি। ওয়াণ্টারের তবুও এতটুকু সরবার নামটি নেই, সমানে সে ছবি তুলে চলেছে। যখন সে কুড়ি গজের মধ্যে এসে পড়েছে, আমি বন্দুক বাগিয়ে ওয়াণ্টারের নির্দেশের অপেক্ষায় রইলাম। কিন্তু ওয়াণ্টারের মুখে কথা নেই। গণ্ডারটা আসছে—

আসছে—আর পনেরো গজও হবে না। আর দেরি করতে পারলাম না, বন্দুকের ঘোড়ার উপর আমার আঙুলটা চেপে বসল। ঠিক সেই মুহূর্তে শোনা গেল—'গুলি করুন!' ওর চিৎকার আর গুলির শব্দ প্রায় একসঙ্গে হল। ভারি দোনলা বন্দুকটা গর্জন করে উঠল। আসতে আসতেই মরে গেল গণ্ডারটা,—গুলিটা তার কানের নিচে আর চোখের মাঝামাঝি জায়গায় লেগেছে। সঙ্গে সঙ্গে সে সম্পূর্ণ নিস্পন্দ হয়ে সশব্দে পড়ে গেল। ওয়াল্টারের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেলেও সে বিশেষ ঘাবড়ায় নি; ধীর কণ্ঠে বললে, 'দেখলাম বটে আপনার শিকার করা, স্যর!'

আফ্রিকায় যারা শিকার করেছে তাদের মধ্যে মনে হয় না ওয়াল্টারের মত এতগুলো গণ্ডারের আক্রমণ প্রত্যক্ষ করা তাদের কারুর পক্ষে সম্ভব হয়েছে। এ সম্মানের যোগ্য বলেও আমার ওয়াল্টারের চেয়ে বেশি কাউকে মনে হয় না। যেমন সে দুঃসাহসিক, যেমনি সত্যকার শিকারী বলতে যা বোঝায় তাই।

একটা ধারণা জনসাধারণের মধ্যে আছে, সেটা হল এই যে ভয়ঙ্কর জন্তুর ছবি তোলার মধ্যে একটা নির্মল আনন্দ আছে, রাইফেলের গুলিতে হত্যা করার মত নিষ্ঠুরতা এর মধ্যে নেই। কার্যক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যায় যে এ দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য সামান্যই, কারণ সত্যিকার প্রথম শ্রেণীর ছবি তুলতে হলে গণ্ডার হোক, মোষ হোক বা হাতি হোক সে আক্রমণ করবেই শেষ পর্যন্ত, এবং তখন তাকে হত্যা করতেই হবে। অথচ এই সহজ কথাটা ফোটোগ্রাফাররা ভেবে দেখেন না। তাদের ধারণা, বুঝি বদমেজাজী হস্তিনী আর তার বাচ্চা ফোটোগ্রাফারের কোন খারাপ মতলব নেই বুঝতে পেরে তাকে অসংখ্য ছবি তুলতে দেবে। আসলে কিন্তু এমনটি ক্বচিৎ কখনো ঘটে থাকে। দু-একবার সাবধানী ডাক ডাকবার পরও যদি হস্তিনী দেখে তবুও মানুষটা সঙ্গে-সঙ্গে সরে যাচ্ছে না, তখন আর সে কোন দয়া মায়া করে না।

সিনে ক্যামেরার একঘেয়ে শব্দে আর সাধারণ বড় ক্যামেরার হঠাৎ-ক্লিক শব্দে বনের জন্তু যেমন খেপে যায় এমন খ্যাপা আর কিছুতে খেপে না। হাতিকে আক্রমণে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে হলে একটা ভারি ক্যামেরা তার দিকে ফিরিয়ে শব্দ করাই হল সবচেয়ে সহজ পন্থা। এ শব্দের ফলে কত আক্রমণ যে সূচিত হয়েছে তার সংখ্যা নেই। কোন হাতির ছবি তুলতে হলে সবার আগে তাই আমি ক্যামেরাম্যানদের এই নির্দেশ দিই, যেন আমি বলা-মাত্র সঙ্গে সঙ্গে তাদের ক্যামেরা বন্ধ করে সরে যায়। প্রথমটায় সকলে ভাল

মনেই রাজি হয়। এর পরেই হয়ত জঙ্গল ভেঙে অনেক সন্ধানের পর সন্ধান চলে, মনে হয় সবাই যেন ক্যামেরার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেছে। হয়ত হাতি রয়েছে নিবিড় বনের অন্তরালে, হয়ত বা দেখা গেল জন্তুটার পেছন দিকটা ক্যামেরার দিকে ফেরানো। এমন সময় হয়ত একটা মস্ত পুরুষ-হাতি ভয় পেয়ে হঠাৎ জঙ্গল থেকে বেরিয়ে একেবারে রোদে মাখা একটা জায়গায় এসে পড়ল। নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইল সে—তার দু-কান প্রসারিত, শুঁড় তুলে সে বাতাসে ঘ্রাণ নিচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে আমি ফোটোগ্রাফারকে বলি পেছিয়ে যেতে, কারণ আমি জানি ক্যামেরার সামান্য শব্দ হলেই সে আক্রমণ করে বসবে। ফোটোগ্রাফার কিন্তু দেখে এই তার সুযোগ; জঙ্গলে এমন সুযোগ আর সে পাবে না, ক্যামেরা চালাতে শুরু করে সে। সঙ্গে সঙ্গে হাতিটা তাড়া করে, এবং তার ফলে আত্মরক্ষার তাগিদে আরও একটি হাতির প্রাণান্ত হয়।

ভাল করে যদি হিংস্র জন্তুর ছবি তুলতে যেতে হয় তাহলে আগে থেকেই শিকারের লাইসেন্স তৈরি করিয়ে নেওয়া ভাল—শিকারে যাবার সময় যেমন তেমনি; কারণ এতে করে ব্যাপারটা বেশ সহজ হয়ে পড়ে। যদি ফোটোগ্রাফার কোন হাতি দেখিয়ে সেটা ছবি তুলতে চায় তার উত্তরে আমি শুধু বলি, 'আপনার একটা মাত্র হাতি মারবার লাইসেন্স আছে; যদি হাতিটা তাড়া করে আসে, তাহলে সেটাকে মেরেই লাইসেন্সটা ফুরিয়ে ফেলতে আপনি রাজি তো?' তাতে যদি সে রাজি হয় তাহলে আর কোন হাঙ্গামা নেই, যত ইচ্ছে ছবি সে তুলতে পারে। শেষপর্যন্ত যখন হাতি আক্রমণ করে বসে তখন আমি তাকে গুলি করে মারি। বিরক্ত হলে যে-কোন জন্তুই তাড়া করবে, সুতরাং সে ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থাই ভাল।

কিন্তু তাহলেও আমি বলতে বাধ্য যে কখনো কখনো এইসব জন্তুরাও আশ্চর্য ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে ক্যামেরার শব্দ সহ্য করে থাকে। একবার আমি একপাল হাতির মাত্র ত্রিশ গজের মধ্যে একদল ফোটোগ্রাফারকে দেখে বিস্ময়ে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। ক্যামেরার আলো ঠিক করা, লেন্স পাল্টানো, বিশেষ কোন কোণ থেকে ছবি তোলা ইত্যাদি ব্যাপারে তারা প্রচুর লম্ফঝম্ফ করছিল। হাতিরা যে তাদের সাড়া পেয়েছিল তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই; কিন্তু তবুও তারা ফোটোগ্রাফারদের এই অঙ্গভঙ্গি শান্তভাবে সহ্য করল। সমস্ত ব্যাপারটা ভাল করে চিন্তা করার পর আমার স্থির বিশ্বাস হল যে হাতিরা নিশ্চয় ওদের একপাল বেবুন বলে ভুল করেছিল। হাতির দৃষ্টিশক্তি

অল্প, সুতরাং এহেন ক্ষেত্রে এরকম ভুল করা তাদের পক্ষে অস্বাভাবিক নয়।

অবশ্য এ কথা আমি বলতে চাই না যে যত টুরিস্ট বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছবি নিয়ে আফ্রিকা থেকে ফিরে আসে সকলকেই সেইসব জন্তু বধ করতে হয়েছে। কেনিয়ার অনেক অঞ্চলেই লরি থেকে ভাল-ভাল ছবি তোলা সম্ভব, বিশেষ করে যদি ক্যামেরায় টেলিফোটো লেন্স থাকে। এক সময়ে মোষের ছবি তোলা ছিল যেমন কঠিন তেমনি বিপজ্জনক। কিন্তু মোষের গতিবেগ তো মাত্র ঘণ্টায় পঁয়ত্রিশ মাইল, সুতরাং একপাল পলায়মান মোষের পিছু নেওয়া লরির পক্ষে কিছুই কষ্টকর নয়। লরির নিরাপত্তার মধ্যে থেকে ফোটো তোলায় বিপদের ঝুঁকি থাকে না বললেই চলে। ফোটোগ্রাফারের প্রধান অসুবিধে সেখানে হল ক্যামেরা স্থির রাখা, আর ধুলো এড়ানো। একবার কলোনিয়াল ফিল্ম কর্পোরেশন থেকে একটা সার্কুলার পাঠানো হয়। একটা খুব ক্যাকগে অঞ্চল দিয়ে আমরা একটা মোষের পালের পিছু নিয়ে চলেছি। চলন্ত লরি আর মোষদের দৌড়নোর ফলে এত ধুলো উঠেছিল যে মনে হচ্ছিল যেন একরকম কুয়াশার মধ্যে দিয়েই আমরা চলেছি। একটা মোষ পালাতে গিয়ে ভুল করে দল থেকে বেরিয়ে সোজা আমাদের লরিতে এসে পড়ল। বনেটের উপর সে পা ফাঁক করে পড়ে গেল এবং সেইভাবেই সে রইল যতক্ষণ না ড্রাইভার কোনরকমে তাকে নামিয়ে ফেলল।

শিকারীর একমাত্র বাসনা হল শিকার করা। কিন্তু ফোটোগ্রাফারের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোন বিশেষ ভঙ্গিতে জন্তুকে পাওয়া দরকার। কিন্তু বনের পশুর মেজাজ সব সময়ে সঠিক আন্দাজ করা সম্ভব নয়, এ কাজটায় তাই অনেক সময়েই যেমন দুঃসাহস তেমনি সাবধানতার প্রয়োজন। একবার একটা বড় ফিল্ম কোম্পানির কাজে হাতির ছবি তুলতে গিয়ে আমি আর-একটু হলেই এক স্থানীয় ব্যক্তির প্রাণনাশের কারণ হয়ে উঠছিলাম।

একফালি ফাঁকা জায়গায় আমরা হাতির পালটার সন্ধান পাই। ক্যামেরা সাজানো হল, কিন্তু হাতিদের মধ্যে সহযোগিতার কোন চিহ্নই নেই। আমাদের দিকে পেছন ফিরে তারা এক জায়গায় জড়ো হয়ে রইল, ফলে ছবি যা হল তা অতি বিশ্রী। ডাইরেক্টর আমায় বললেন চেষ্টা করতে যাতে ওরা ক্যামেরার দিকে মুখ করে। কিছুক্ষণ চিন্তার পর আমি ঠিক করলাম একটি স্থানীয় লোককে এমন জায়গায় পাঠিয়ে দেব যেখান থেকে তার গায়ের গন্ধ হাতিটা পেতে পারে, কারণ আমার মনে হল হয়ত হাতিটা হঠাৎ মানুষের গন্ধ

পেলেই আমাদের দিকে ফিরবে। আমার নিজের যাওয়া সম্ভব হল না, কারণ যদি কোন কারণে হাতিরা আক্রমণ করে বসে তাহলে সামলাতে হবে।

যাকে পাঠালাম সে ছেলেটি মাসাই,—চমৎকার ছেলে, আর মাসাইদের মতই দুঃসাহসী। মাসাইরা খুব তাড়াতাড়ি দৌড়তে পারে, এই ছেলেটি আবার বিশেষ দক্ষ, যেজন্যে সে এযাত্রা প্রাণে বেঁচে গেল। হাতিদের ঘিরে আস্তে আস্তে সে গেল যেদিক থেকে বাতাস বইছিল সেদিকে। তার গন্ধ পেতেই হাতিরা শুঁড় তুলল, আর আমি তাদের ফিরে দাঁড়ানোর প্রতীক্ষায় রইলাম। কিন্তু তা না হয়ে হল কি, একটা ছোট পুরুষ-হাতি দল ছেড়ে বেরিয়ে ক্রুদ্ধ বৃংহিতধ্বনি তুলে ছেলেটিকে তাড়া করল।

অনেকটা দূরে থাকায় তাকে গুলি করা আমার পক্ষে সম্ভব হল না। প্রাণপণে দৌড়তে শুরু করল ছেলেটি, কিন্তু প্রতি মুহূর্তেই হাতিটা তার কাছে এগিয়ে আসছে। ছেলেটি তার একমাত্র আচ্ছাদন গায়ের কম্বলটা ফেলে দিলে, এই আশায়, যে হয়ত সেটা হাতিটার মনোযোগ আকর্ষণ করবে। হাতিটা কিন্তু থামল না। ছেলেটি প্রাণপণে ছুটে চলল বটে, কিন্তু হাতিটার যেন মাটিতে পা-ই পড়ে না। বুঝলাম ছেলেটির জীবনের আশা করা দুরাশা মাত্র।

হঠাৎ ছেলেটির সামনে ছ-ফুট চওড়া একটা খাদ মত পড়ল, সেটা সে ডিঙিয়ে পার হয়ে আবার দৌড় শুরু করল। হাতিটা কিন্তু লাফাতে পারল না,—সামনে একটা পাথরের দেওয়াল থাকলেও সে এতটা বাধা পেত কি না সন্দেহ। খাদটার ধার দিয়ে সে ঘুরতে ফিরতে লাগল এদিকে ওদিকে আর ক্রোধে আত্মহারা হয়ে চিৎকার করতে করতে পথ খুঁজতে লাগল। শেষ পর্যন্ত সে বিরক্ত হয়ে আবার তার দলে ফিরে গেল। আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে এর পর হাতির দলটা ক্যামেরার দিকে মুখ ফিরিয়েছিল, ফোটোগ্রাফাররাও তাঁদের প্রয়োজন মত ছবি নিতে পেরেছিলেন।

এমন দিন হয়ত আসবে যখন আফ্রিকায় শিকার আর বন্দুকে নয়, ক্যামেরার মারফতই হবে। অনেক দিক দিয়েই অবশ্য সেটা খুব ভাল হবে। কিন্তু আমি যে আমার সময়ে বন্দুক নিয়েই বড়-বড় জন্তুর সম্মুখীন হয়েছি, ক্যামেরা নিয়ে নয়, এতেই আমি খুশি। এমনকি মাঝে-মাঝে আমার মনে হয় যে জন্তুদেরও যেন পছন্দ ছিল সেইদিকেই।

কয়েক বছর ধরেই শিকারীরা আমায় জিজ্ঞাসা করে আসছেন, 'আচ্ছা হাণ্টার, আফ্রিকার হিংস্র জন্তুদের মধ্যে কাকে তোমার'সবচেয়ে সাঙ্ঘাতিক মনে হয় ?' এ প্রশ্নের কোন সঠিক জবাব দেওয়া সম্ভব নয়, তবুও এ বিষয়ে আমার যা ধারণা মোটামুটি বলছি। অনেকটাই যে অবস্থার উপর নির্ভর করে তাতে সন্দেহ নেই। যে জন্তু হয়ত জঙ্গলের মধ্যে অত্যন্ত সাঙ্ঘাতিক, ফাঁকা জায়গায় তাকে গুলি করা সহজ হতে পারে ; আবার এক শিকারীর পক্ষে যে জন্তু সহজে মারা সম্ভব, আব-এক শিকারীর পক্ষে হয়ত সে জন্তু শিকার করা অত্যন্ত কঠিন। যেমন ধরুন, যে শিকারী খুব চটপট রাইফেল ব্যবহার করতে পারে, সিংহের আক্রমণ তার কাছে ততটা মারাত্মক মনে হবে না যতটা হবে এমন কোন শিকারীর কাছে, রাইফেলেব ব্যবহারে যার তাডাতাডি হাত চলে না। তা ছাডা শিকারীর পূর্ব অভিজ্ঞতার উপর তো অনেকটা নির্ভর কবেই। কোন শিকারী এক ধবনের শিকারে বিশেষ পারদর্শী এবং সেই জন্তুব চালচলন সম্বন্ধে সঠিক ধারণা থাকায় এ জন্তু শিকারটা তার কাছে আযাসসাধ্য ব্যাপারই হয়ে পডে। অথচ সেই একই শিকাবী হয়ত অন্য কোন হিংস্র জন্তুর সম্মুখীন হলে অত্যন্ত অসুবিধেয় পডবে, তাব পক্ষে তাই এই মন্তব্যই স্বাভাবিক যে এই জন্তুটি অত্যন্ত ধূর্ত ও হিংস্র।

অনবরত শিকার করার ফলে গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই অনেক জন্তুর স্বভাবের পর্যন্ত আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। উনিশ শতাব্দীর শেষ ভাগে যেসব জন্তু শিকার করা সহজ ছিল, আজ তারা অনেক বেশি ধূর্ত ও হিংস্র। বিশেষ করে হাতির বেলাতেই এ কথা খাটে। তারা জানতে পেরেছে যে মানুষ এখন তাদের শত্রু, আগের মত আর তাকে বিশ্বাস করা চলবে না।

কয়েক বছর আগে আমার এক বন্ধুব সঙ্গে এক বিখ্যাত পুরোনো দিনের শিকারী একসঙ্গে শিকার করেন। শিকারী তাঁর সময়ে দু-হাজারেরও বেশি হাতি শিকার করেছেন। হাতি শিকারে বেরোবার সময় বন্ধু আমাকে তাঁদের সঙ্গে যেতে অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু আমি তাতে রাজি হই নি। আমি জানতাম এই বয়স্ক শিকারী অত্যন্ত হালকা রাইফেল ব্যবহার করতেন, তাই ভেবে দেখলাম যে মারতে তো তিনি পারবেন না, কেবল হাতিদের খেপিয়ে আর ভয় পাইয়ে দেবেন, যার ফলে তাদের হত্যা করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে উঠবে।

আমার এ কথা শুনে বন্ধু এমনভাবে আমার দিকে তাকালেন, যেন আমি পাগলের সঙ্গে কথা কইছি। বললেন, 'বল কী হাণ্টার! এই ভদ্রলোক যত হাতি মেরেছেন, সারা জীবনে তার অর্ধেক হাতিও তুমি মারতে পারবে কি না সন্দেহ; তবু কি তুমি বলতে চাও যে তিনি এ কাজ তোমার চেয়ে ভাল বোঝেন না?'

আমি বুঝিয়ে বললাম, 'গজদন্তশিকারী হিসেবে ভদ্রলোক নাম করেছিলেন প্রায় ত্রিশ কি চল্লিশ বছর আগে। তখনকার দিনে হাতিরা থাকত ফাঁকায়, এবং শিকার বেশি করা হত না বলে তারা মানুষকে ভয় করত না; শিকারীর পক্ষে তখন ফাঁকা জায়গায় গিয়ে হালকা বন্দুকেই হাতি শিকার করা সম্ভব ছিল। কিন্তু আজকাল আর সে দিন নেই, হাতিকে এখন ফাঁকায় পাওয়া যায় না, সে থাকে ঘন জঙ্গলের অন্তরালে। তা ছাড়া শুধু যে বন্দুকের সঙ্গে এদের যথেষ্ট পরিচয় আছে তাই নয়, ঝোপের আড়ালে আত্মগোপনের ক্ষমতাও এদের অসাধারণ। হাতি শিকার আর আজকাল আগের মত সহজ ব্যাপার নয়, অত্যন্ত বিপদে ভরা।

আমার মনে হল না কথাটা বন্ধুব মনে ধরেছে; গেলেন তিনি বুড়ো শিকারীর সঙ্গে। বেশ কয়েক মাস পরে তিনি ফিরে এলেন নাইরোবিতে। তাঁর কাছে শুনলাম, গজদন্ত যা তাঁরা পেয়েছিলেন তাতে করে শিকারের খরচ পর্যন্ত উঠেছিল কি না সন্দেহ।

বন্ধুবর পরে বলেছিলেন যে এতবারই তাঁরা নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে গিয়েছিলেন যে শেষ পর্যন্ত যে প্রাণ নিয়ে ফিরতে পেরেছেন এজন্যে নিজেদের ভাগ্যবান মনে করছেন।

আফ্রিকার জঙ্গলে সকল রকমের হিংস্র জন্তুই আমি শিকার করেছি,— শ্বেতাঙ্গ শিকারী হিসেবে বা শিকার বিভাগে চাকরি নিয়ে নিয়ন্ত্রণের কাজে যুক্ত থেকে। কোন বিশেষ ধরনের শিকারে যে আমি পারদর্শী হয়েছি তা নয়, ক্রমবর্ধমান মনুষ্য-সমাজের জন্যে জমির তাগিদে অসংখ্য জন্তু আমায় মারতে হয়েছে, যার ফলে এইসব ভয়ঙ্কর জন্তু মারার ব্যাপারে কোন-না-কোন রেকর্ড আমার রয়ে গেছে। এ কথা যে আমি গর্বের সঙ্গে বলছি তা নয়, কারণ আমি জানি, আমি যে-সুযোগ পেয়েছিলাম, যেকোন শ্বেতাঙ্গ শিকারীই হয়ত তা পেলে তা করতে পারতেন, তার চেয়ে ভালই হয়ত পারতেন। এ কথা বলার আমার উদ্দেশ্য হল এই যে এর ফলে বেশিরভাগ শিকারীর থেকেই এ বিষয়ে আমার

অভিজ্ঞতা অনেক বেশি হয়েছে। তাই আমার পক্ষে আফ্রিকার পাঁচটি ভয়ঙ্কর প্রাণী শিকারের কথা বলা মানেই সে এমন একজনের কথা, যে এই পাঁচ রকম প্রাণীই প্রচুর সংখ্যায় মেরেছে। তবুও আমার পক্ষেও খুব জোর করে কিছু বলা ঠিক হবে না, কারণ আগেই বলেছি, অনেকখানিই নির্ভর করে সময়, অবস্থান ও বিশেষ কোন মানুষ বা পশুর উপর।

প্রথমেই বলি, আহত হলে বা কোণঠাসা হলে যেকোন জন্তুই সাঙ্ঘাতিক হয়ে উঠতে পারে। আমি দেখেছি ওয়াটারবাক্, সেবল্ অ্যাণ্টেলোপ বা বরাহ এহেন অবস্থায় পড়লে অত্যন্ত মরীয়া হয়ে ওঠে। তাই আমি আমার মন্তব্য কেবলমাত্র এই পাঁচটা প্রাণীর উপরেই সীমাবদ্ধ রাখব—হাতি, গণ্ডার, মোষ, সিংহ, ও লেপার্ড। শিকারে যত দুর্ঘটনা আফ্রিকায় হয়েছে তার প্রায় সমস্তই এইসব জন্তুদের কবলে পড়ে।

বুদ্ধিবৃত্তিতে এদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হল হাতি। অন্য কোন প্রাণীর সঙ্গে এ বিষয়ে তার তুলনা চলে না। সে বোঝে যে শিকারীকে না ঘাঁটানোই বুদ্ধিমানের কাজ। জানে সে যে বন্দুকধারী মানুষের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে সে প্রায় কিছুই নয়, মানুষকে তাই সে পারতপক্ষে তাড়া না করে বরং এড়িয়েই চলে। আমি অবশ্য বলছি সুস্থ স্বাভাবিক হাতির কথা। হাতি শিকারের ক্ষেত্রে প্রধান সমস্যা হল হাতির যতটা সম্ভব কাছে যাওয়া, যেখান থেকে গুলি করা সম্ভব হতে পারে, অথচ তার আওতার মধ্যে পড়তে না হয়।

বলা বাহুল্য, এর ব্যতিক্রমও আছে। হাতি যখন বোঝে যে মানুষ তার পিছু নিয়েছে অথচ কিছুতেই সে তাকে এড়িয়ে যেতে পারছে না, সেরকম ক্ষেত্রে অনেক সময়ে সে শিকারীকেই শিকার করতে উদ্যত হয়। এই সময়ে হাতি অত্যন্ত সাঙ্ঘাতিক হয়ে ওঠে, বিশেষ করে যদি তার শিকারের অভিজ্ঞতা থাকে আর মানুষের চলাফেরা সম্বন্ধে কিছু ধারণা থাকে।

একবার একটা হাতির দুই সঙ্গীকে মারবার পর তৃতীয় হাতিটা তার চিহ্নিত পথের ধারে আমার প্রতীক্ষায় লুকিয়ে ছিল। আমার ভাগ্য ভাল যে ও আমাকে মারবার আগেই আমি ওকে মারতে পেরেছিলাম। কিন্তু বেশিরভাগ হাতিরই স্বাভাবিক প্রবণতা হয় পালানোর দিকে। তাছাড়া দেখা গেছে, এবং এটা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার—যে তেড়ে-আসা হাতি প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই গুলি খেলেই ফিরে যায়, এমনকি আঘাত মারাত্মক না হলেও। গুলির সঙ্গে পরিচয় হবার পর খুব কম হাতিই মরীয়া হয়ে আক্রমণ

করে থাকে। এই দুই কারণে আমার ধারণা, এই পাঁচটি প্রাণীর মধ্যে সবচেয়ে কম মারাত্মক হল হাতি।

এবার গণ্ডারের কথা ধরা যাক। হাতির সঙ্গে তার বিশেষ তফাত এই যে প্রায়ই সে আক্রমণ করে বসে, আক্রমণের কোন কারণ না থাকলেও। এর ফলে গণ্ডারকে বিশেষ ভয় করতে হয়। তবে, গণ্ডারও গুলি খেলে সাধারণত পালিয়েই থাকে।

একবার তিনটে গণ্ডার একসঙ্গে আমায় তেড়ে এসেছিল। মধ্যেরটাকে (এটা স্ত্রী-গণ্ডার) মেরে ফেলবার পর তার বন্ধু পুরুষ-গণ্ডারদুটি এমন বেগে আমার দু-দিক দিয়ে দৌড়ে পালিয়ে গেল যে ভাল করে দেখতেই পেলাম কি না সন্দেহ। গণ্ডার না হয়ে যদি ওরা মোষ হত তাহলে ওদের একটা না একটা অতি অবশ্যই ছুটে এসে আমায় শিঙে তুলে ছিটকে ফেলে দিত।

তার মানে অবশ্য এ নয় যে গুলি খেলে প্রতি ক্ষেত্রেই গণ্ডার পালিয়ে থাকে। আরও একবার আমি ঠিক একই রকম অবস্থায় তিনটে গণ্ডারের তাড়া খেয়েছিলাম। আমার হাতে ছিল ৫০০ নং দোনলা এক্সপ্রেস রাইফেল। ডান আর বাঁয়ের দুই গুলিতে দুটো গণ্ডার পড়ে গেল, তারপর বন্দুক-বাহকের কাছ থেকে নতুন বন্দুক নিতে গিয়ে দেখি, কখন সে পালিয়েছে। গণ্ডারের তাড়া দেখে বন্দুকটা নিয়েই দৌড়ে পালিয়েছে সে।

তৃতীয় গণ্ডারটা ইতিমধ্যে প্রায় আমার উপর এসে পড়েছে। তার চোখ প্রায় বন্ধ, অত্যন্ত সরু হয়ে গেছে। শেষ মুহূর্তে আমি চেষ্টা করলাম তার পথ থেকে লাফিয়ে সরে যেতে। লাফিয়ে উঠেছি, কিন্তু ঠিক সেই সময়ে আমি এমন আকস্মিক একটা ধাক্কা খেলাম যে অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে গেলাম। ভাগ্য ভাল যে গণ্ডারটা নাকের সিধে চলে গিয়েছিল, আর সে ফিরে আমায় মারতে আসে নি। গণ্ডাররা সাধারণত একবগ্‌গা হয়ে থাকে। শুনেছি ঢুঁ মারার মুহূর্তে তারা চোখ বন্ধ করে থাকে,—আমার অভিজ্ঞতাও সেই একই কথা বলে। যাই হোক, এ বিষয়ে নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সম্ভাবনা সযত্নে পরিহার করে এসেছি।

এই ঘটনা বিবৃত করার উদ্দেশ্য এই যে, কোন্ জন্তু যে কখন কী করে বসবে তা সব সময়ে সঠিক আন্দাজ করা সম্ভব নয়। কিন্তু তাহলেও এটুকু মোটামুটি বলা যেতে পারে যে সাধারণত বন্দুকের গুলি অগ্রাহ্য করে কোন জন্তুই আক্রমণ চালায় না। আমার হিসেবে তাই গণ্ডারের স্থান হল চতুর্থ, তাকে

যে হাতির চেয়ে সাঙ্ঘাতিক বলছি সে তার গোঁ-র জন্যে। তবে, মোষ বা সিংহ বা চিতাবাঘের মত অত সাঙ্ঘাতিক সে নয়।

অনেক শিকারীর মতে আফ্রিকায় সবচেয়ে ভয়ঙ্কর জন্তু হল মোষ। এই ধারণার সপক্ষে অনেক কিছু বলা যেতে পারে। গুলি খাওয়া সত্ত্বেও মোষ থামে না বা সরে যায় না—সমানে তেড়ে আসে। সহজেই সে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং সামান্য কারণেই আক্রমণ করে বসে। আক্রমণের সময় সে তার বিশাল দুই শিং বাগিয়ে ছুটে আসে, খুব ভারি রাইফেরেল গুলি ছাড়া তাকে প্রতিহত করা অসম্ভব। কাউকে যদি সে ধরাশায়ী করে, প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই সে আবার ফিরে গিয়ে তাকে গুঁতিয়ে থাকে। শত্রু হিসেবে মোষ চতুরও কম নয়। শিকারী হয়ত আক্রান্ত মোষের চিহ্ন ধরে অগ্রসর হচ্ছে, হঠাৎ হয়ত দেখা গেল কখন সেই মোষ ঘুরে পেছিয়ে এসে অতর্কিতে শিকারীকেই আক্রমণ করে বসেছে। আহত মোষই বিশেষ করে এই চাতুরির আশ্রয় নেয় যখন সে দেখে যে আর বেশি দূর সে যেতে পারবে না।

মোষের সমস্তগুলো ইন্দ্রিয় সর্বদা সজাগ থাকে, কিন্তু অন্য কোন হিংস্র জন্তু সম্বন্ধে সেকথা বলা চলে না। আগে বলেছি, হাতি ও গণ্ডারের ঘ্রাণশক্তি অত্যন্ত প্রখর হলেও দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত অল্প। সিংহ ও চিতাবাঘের দৃষ্টিশক্তি ভাল হলেও অন্যান্য জন্তুর তুলনায় তাদের ঘ্রাণশক্তি প্রায় নেই বললেই চলে। মোষের কিন্তু দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি ও ঘ্রাণশক্তি সমস্তই অত্যন্ত তীক্ষ্ণ; এ এক অতি সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার।

তাহলে কেন আমি মোষকে আফ্রিকায় সবচেয়ে সাঙ্ঘাতিক জন্তু বলছি না? তার কারণ, তার বপুর বিরাটত্ব। যে জন্তুর ওজন পঁচিশ মণেরও বেশি, অত্যন্ত ঘন বন ছাড়া লুকিয়ে থাকা সম্ভব নয় তার পক্ষে। তা ছাড়া তেড়ে-আসা মোষকে গুলি করার মত জায়গার অভাব হয় না, কোথাও না কোথাও তার গায়ে গুলি লাগবেই। সুতরাং বন্দুক যদি যথেষ্ট ভারি হয় তাহলে তাকে ফেলে দেওয়া অত্যন্ত সহজ, তখন আর দ্বিতীয় গুলিতে তাকে শেষ করতে কোন বাধা নেই।

তা ছাড়া আরও একটা জিনিস। মোষ যখন তাডা করে আসে, মনে হয় যেন সে বাতাসের বেগে তেড়ে আসছে, আসলে যদিও তার গতিবেগ ঘণ্টায় পঁয়ত্রিশ মাইলের বেশি হয় না, এবং এই পূর্ণ বেগ পেতেও তার সময় লাগে যথেষ্ট। এর ফলে শিকারী বন্দুক তুলে গুলি করার সময় পেতে পারে।

এইসব কারণে আমার মতে মোষের স্থান হল আফ্রিকার ভয়ঙ্কর জন্তুদের মধ্যে তৃতীয়।

এবার আমরা মার্জার-জাতীয় দুটো জন্তুর আলোচনা করব—সিংহ আর চিতাবাঘ। আমার মতে সাঙ্ঘাতিক জন্তু হিসেবে সিংহের স্থান আফ্রিকায় দ্বিতীয়। অত্যন্ত পাতলা জঙ্গলের আড়ালে আত্মগোপন করা, আর প্রচণ্ড গতিবেগ—এ বেগ পূর্ণতা লাভ করে প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই—সিংহের এ দুটো ব্যাপারই অত্যন্ত মারাত্মক। তাছাড়া তার শরীর মোষের তুলনায় অনেক ছোট হওয়ায় গুলি করাও অপেক্ষাকৃত কঠিন। সিংহ মাত্র কয়েকটা লম্বা-লম্বা লাফেই শিকারীর উপর এসে পড়ে, যেজন্যে তাকে লক্ষ্য করে গুলি করাও কঠিন। দুঃসাহসেও সে মোষের চেয়ে কমতি যায় না, বন্দুকের গুলিতে পেছপা হবার পাত্রও সে নয়,—জীবন পণ করে আক্রমণ করে সে, হয় মারবে না-হয় মরবে। যদি সে পূর্ণ গতিবেগের সঙ্গে কোন মানুষকে ধাক্কা মারে, হয়ত সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবে, এবং এজন্যে তার ভাগ্য ভাল বলতে হবে, কারণ সিংহের কামড়ের যন্ত্রণা তাকে সহ্য করতে হবে না।

ফোটোগ্রাফের অধ্যায়ে বলেছি, সিংহ হল ঠিক যেভাবে শিকারী তাকে দেখবে তাই। লরিতে থেকেও মানুষ প্রায় কোন বিপদের মধ্যে না গিয়েই সিংহ শিকার করতে পারে, এবং বোমা বা মাচান থেকে গুলি করার ব্যাপারেও সেই একই কথা বলা প্রযোজ্য। কিন্তু জঙ্গলে ঢুকে সিংহ শিকার সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার, কারণ সে-ক্ষেত্রে শিকারীর চেয়ে সিংহেরই সুবিধে বেশি। সে জানে শিকারী কোথায়, কিন্তু তার অবস্থিতি শিকারীর সঠিক জানা নেই। সে শিকারীর কাছে যাবে না, শিকারীকেই তার কাছে যেতে হবে। হাতি বা গণ্ডার বা মোষকে আক্রমণে প্ররোচিত করা যায়, সেক্ষেত্রে শিকারীর খানিকটা সুবিধে হতে পারে। ওৎ-পেতে-থাকা সিংহ কিন্তু প্রতীক্ষা করে থাকে, একেবারে নিশ্চিত না হলে সে পারতপক্ষে আক্রমণ করে না। মনে রাখতে হবে আমি এখানে এমন একজন শিকারীর কথা বলছি যে মাত্র একটি সিংহের পিছু নিয়েছে। যদি জঙ্গল পিটিয়ে সিংহকে শিকারীর কাছে নিয়ে যাওয়া হয় তাহলে অবশ্য ব্যাপারটা অত্যন্ত সহজ হয়ে আসে। এও ধরে নিচ্ছি যে শিকারীর অস্তিত্ব সিংহের জানা আছে,—শিকারী যে অতর্কিতে তার উপর গিয়ে পড়েছে তা নয়। কেবলমাত্র বন্দুক-বাহককে সঙ্গে করে সিংহের পিছু নিয়ে জঙ্গলে প্রবেশ করা যেমন কঠিন তেমনি বিপজ্জনক।

পূর্ণদেহ সিংহের সাহস আর শক্তি কথায় প্রকাশ করা যায় না। একটা সিংহ একবার একটা দশ টন লরিকে আক্রমণ করে বসেছিল। মাত্র দশ ফুট তফাত থেকে সে আমাদের লরি লক্ষ্য করে লাফিয়ে ওঠে। অপূর্ব সে লাফ! সমস্ত দেহটা লম্বা টান টান হয়ে গেছে। অনেক সিংহ অনেকবার আমায় লক্ষ্য করে লাফ দিয়েছে, কিন্তু এত চমৎকার দেহসৌষ্ঠব আর কখনো আমার চোখে পড়েনি। লরির পেছনদিকটায় এত জোরে সে ধাক্কা দিয়েছিল যে অত বড গাড়িটা থর-থর করে কেঁপে উঠেছিল।

ড্রাইভারের আসনে যেখানে আমি ছিলাম সেখান থেকে দেখতে পাইনি গাড়ির পেছনদিকে ব্যাপারটা কী হচ্ছে। আমার সঙ্গে ছিল অ্যান্টেলোপ মারার ৩০-০৬ স্প্রিংফীল্ড বন্দুকটা, সেটা নিয়ে গাড়ি থেকে নেমে গেলাম পেছন দিকে। দেখলাম সিংহটা পরম হতাশায় মন খারাপ করে আস্তে আস্তে পেছন দিকে চলে যাচ্ছে।

সিংহকে যদি আগেকার ভয়ঙ্কর জন্তুদের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান দেওয়া হয়, প্রথম স্থানের অধিকারী তাহা কোন্ জন্তু? আমার মতে সে হল চিতাবাঘ। আমি জানি অনেক শ্বেতাঙ্গ শিকারীই এ বিষয়ে আমার সঙ্গে একমত হবেন না, কিন্তু তবুও আমি এই মতই পোষণ করি। অসংখ্য চিতাবাঘ আমি শিকার করেছি,—সংখ্যায় কত হবে তা সঠিক বলা সম্ভব নয় কারণ আমরা শিকার করতাম চামড়ার জন্যে, কোন রেকর্ড রাখার কথা তখন মনে হয় নি। প্রথম যখন আমি কেনিয়ায় আসি, চিতাবাঘ শিকার করা তখন একটা প্রশংসার কাজ বলে গণ্য হত, কারণ গৃহপালিত প্রাণীদের উপর তারা অত্যন্ত অত্যাচার করত। চিতাবাঘের থাবায় আহত হলে সে ঘা বিষিয়ে ওঠে, কারণ সিংহের মত চিতাবাঘের নখের ভিতরেও তার শিকারের জন্তুর পচা মাংস লেগে থাকে, ফলে কোন ভেড়া বা গরুর গায়ে সামান্য একটু আঁচড লাগলেও সে মারা পড়ে। মালিক যদি তার গৃহপালিত পশুকে রক্ষা করতে আসে, তাকেও সে আক্রমণ করতে ইতস্তত করে না,—প্রথমদিকের অনেক ঔপনিবেশিককেই চিতাবাঘের আক্রমণের ফলে কাউকে একটা চোখ, কাউকে বা মুখের অন্য কোন অংশ হারাতে হয়েছে, কারণ মানুষকে আক্রমণ করার সময় চিতাবাঘ সর্বদাই তার মুখ লক্ষ্য করে লাফিয়ে উঠে সামনের পায়ের বিষাক্ত থাবা দিয়ে তার চোখ উপড়ে নেবার চেষ্টা করে এবং ইতিমধ্যে তার পেছনের পাও সমানে কাজ করে চলে এবং সেইসঙ্গে সে সাধারণত তার ঘাড়ে কিংবা কাঁধে দাঁত বসায়।

একবার আমি এক বন্ধুর সঙ্গে মাসাই রিজার্ভে চিতাবাঘ শিকারে গিয়েছিলাম। দেখলাম একটা চিতাবাঘ একটা পাথুরে খাড়াই বেয়ে উঠে যাচ্ছে। আমার বন্ধু গুলি করতে গুলিটা তার শরীরের এক জায়গায় গিয়ে লাগল আর সঙ্গে সঙ্গে চিতাবাঘটা এক লাফে পাথরের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। তার রক্তের চিহ্ন ধরে আমরা ধীরে ধীরে উপরে উঠতে লাগলাম।—দু-জনের মাঝখানে কয়েক গজের ব্যবধান, দু-জনেরই হাতে উদ্যত রাইফেল। এ কাজে নার্ভের উপর চাপ পড়ে অত্যন্ত বেশি, কারণ আমরা জানি কোথাও না কোথাও সে বড়-বড় পাথরের মাঝে লুকিয়ে আমাদের প্রতীক্ষায় রয়েছে, সুযোগ পেলেই তাড়া করে আসবে।

কুড়ি গজ মত যেতে না যেতেই হঠাৎ চিতাবাঘটা কয়েকটা পাথরের পেছন থেকে এসে এক লাফে আমার বন্ধুর উপর পড়ল। হুস্ করে সে বাতাস কেটে ছুটে এল,—একটা যেন হলদে আলোর ঝলক মাত্র। আমার বন্ধু গুলি করার ব্যাপারে যথেষ্ট ক্ষিপ্র, কিন্তু হলে কী হয়, বন্দুক তোলবার আগেই চিতাবাঘ প্রায় তার উপর এসে পড়েছে। শূন্যে থাকতেই আমি তাকে গুলি করলাম, রাইফেলটাকে শট-গানের মত ব্যবহার করে। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে বন্ধুর উপর পড়ার আগেই তার মৃত্যু হয়েছিল। ওর লাফের বহরটা পরে মেপে দেখেছিলাম, বারো ফুট।

যদি কখনো কোন জঙ্গলে চিতাবাঘ শিকার করতেই হয় তাহলে ভারি গুলি নিয়ে বারো বোর বন্দুক ব্যবহার করাই আমার পছন্দ। চিতাবাঘ যখন লাফ দেয়, তার দেহ সরু আর লম্বা হয়ে যায়, তখন সে দেহে গুলি করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে ওঠে। আগে বলেছি, তেড়ে-আসা সিংহকে লক্ষ্য স্থির করে গুলি করা কঠিন, আর চিতাবাঘের ওজন তো সিংহের ওজনের অর্ধেকেরও কম, আর আকৃতিতে অনেক ছোট হওয়ায় লুকিয়ে থাকার শক্তিও তার অনেক বেশি।

অনেকে মনে করে থাকেন, যে বন্য জন্তুর যেমন আকৃতি সে তেমনি হিংস্র, এবং সেই হিসেবে একটা পুরুষ-হাতি একটা আড়াই মণ ওজনের চিতাবাঘের চেয়ে বেশি সাঙ্ঘাতিক। মোটেই কিন্তু তা নয়। মানুষ অত্যন্ত দুর্বল প্রাণী, যে-কোন হিংস্র পশুর পক্ষেই মানুষকে মারা সহজ। কোন হিংস্র জন্তুর পক্ষে মানুষকে তাড়া করা কতকটা কোন কুকুরের ইঁদুরের পিছু ধাওয়ার সামিল, এবং প্রচণ্ড গ্রেট ডেন বা সেণ্ট বার্নার্ড কুকুরের চেয়ে ইঁদুরের অনেক বেশি ভয় ছোট চটপটে টেরিয়ার কুকুরকে। চিতাবাঘ সিংহের মত বলবান না হলেও

মানুষকে মারাত্মক আঘাত হানবার পক্ষে তার শক্তি যথেষ্ট, এব ব্যাপারটাই শিকারীর হিসেব করা দরকার।

চিতাবাঘ অত্যন্ত স্মার্ট। যদি সে জানতে পারে যে শিকারী তার চিহ্ন ধরে এগোচ্ছে, অনেক সময় সে কোন গাছে উঠে পথের-উপর-ঝুঁকে-পড়া কোন ডালে গিয়ে বসে। শিকারী যদি তাকে দেখতে না পায় তাহলে সে সাধারণত কিছু করে না; কিন্তু যদি শিকারী উপর দিকে তাকায় এবং তার ফলে তার সঙ্গে চিতাবাঘের চোখাচোখি হয়, সঙ্গে সঙ্গে চিতাবাঘ বিদ্যুৎগতিতে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। বেশিরভাগ জন্তুই লুকিয়ে থেকে যদি ধরা পড়ে যায় তাহলে হয় বিরক্তিকর গর্জন তুলবে, কিংবা পলায়ন করবে। চিতাবাঘের কিন্তু স্বভাব তা নয়। যখনই সে শিকারীর মুখ দেখে বুঝতে পারে শিকারী তাকে আবিষ্কার করে ফেলেছে, সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণ করে বসে।

দু-দুবার আমি এমন গাছের নিচ দিয়ে অন্যান্য শিকারীর সঙ্গে চলে গেছি যে গাছের উপর চিতাবাঘ ওত পেতে বসে ছিল। দু-বারেই সে কোন সাড়া দেয় নি যতক্ষণ না শিকারীরা মুখ তুলে তাকিয়েছে, তারপর মুখ তুলতেই সঙ্গে সঙ্গে চিতাবাঘ লাফিয়ে পড়েছে। বিদ্যুতের মত ক্ষিপ্র গতিতে গুলি করার ফলেই উভয় ক্ষেত্রে শিকারী রক্ষা পেয়ে গেছে।

চিতাবাঘের চলাফেরা মাটির উপর যেমন স্বচ্ছন্দ গাছের উপরও তেমনি হওয়ায়, কেবলমাত্র তার চলে-যাওয়া পথের দু-দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখলেই হবে না, মাথার উপরের গাছের দিকেও তেমনি নজর রাখতে হবে। এতে করে দ্বিগুণ অসুবিধে পড়তে হয়।

কেবলমাত্র একটা ব্যাপারে চিতাবাঘের একটু ত্রুটি দেখা যায়। একটা ছোট ঝোপের মধ্যেই সে আত্মগোপন করতে পারে সন্দেহ নেই, কিন্তু প্রায়ই দেখা যায়, তার ল্যাজটা ঝুলে রয়েছে। অনেক চিতাবাঘই কেবলমাত্র ল্যাজ লুকোতে না পারায় আমার হাতে মারা পড়েছে।

এ ছাড়া আর প্রায় সমস্ত ব্যাপারেই চিতাবাঘ অত্যন্ত ধূর্ত। তাদের গৃহ-পালিত পশু শিকারের কৌশল থেকেই তাদের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় মেলে।

কুকুরের মাংসের উপর চিতাবাঘের যতই লোভ থাকুক, কুকুরের পাল দেখলে কিন্তু সে পালাতে থাকে। গোটা ছয়েক ছোট-ছোট কুকুরও একটা প্রকাণ্ড চিতাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা একটা গাছে আটকে রাখতে পারে। কিন্তু কোন একক কুকুরের সন্ধান পেলে চিতাবাঘ তাকে ধরবার জন্যে যথাসাধ্য

চেষ্টা করে থাকে, কখনও বা তাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে নিজের আওতার মধ্যেও নিয়ে আসে।

চিতাবাঘের গন্ধ পেলে কুকুর সাধারণত ভীষণ চিৎকার শুরু করে, কিন্তু তবুও সে তার মনিবের তাঁবু বা বাড়ির নিরাপত্তা ছেড়ে চট্ করে বেরোয় না। চিতাবাঘ একটা ফাঁকা জায়গা দেখে সেখানে শুয়ে পড়ে, যেন কুকুরের ডাকটাকে সে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনছে না। তারপর সে আস্তে আস্তে শব্দ করে, আর মাথাটা মাটির উপর রেখে ধীরে ধীরে ল্যাজটা এপাশে ওপাশে দোলাতে থাকে, খেলার ইচ্ছে হলে কুকুর যেমনটি করে। কিছুক্ষণের মধ্যেই খেপে ওঠে কুকুরটা, আর ব্যাপারটা কী দেখবার জন্যে বাতাস শুঁকতে শুঁকতে সাবধানে এগিয়ে আসে সে। এদিকে চিতাবাঘটার পেছনের পা-দুটো তার শরীরের নিচে চলে গেছে, ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে সে একেবারে প্রস্তুত, যদিও তাকে দেখে সে-কথা আন্দাজ করা শক্ত। কুকুরটার উপরে সে বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করে না, কেবল আস্তে আস্তে শব্দ করে আর চারিদিকে তাকাতে থাকে। শেষ পর্যন্ত যখন কুকুরটা তার আওতার মধ্যে এসে পড়ে, সামান্যমাত্র আভাসও না দিয়ে সে ছেড়ে-দেওয়া স্প্রিং-এর বেগে কুকুরে উপর লাফিয়ে পড়ে। চিতাবাঘের সঙ্গে লড়াইয়ে সবচেয়ে বড় বা সবচেয়ে হিংস্র কুকুরেরও কোন আশাই নেই। তার দাঁতগুলো এক ইঞ্চি লম্বা, তার উপর তার থাবা তো আছেই। প্রথমেই সে কুকুরটার টুঁটি কামড়ে ধরে, আর সেইসঙ্গে তার পেটে তার থাবা বসিয়ে দেয়। তারপর কুকুর মরে গেলে সে তাকে নিকটবর্তী কোন ঝোপের আড়ালে নিয়ে গিয়ে খেয়ে ফেলে।

কোন শিকারের অভুক্ত অংশ চিতাবাঘ সাধারণত কোন গাছের দুই ডালের মাঝামাঝি জায়গায় রেখে যায়, যাতে বনের মুর্দাফরাসরা তা না খেতে পারে। বড় চিতাবাঘ সওয়া মণ ওজনের প্রাণীকে পর্যন্ত নিয়ে গাছের গুঁড়ি বেয়ে উঠে যায়, সে গাছে কোন ডাল না থাকলেও। যে গাছে সে তার শিকারকে রেখে আসে সেখান থেকে খানিকটা দূরে আর-একটা গাছে চড়ে সে দিনের বেলাটা ঘুমিয়ে কাটায়, তারপর অন্ধকার হলে আবার এসে খাওয়া শুরু করে।

এই ভয়ঙ্কর জন্তুদের অন্তত একটা সদ্‌গুণ আছে। এরা সিংহের মত নয়, একটা পুরুষ-চিতাবাঘের সঙ্গে একটিমাত্র স্ত্রী-চিতাবাঘ বাস করে। পুরুষ ও স্ত্রী-চিতাবাঘের মধ্যে প্রচুর সদ্ভাব দেখা যায়। গৃহস্থের গরুবাছুর নষ্ট করছিল বলে একবার আমি একটা স্ত্রী-চিতাবাঘকে বিষ-মাখানো টোপ দিয়েছিলাম।

পরদিন সকালে গিয়ে দেখি, স্ত্রী-চিতাবাঘটা টোপের উপর মরে পড়ে রয়েছে আর তার সাথী তার মৃতদেহের উপরে মাথা রেখে স্নেহের ভঙ্গিতে শুয়ে রয়েছে। আমায় দেখেই সে লাফিয়ে উঠল। প্রিয় সঙ্গীর পাশেই মরে রইল সে।

জঙ্গলের ভিতর দিয়ে চিতাবাঘের চিহ্ন ধরে অগ্রসর হওয়ার মত অত বিপজ্জনক না হলেও লম্বা লম্বা ঘাসের মধ্যে শিকারেও বিপদের সম্ভাবনা কম নয়। ঢিল মেরে তাকে বের করা অসম্ভব, গায়ে ঢিল লাগলেও সে একটুও নড়ে না, এবং আক্রমণের পূর্ব-মুহূর্ত পর্যন্ত কোনরকম সাড়া দেয় না।

এক মাসাই গ্রামের মাতব্বররা একবার আমায় একটা চিতাবাঘ শিকারে পাঠায়,—চিতাবাঘটা তাদের গরুবাছুর মেরে প্রচুর ক্ষতি করছিল। দু-জন জোয়ান চিহ্ন ধরে-ধরে গিয়ে তাকে খুঁজে পেয়েছিল, কিন্তু দু-জনেই চিতাবাঘটার কবলে পড়ে ভয়ঙ্কর রকম আহত হয়। গ্রামে পৌঁছে অবাক হলাম চিতাবাঘটার হত্যাকাণ্ডের পরিচয় পেয়ে। কোন-কোন দিন রাত্রে সে পাঁচটা, এমনকি ছ-টা বাছুর পর্যন্ত মেরেছিল, কিন্তু কোনটার মাংস খায় নি; মনে হয় নেহাৎ খেলাচ্ছলেই সে এই হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছিল।

চিতাবাঘটার চিহ্ন ধরে অগ্রসর হলাম। গ্রামের কাছে এক জায়গায় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথরের চাঁই চোখে পড়ল, একটার উপর একটা এমনভাবে রয়েছে, যেন মনে হয় মানুষের হাতে বসানো। কোন কুয়াসা বা তুষারপাত এ অঞ্চলে না হওয়ায় শত-শত বছর সেগুলো ঐভাবেই আছে এবং চিরকালই হয়ত থাকবে, যদিও দেখলে মনে হয় এক-ঝলক হাওয়ায় যেকোন মুহূর্তে উল্টে পড়বে। এই চাঁইগুলোর মধ্যে মধ্যে গভীর গহ্বর মত আছে, চিতাবাঘের লুকিয়ে থাকার পক্ষে আদর্শ সে জায়গা। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চাঁইগুলোর মধ্য দিয়ে কিভাবে সে গেছে বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু তার ডেরা পর্যন্ত নিয়ে যাবার মত কোন চিহ্ন আমাদের চোখে পড়ল না, পাথরের মধ্যেই কোথায় তা হারিয়ে গেল। হতাশ হয়ে আমাদের গ্রামে ফিরতে হল।

রাত্রে গ্রামের ঘরে-ঘরে মহা সোরগোল শুরু হল। গরু বাছুর দৌড়চ্ছে, গ্রামবাসিরা চেঁচামেচি করছে। সকাল হতে দেখা গেল, আবার একটা বাছুর মারা পড়েছে। এটারও টুঁটি কামড়ে মেরে ফেলা হয়েছে।

অনেক বলে কয়ে বাছুরের মালিকের কাছ থেকে মরা বাছুরটা টোপ হিসেবে ব্যবহার করব বলে নিলাম। একটা যুৎসই গোছের গাছ দেখে

সেখানে আমার মাচান তৈরি হল, তার উপর বসে আমি চিতাবাঘের প্রতীক্ষায় রইলাম।

রাত দশটা নাগাদ আধো-অন্ধকারের মধ্য দিয়ে একটা চলন্ত দেহ টোপটার কাছে এগিয়ে আসছে দেখা গেল—পরম সন্তর্পণে, সম্পূর্ণ নিঃশব্দে, পদক্ষেপের কোন শব্দই উঠছে না। এত বড় জন্তুটা, যে প্রথমটা মনে হল এ নিশ্চয় কোন সিংহীই হবে। টোপটার কাছ পর্যন্ত এসে সে যখন মাটির উপর বসে পড়ল, তখন তাকে দেখাই কষ্টকর হয়ে উঠল। ঠিক করলাম, যেই ও উঠে দাঁড়াবে সঙ্গে সঙ্গে গুলি করব। আধ ঘণ্টা পরে সে উঠল, তার ল্যাজটা এপাশে ওপাশে দুলছে। লক্ষ্য স্থির করে আমি গুলি করলাম,—একটু নিচু করে করলাম, পাছে অন্ধকারে গুলিটা ওর উপর দিয়ে চলে যায়। প্রকাণ্ড এক লাফ মেরে সঙ্গে সঙ্গে সে পালালো। গুলি যে লেগেছে তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু এই অল্প আলোয় সে আঘাত মারাত্মক হয়েছে কি না এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত হতে পারলাম না। কোনরকম ঝুঁকি নেওয়া সম্ভব হল না, সেখানেই রয়ে গেলাম ভোর না হওয়া পর্যন্ত।

ভোরবেলা মাটিতে রক্তের দাগ দেখা গেল। এ যে সেই চিতাবাঘটারই রক্ত তাতে সন্দেহ নেই, কারণ তার পিছু নেবার সময় আমি খুব ভাল করে তার পায়ের চিহ্ন লক্ষ্য করেছিলাম। আমার লক্ষ্য নিখুঁত হয় নি, নতুবা সে একশো গজের মধ্যেই মরে পড়ে থাকত। সুতরাং একমাত্র উপায় এখন ওকে পাথরের গহ্বরগুলোর মধ্যে থেকে খুঁজে বের করা।

আমি বেরিয়ে পড়লাম, সঙ্গে চলল ঢাল বল্লম হাতে চারজন মোরান। রক্তের দাগ লক্ষ্য করে করে আমরা গিয়ে পৌঁছলাম একটা ছোট গুহার মুখে। দু-জন মোরান লম্বা গাছের ডাল কেটে নিয়ে তাই দিয়ে গুহার ভিতরটা খোঁচাতে শুরু করল, আর অন্য দু জন বল্লম উচিয়ে আমার পাশে প্রস্তুত হয়ে রইল। হঠাৎ একটা গভীর, কর্কশ গর্জন গুহার ভিতর থেকে শোনা গেল, চারিদিকের পাথরে পাথরে সে শব্দের প্রতিধ্বনি উঠল। সঙ্গে সঙ্গে চিতাবাঘটা বন্দুকের গুলির মত ছিটকে বেরিয়ে এল—আর সেইসঙ্গে শোনা গেল কয়েকটা ঘড-ঘড শব্দ,—তার নিশ্বাস প্রশ্বাসের। লাঠিওয়ালা মোরান দু-জনকে ছিটকে ফেলে সে একজন সশস্ত্র মোরানকে লক্ষ্য করে লাফিয়ে উঠল। বল্লমের খোঁচায় মোরান তার আক্রমণ প্রতিহত করতে চেষ্টা করল, কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হল সে। সঙ্গে-সঙ্গে চিতাবাঘটা তার ঢালের উপর লাফিয়ে পড়ে সামনের থাবা দিয়ে

তার মুখ ক্ষতবিক্ষত করতে শুরু করল আর তার কাঁধে কামড় বসালো। মাটিতে পড়ে গেল লোকটা, কিন্তু তবুও চিতাবাঘটা তাকে ছাড়ল না। সঙ্গে-সঙ্গে অপর মোরানটা তাকে লক্ষ্য করে বল্লম ছুড়ল, বল্লমটা আমার এত গা ঘেঁসে গেল যে তার ক্ষুরধার অগ্রভাগে আমার প্যান্ট কেটে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে চিতাবাঘটা তার দিকে ফিরে তার হাত কামড়ে ধরল। পড়ে গেল লোকটা, আর চিতাবাঘটা চার পায়ে তাকে ক্ষত-বিক্ষত করতে লাগল,—তার দাঁত তখনও তেমনি তার বাহুর উপর বসানো।

সমস্ত ব্যাপারটা মাত্র ময়েক সেকেণ্ডের মধ্যে কেটে গেল,—বলতে যতক্ষণ লাগে তার চেয়েও অনেক কম সময়ে। চিতাবাঘটার মোটা ঘাড়ের উপর রাইফেলের নলটা লাগিয়ে আমি গুলি করলাম,—গুলিটা তার কাঁধ ভেদ করে চলে গেল। এ অঞ্চলের সবচেয়ে সাঙ্ঘাতিক চিতাবাঘের দৌরাত্মোর অবসান হল।

এইটুকু সময়ের মধ্যেই চিতাবাঘটা মোরানদের যে আঘাত করেছে তা দেখে স্তম্ভিত হতে হল। চিতাবাঘের ক্ষত কত তাড়াতাড়ি বিষিয়ে যায় জানতাম, তাই সঙ্গে সঙ্গে আমি তাদের পরিচর্যায় নিযুক্ত হলাম। কাঁধের উপরের গভীর দাঁতের ক্ষতটায় জীবাণুনাশক টি. সি. পি. ইনজেকসন দিয়ে দিলাম, আর থাবার ক্ষতগুলো শুধু টি. সি. পি. দিয়ে ভাল করে ধুয়ে দিলাম। এক সপ্তাহের মধ্যেই সেরে উঠল ওরা।

এই সমস্ত কারণে জঙ্গলে শিকারের ক্ষেত্রে আমি চিতাবাঘকে যতটা ভয় করি অন্য কোন জন্তুকে ততটা ভয় করি না।

আফ্রিকার অনেক অঞ্চলেই ফাঁদ পেতে, বিষ খাইয়ে বা কুকুর লেলিয়ে দিয়ে চিতাবাঘ প্রায় শেষ করে আনা হয়েছে। আমার ধারণা ছিল যে চিতাবাঘের একমাত্র যা উপকার সে হল তার চামড়া, কিন্তু এখন বোঝা যাচ্ছে, প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় রাখতে চিতাবাঘের অংশ কতটা। প্রতি বৎসর তারা হাজার হাজার বেবুন মারত, তাই চিতাবাঘের সংখ্যা কমে আসায় এখন আবার অনেক অঞ্চলে বেবুন একটা সমস্যা হয়ে উঠেছে। ওদের সংখ্যা ঠিক রাখার সবচেয়ে ভাল উপায় হল ওদের শত্রু চিতাবাঘকে বাঁচিয়ে রাখা। আজকাল তাই চিতাবাঘের সংরক্ষণের ব্যাপক ব্যবস্থা হয়েছে। এমনি অদ্ভুতই মানুষের ব্যবস্থা,—প্রথমে একজাতের জন্তুকে প্রায় মেরে শেষ করা আর তারপর তাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করা।

যত বৎসরই বিদেশে কাটাক না কেন, স্কটল্যাণ্ডের মানুষের কাছে তার দেশ স্কটল্যাণ্ডই। শিয়ারিংটন ছেড়ে চলে এসেছি চল্লিশ বছরেরও বেশিদিন, তবুও কখনো আমার মধ্যে সন্দেহ হয় নি যে কোন-না-কোন দিন আমি সেখানে ফিরে যাব। মারেঙ্গে বনের তাঁবুর আগুনের সামনে বসে দূর থেকে ভেসে আসা বানরের কিচির-মিচির শব্দ আর সিংহের গভীর গর্জন শুনতে শুনতে অনেক বার লোচার মস্-এর উপর দিয়ে উড়ে-যাওয়া বুনো হাঁসের কাকলির কথা মনে পড়েছে, মনে পড়েছে বসন্তের সমাগমে চিরশ্যামল হেথার ঝোপের সুমিষ্ট গন্ধ। সেই দেশই হল আমার প্রকৃত দেশ ; আফ্রিকা কেবল ক্ষণিকের অ্যাডভেঞ্চার ছাড়া কিছু নয়।

নেট্‌ল্ কাঁটাঝোপের মারাত্মক অভিজ্ঞতার পর আমার প্রায়ই মনে হত, হয়ত এবার আমার বয়স হচ্ছে। অবশ্য এই তেষট্টি বছর বয়সেও আমার দৃষ্টি তেমনি পরিষ্কার এবং যেকোন মানুষের সঙ্গেই আমি সমানে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরতে পারি। কোন জন্তুর অত্যাচারের খবর এলে এখনও আমাকে উপযুক্ত লোক হিসেবে তাকে দমন করতে পাঠানো হয়। বুড়ো মুলুম্বেকে সঙ্গে নিয়ে বন্দুক হাতে আমি চিহ্ন ধরে অগ্রসর হতে থাকি। কয়েক দিনের মধ্যেই অত্যাচার বন্ধ করে ফিরেছি ; এর ব্যতিক্রম খুব কমই হয়েছে। তাই, একদিন যে আমাকে এ থেকে বিশ্রাম নিতে হবে এ চিন্তায় মনে অত্যন্ত ব্যথা লাগল।

শেষ পর্যন্ত একদিন ব্যাপারটা হিল্‌ডাকে খুলে বললাম। যদিও এহেন কোন চিন্তা ইতিপূর্বে হিল্‌ডার মাথায় আসে নি, তবুও ,আশ্চর্য, সেও ইতিমধ্যে স্কটল্যাণ্ডে আমার কয়েকজন আত্মীয়ের সঙ্গে পত্রালাপ শুরু করেছিল। সে বললে কয়েক দিনের জন্যে একবার শিয়ারিংটন ঘুরে এলে বেশ হয়, দেখে আসা যায় জায়গাটা। কথাটা যতই ভেবে দেখি ততই মনে লাগে। ইতিমধ্যেই যেন সলওয়ে ফার্থ-এর নীল জল আর ব্যাঙ্কএণ্ড আনান রোডের বিস্তার আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। এই রাস্তা দিয়ে পুরাকালে স্কটল্যাণ্ডের রাণী মেরি চলেছিলেন,—এ রাস্তা চলে গেছে সুদূরপ্রসারী জলাভূমির উপর দিয়ে।

জিনিস-পত্র গুছিয়ে নিয়ে বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নেওয়া হল। ছেলেমেয়েরা সবাই বড় হয়ে গেছে, কারুর বিয়ে হয়েছে, কেউ বা তার নিজের কাজে ব্যস্ত, তাই কেনিয়ায় আর আমাদের তেমন কোন দায়িত্ব ছিল না।

যখন আমরা স্কটল্যাণ্ডে পৌছলাম, বসন্তের তখন শেষ,—বছরের সবচেয়ে সেরা সময় তখন। সোজা আমরা আমাদের পুরোনো খামারবাড়ি শিয়ারিংটনে চলে গেলাম।

সুপরিচিত পথ দিয়ে গাড়ি করে যেতে যেতে এ অঞ্চলের চেহারা দেখে দুঃখ হল। সমস্ত কিছুই ধ্বংসদশায় পড়েছে, আস্তাবল ও গরুর গোয়ালগুলোও তাই। যেখানে ছিল চাষের জন্যে চিক্কণ ঘোড়া, এখন সেখানে দেখা দিয়েছে ফার্গুসন ট্র্যাকটর। ক্লোভার খড়ের সে স্নিগ্ধ গন্ধও আর নেই। চারিদিকে পেট্রলের গন্ধ—এ যেন কোন ফ্যাক্টরি বাড়ি।

বাবা মা অনেকদিন গত হয়েছেন, আমাদের গোলাবাড়ি এখন অন্য লোকের হাতে। হিল্‌ডা আর আমি আলাপ করলাম তাঁদের সঙ্গে, কিন্তু যা শুনলাম তাতে আমাদের হতাশ হতে হল। খেত-খামারের জন্যে মজুর পাওয়া প্রায় অসম্ভব,—আর পাওয়া গেলেও মাইনে অত্যন্ত বেশি। মাসে মাত্র দু-পাউণ্ড মাইনেয় কেনিয়াতে প্রথম শ্রেণীর খেত-মজুর মেলে, আর এখানে মানুষ প্রায় দিনে সেই টাকা পেয়েও কাজ করতে অনিচ্ছুক। 'ওরা সবাই ফ্যাক্টরির কাজ পছন্দ করে,' দুঃখের সঙ্গে বললেন ভদ্রলোক। পুরোনো দিনের সেসব খেত-মজুর মজুরনী আর নেই।

অনেক খেতই ঘাসে ভরে উঠেছে। লোকজনের সাহায্য ছাড়া সেখানে কাজ করা অসম্ভব। অথচ স্পষ্ট মনে পড়ে ছেলেবেলায় এই খেত কীরকম ছিল। মা বাড়িতে লোকজনের তদারক করতেন আর বাবা মাঠ থেকে লোকজনের সাহায্যে ফসল ঘরে তুলতেন। শত-শত বছর ধরে যেসব গোলাবাড়িতে মানুষজন সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করত, অথচ মাত্র একজন মানুষের জীবনেই কী আমূল পরিবর্তন এসেছে!

খামারবাড়ির নিকটবর্তী একটা পুরোনো বাড়িতে আমরা উঠলাম। সাপার বিষণ্নভাবে সমাধা হল। এই পরিবর্তন দেখে যেন নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না। কেনিয়ায় থাকতে আমাদের খাওয়া শুরু হত সাধারণত ভাল পুষ্টিকর সুপ দিয়ে, তারপর মাছ—তিন-চারটে তরকারি দিয়ে, তারপর নরম মাংসের একটা রান্না,—অবশ্য মাঝে-মাঝে হিল্‌ডা তার বদলে মুরগি বা বুনো হাঁস বা অন্য কিছুর ব্যবস্থা করত। খাওয়া শেষ হত পাই, কিছু ফল, চমৎকার একটু পুডিং, আর হয়ত কেক আর বরফের কিছু খাবার দিয়ে। পরে বসবার ঘরে এলে আমাদের কফি দেওয়া হত। এখানে তরকারি বিশেষ

পাওয়া যায় না, তবে, সল্‌ওয়ের স্যামন মাছ অবশ্য অতি উপাদেয়, সন্দেহ নেই।

হিল্‌ডার মত গৃহিণী সুদুর্লভ, তাই প্রথমটা আমি বুঝতেই পারি নি কেন সে সাপারের জন্যে বেশ করে একটা কঙ্গোনি, বা একটা কি দুটো টমি চপ করল না। মুখ তুলে তার দিকে তাকিয়ে দেখি, সে উদ্বিগ্নভাবে আমার দিকে তাকাচ্ছে। বললে সে, 'ভুললে চলবে না, জন, যে মাত্র কয়েক পেনি দামের মাংস আমাদের পুরো এক সপ্তাহের জন্যে বরাদ্দ।'

'আচ্ছা বেশ, কিন্তু একটা ওমলেট পেলেও তো আমি খুশি হতাম।'

'না জন, সপ্তাহে মাত্র একটা ডিম বরাদ্দ।' বিষণ্ণভাবে হিল্‌ডা বললে।

এ অবস্থায় মানুষ কী করে থাকতে পারে? কিন্তু তখনও আমি হতাশ হলাম না। সেদিনই সন্ধ্যায় আমি কিছু দড়ি দড়া জোগাড় করে ফাঁদ পাততে বেরিয়ে পড়লাম।

সমস্ত কিছুই পালটে গেছে। জলার তলার সেই গর্তের কথা এখনও মনে আছে, খরগোসরা সেই গর্তটি তাদের যাওয়া আসার পথ হিসেবে ব্যবহার করত। সে রাত্রে দশটা ফাঁদ পেতে ফিরে এলাম। পরদিন সকালে গিয়ে দেখি, আমার হাত তেমনি ভাল আছে। ছ ছটা চমৎকার খরগোস ধরা পড়ল। আড়াই মণ ওজনের এক একটা দাঁত—এমন ছ-টা হাতি মেরে যে আনন্দ হত, তেমনি আনন্দ পেলাম এই খরগোস ধরে। দেখলাম, চল্লিশ বছর পরে হলে কী হয়, এখনও আমি ফাঁদ পাতায় তেমনি ওস্তাদ। আহা, টম স্যামন যদি আমার এই মাছ ধরা দেখত! টম বলত ফাঁদ পাততে হলে মাটি থেকে দেড় মুঠো উঁচু করে পাতা উচিত, অথচ আসলে কিন্তু তা নয়, আসলে উচিত দু-মুঠো উঁচুতে পাতা। হুইস্কি খেতে খেতে এ নিয়ে আমাদের প্রায়ই তর্ক হত, কিন্তু হাতে নাতে এই যে প্রমাণ, এর উপরে তো আর তর্ক চলে না!

ফেরার পথে মনে হল, এই সমস্ত সুন্দর মাংস কেবলমাত্র আমাদের দু-জনের জন্যে নিয়ে গেলে স্বার্থপরতার কাজ হবে। একটা খামারবাড়ির পাশ দিয়ে যেতে যেতে দেখলাম গৃহকর্ত্রী বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে। আমি একটা খরগোস তাঁকে দিতে চাওয়ায় তিনি নিরুৎসাহভাবে সেটার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমাদের শুয়োরছানা নেই।'

'বলেন কী, আপনি শুয়োরছানাকে খরগোসের মাংস খাওয়াতে চান? কেন, খরগোসের পাই-এর কথা কি শোনেন নি কখনো?'

'না না, আর আমরা ওসব খাই না', বুঝিয়ে বললেন ভদ্রমহিলা, 'শুনেছি বটে সেকালে মানুষরা এ খেত। ওসব খাওয়া আমরা আজকাল ছেড়ে দিয়েছি।'

এর পরেও আমি অনেকবার খরগোস ধরেছি, কিন্তু ক্রমেই আমার উৎসাহ কমে আসতে লাগল। শিকারের থলি বয়ে নিয়ে আসবে,—পয়সা দিয়েও এমন মানুষ মেলে না। খরগোসের থলি খানিকটা বইবার পর ভারি লাগে। কী জানি কেন, ছেলেবেলায় আমার এ কথা মনে হত না।

ছিপ নিয়ে গেলাম মাছ ধরতে। অতি অল্পই ট্রাউট ধরলাম,—চমৎকার ছোট-ছোট মাছ কয়েকটা, আধ সেরের মত ওজন এক একটার। কিন্তু হলে কী হয়, বেজায় সময় লাগে ধরতে। মনে পড়ে লোচারের উপরের কাঠের পোলটার কথা, ছেলেবেলায় যেখানে আমি জোয়ারের সময় ট্রাউট মাছ ধরতে যেতাম। এক সুন্দরী স্কচ তরুণী পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে তিনি থেমে দাঁড়ালেন। বললেন, 'মানে, আপনি মার্ডার ব্রিজের কথা জিজ্ঞাসা করছেন?'

'আর একটু খুলে বলুন।'

'শোনেন নি আপনি, একজন লোক তার ভালবাসার পাত্রীকে অন্য পুরুষের সঙ্গে দেখে এই পোলটার উপরে তাদের আক্রমণ করে? ছুরি দেখেই পুরুষটা পালিয়ে যায়, মেয়েটি কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকে। লোকটা তার গলা এ কান থেকে ও কান পর্যন্ত কেটে লোচারের জলে ফেলে দেয়, তারপর নিজেও তাই করে। সে রাতেই তার মৃতদেহ খুঁজে পেয়ে একটা শুয়োরের ঘরে তুলে রাখা হয়। নিশ্চয় আপনি সেখানে মাছ ধরতে যাচ্ছেন না?'

হা ভগবান! আমার চিন্তা কেনিয়ায় ফিরে গেল। সে দেশ তো এত অসভ্য নয়! সেমিলিকি নদীর উৎসের সন্নিকটে লেক এডওয়ার্ডের কথা মনে পড়ল। পাঁচ থেকে সাড়ে সাত সের ওজনের এক-একটা বারবেল মাছ সেখানে, এক ঘণ্টায় গোটা বারো মাছ স্বচ্ছন্দে ধরা যায়। তারপর লেক রুডল্ফে বড় বড় নীল নদের পার্চ তো রয়েছেই—এক-একটার ওজন আড়াই মণের কম নয়। পঁচিশ থেকে ত্রিশ সেরের একটা ছোট পার্চ পর্যন্ত প্রচুর বেগ দিয়ে থাকে। সেখানে লোচার-এর ট্রাউট শিকার আমার কাছে সময়ের অপব্যয় ছাড়া আর কিছু মনে হল না।

কিন্তু ছেলেবেলার সবচেয়ে প্রিয় স্মৃতি আমার বন্দুক ছোড়ার স্মৃতি।

একদিন সকালে তাই আমি আমার পার্ডিটা হাতে নিয়ে জলার দিকে চললাম।

পুরোনো, পরিচিত প্রান্তর-পথ ধরে চলেছি, কিন্তু সমস্ত কিছুই যেন ছেলেবেলায় যেমন দেখেছিলাম তার থেকে অনেক ছোট হয়ে গেছে। কেনিয়ার বিস্তীর্ণ প্রান্তরের দৃশ্যে আমার চোখ অভ্যস্ত, সেখানকার বাসিন্দাদের খেত খামারের চেয়েও এই বিচ্ছিন্ন ছোট ছোট প্রান্তর বিশেষ বড বলে মনে হল না। দূরের যেসব পাহাডগুলো তখন মনে হত আকাশচুম্বী প্রকাণ্ড পর্বত এক-একটা, মাউন্ট কেনিয়া বা কিলিমান্জোরোর তুলনায় তা এখন নিতান্ত নগণ্য মনে হল। সারাদিন ঘুরেও, শিকার বলতে যা বোঝায় তার বিশেষ কিছুই এখানে মিলবে না।

এমন সময় হঠাৎ গ্রাউজের ডাক আমার কানে এল। মুহূর্তমধ্যে আবার যেন আমি ছেলেমানুষটি হয়ে পডলাম। একটা জলার দিক থেকে এল শব্দটা। সেখানে যেতে হলে একটা গেট ডিঙিয়ে, একটা চারণভূমি পার হয়ে তবে যেতে হয়। উঠলাম গেটটার উপর। ছোট একপাল গরু মোষ আমার চোখে পডল, একটা বুডো মোষ হল তাদের সদার। যেতে যেতে লক্ষ্য করলাম, চমৎকার তার শিংদুটো।

চারণভূমির মাঝামাঝি পর্যন্ত গেছি, এমন সময় হঠাৎ খুরের টগবগ শব্দ শুনতে পেলাম—শব্দটা আমার দিকেই আসছে। মুহূর্তের জন্যে যেন আমি কেনিয়ায় পৌঁছে গেলাম। মোষের আক্রমণের সেই বজ্র-নির্ঘোষ কতবার আমি শুনেছি। চারিদিকে চোখ ফেরাতে দেখলাম, সেই বুডো মোষটাই আমায় তাডা করে আসছে,—তার মাথা নিচু, ঘাড লম্বা হয়ে গেছে। অপূর্ব সে দৃশ্য!

হঠাই খেয়াল হল, রাইফেল নিয়ে তো বেরোইনি! মোষটা তখন আমার পঞ্চাশ গজের মধ্যে এসে পডেছে, ভাবভঙ্গি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ। বন্য জন্তুর থেকে পালিয়ে যাওয়া আমার স্বভাব নয়, কিন্তু এক্ষেত্রে তা ছাডা আর উপায় নেই। দৌডলাম আমি।

আমার ভাগ্য ভাল যে গেটটা বেশি উঁচু ছিল না,—মোষটার শিং এসে গেটের কাঠে লাগল, আর আমিও লাফিয়ে পার হলাম। মাঝের একটা তক্তা মোষটার ধাক্কায় ভেঙে গেল। সেখানে দাঁড়িয়ে সে ভীষণ চিৎকার করতে লাগল। এমন তেজী জন্তু আমি অতি অল্পই দেখেছি।

ফিরে গিয়ে হিল্ডাকে বললাম, এবার থেকে রাইফেল নিয়ে বেরোবো। হিল্ডা কিন্তু বললে যে তাতে করে চাষীরা আপত্তি তুলবে হয়ত, কারণ

তাতে করে তাদের ভাল সব ভাল জাতের মোষ হয়ত মারা পড়তে পারে।

আমি আপত্তি জানিয়ে বললাম, 'বাঃ আচ্ছা দেশ তো! বন্য জন্তু থেকে আত্মরক্ষার অধিকারও এখানে নেই নাকি?'

'যাই বল জন, তুমি তো অনধিকার প্রবেশ করেছিলে!' ধীরে ধীরে বললে হিল্‌ডা।

অনধিকার প্রবেশ! এ কথাটা গত চল্লিশ বছরের মধ্যে একবারও আমি শুনিনি! তবু হিল্‌ডা যা বলছে তা তো মিথ্যে নয়! এমনকি গ্রাউজ শিকার করাও এদেশে বেআইনি হয়ত! আমরা যে সভ্যতার মধ্যে ফিরে এসেছি!

হিল্‌ডা উদ্বিগ্নভাবে আমার দিকে তাকালো। শেষ পর্যন্ত সে বললে, 'খাসা ছুটিটা কাটল, জন। এবার মাকিন্দুতে ফিরে গেলে কেমন হয়, বেশ হয় না?'

বড় ভাল যুক্তি। হিল্‌ডা কখনো ভুল করে না, এবারেও সে ভুল করেনি। জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে আমরা পরের জাহাজেই কেনিয়ায় রওনা হলাম।

নাইরোবিতে পৌঁছে দেখা করলাম বন্ধুদের সঙ্গে। আশ্চর্য হলাম শুনে যে এই যে ক-টা মাস আমরা মাকিন্দু ছেড়ে ছিলাম এতে কোন অসুবিধে হয়নি। সন্ধ্যায় আমরা দক্ষিণমুখো যাত্রা করলাম। ট্রেনের জানলা দিয়ে তাকিয়ে রইলাম বাইরে। অস্তসূর্যের দিকে যতদূর দৃষ্টি যায়, সমস্ত অঞ্চলের বুক জুড়ে কত জন্তু চোখে পড়ল। বড় ভাল লাগল সে দৃশ্য।

এতদিন পরে ফিরছি, তবুও ইচ্ছে করেই লোকজনকে খবর দিইনি। গাড়ি মাকিন্দু স্টেশনে থামতে আমি টর্চ জেলে সঙ্কেত করে মালপত্র নামাতে ব্যস্ত হয়ে উঠলাম। একটা কি দুটো বাক্স মাত্র নামিয়েছি, এমন সময় তিনজন লোক নিয়ে মুলুম্বে এসে হাজির।

সে রাতটা আমাদের বারান্দায় বসে হায়েনার বন্য হাসি আর দূর থেকে ভেসে-আসা আদিবাসিদের ঢাকের আওয়াজ শুনেই কাটল। ইতিমধ্যে কখন মুলুম্বে তার এক বৌকে খবর পাঠিয়েছে যে কাল ভোরেই আমাদের ডিম আর দুধ চাই।

আকাশে তারা গিস-গিস করছে, বাতাস নিশিগন্ধ ফুলের সৌরভে মন্থর। হিল্‌ডা আর আমি গ্লাস তুলে নিলাম ও আফ্রিকার নামে টোস্ট গ্রহণ করলাম। এতক্ষণে দেশে ফিরলাম আমরা।

প্রখ্যাত শিকারী মিঃ জে. এ. হাণ্টার-এর শিকারী-জীবনের লিপিবদ্ধ অভিজ্ঞতা থেকে সুলেখক ও শিকারী মিঃ ডেনিয়েল ম্যানিক্‌স্ এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন। কাজের সুবিধের জন্যে মিঃ ম্যানিক্‌স্ স্বয়ং কেনিয়ায় গিয়ে মিঃ হাণ্টারের সঙ্গে কয়েক সপ্তাহ কাটিয়ে আসেন। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিকারীর এই আত্মজীবনী-মূলক অনুবাদ প্রকাশ করতে পেরে গর্ব বোধ করছি।